বিহারীলাল গোস্বামীর রচনাবলী

সম্পাদনা : পরিমল গোস্বামী

এই গ্রন্থ নিম্নলিখিত চারি খণ্ডে বিভক্ত

নিবেদন ও নানা পরিচয়

অনুবাদ গ্রন্থাবলী

গীতি কবিতাগুচ্ছ

গদ্য রচনাবলী

নবগ্রন্থনা
৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম মুদ্রণ : ফেবরুয়ারি ১৯৭৬

বিহারীলাল গোস্বামীর নানা পরিচয়

আকর পরিচয়

টীচার্স সার্ভিস বুক

ফণীন্দ্রনাথ রায়ের চিঠি

নলিনীরঞ্জন রায়ের চিঠি

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের রচনা

এই লেখকের অভিজ্ঞতা

স্কুল পরিদর্শকদের মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

বিহারীলাল গোস্বামীর নানা পরিচয়

পিতৃদেব বিহারীলাল গোস্বামীর সার্ভিস বুক থেকে এই খবরগুলি পাওয়া যায় :

1. Name of Teacher Biharilal Goswami
2. Race and Caste Bengali : Brahmin
3. Home or Permanent Residence Satbaria, Dulai, Pabna
4. Father's name and Residence Debnath Goswami Satbaria
5. Date of Birth by Christian era 1871 (Vide Entrance Certificate Aged 16 in 1887
6. Academic Qualification Passed B. A. (Calcutta University) Received his education in Drawing in the City College, Calcutta
7. Date of commencement of appointment in School 1898
8. Subject of work and classes which the Officer taught English Grammar and Composition : in the Ist class and English Text in the 2nd class. Drawing in thet first four classes.

ছাত্রজীবনের কথা খুব বেশি জানা নেই। তবে এনট্রান্স পরীক্ষায় ১৮৮৭ সনে পাবনা জেলা স্কুল থেকে তিনি জেলার মধ্যে ইংরেজিতে প্রথম হওয়াতে বনওয়ারীলাল স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বিহারীলাল নিজের স্মৃতিকথা লিখছেন আমাকে বলেছিলেন, খাতাটাও আমি চোখে দেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে খাতা রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়। আমি তার উপর নির্ভর করব আশা ছিল, তাই পৃথক তথ্য তাঁর কাছ থেকে আর সংগ্রহ করিনি। অতএব তাঁর শিক্ষক জীবনের এবং ব্যক্তিগত জীবনের কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বিহারীলালের অনেকখানি পরিচয় আমি এখানে উপস্থিত করছি।

প্রথমে ফণীন্দ্রনাথ রায়ের কথা। ফণী ছিল আমার সহপাঠী, কিন্তু খুব অল্পকালের জন্য আমরা একসঙ্গে বাবার ক্লাসে উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু সে বাল্যকাল থেকে বাবার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিল। সে বিবরণ তার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশে বলা আছে। প্রবন্ধটি ভাদ্র ১৩৬৬ (১৯৬০ সন) কথাসাহিত্য নামক মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল। তার অংশ বিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের কথা

স্মৃতিচিত্রণ পড়া গেল। কত কথা এল মনে সুদূর অতীত পার হয়ে। সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ল তাঁর কথা, জীবনের প্রভাতকালেই যাঁর প্রভাব আমার কিশোর মনের উপর পড়েছিল এবং হয়তো এই বাষট্টি বছর বয়সেও আমার মধ্যে কাজ করছে। তিনি পরিমলের পিতৃদেব বিহারীলাল গোস্বামী। আজও মনে পড়ে তাঁর গৌরবর্ণ দীর্ঘ ঋজুদেহ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, দীপ্ত অথচ শান্ত দৃষ্টি, মৃদু অথচ স্পষ্ট কথার ভঙ্গী। সবসুদ্ধ একটি অনুগ্র দীপশিখার মত। আলো আছে তাপ নেই।

পরিমল লিখেছেন 'এরকম জায়গায় বাবা কেন এবং কিভাবে এসেছিলেন তা আমি জানি না।' এবং এ জায়গা ছেড়ে না যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে লিখেছেন হয়তো যেখানে ছিলেন, সেখানকার সবাই তাঁকে ছাড়তে চাননি। এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে আমার যা জানা আছে তা বলছি।......

প্রথমতঃ, কেন এবং কিভাবে 'এ রকম জায়গায় এসেছিলেন?' এর উত্তর দিতে গেলে কিছু পূর্ব ইতিহাস বলতে হয়।

জায়গাটির বর্ণনা পরিমল যা দিয়েছেন তা ওর সবখানি নয়। বছরে ছয় মাস এটি 'গ্রাম্য ভেনিস' হয়ে থাকে বটে, কিন্তু বাকি ছ'মাস সেই বিপুল জলরাশি কোথায় সরে যায়, তখন ছোট ছোট টিলার উপর গ্রামের পাড়াগুলি দেখায় যেন পশ্চিমের কোন পাহাড়ে জায়গা। বিক্রমপুরের পাড়াগুলির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা একথা বুঝতে পারবেন। গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে যে নদীটি প্রবাহিত সেটি 'চলনবিল' নামে খ্যাত প্রচণ্ড একটি হ্রদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। শীত-গ্রীষ্মে সেটি 'ছোট নদী' হলেও বর্ষায় যে রূপ ধরত তাকে সাতবেড়িয়ার প্রান্তবাহিনী হলেও পদ্মার চেয়ে খুব ছোট বলা যায় না। পাশাপাশি দুটি নদী এবং তাদের দুই

পাশের মাঠ-প্রান্তর এক বিরাট জলবিস্তারের নীচে তলিয়ে গিয়ে যে আকার ধারণ করত ওখানে তাকে বলত "পাথার"। দুর্যোগের দিনে এই কয়েক মাইল ব্যাপী পাথার পার হয়ে যেতে আমাদের গ্রামের দক্ষ 'শিকারী' মাঝিরাও ভয় পেত। গ্রামের মধ্যের জল প্রণালী এবং জলাশয়গুলি অবশ্য বাইরের এই বিপুল জলরাশির সঙ্গে যুক্ত হলেও ছিল শান্ত ; গ্রামের বাইরের মাঠের ধানগাছগুলির (যেগুলির বর্ষার জলের সঙ্গে বেড়ে প্রায় বাঁশগাছের মত বড় হত) তাদের দ্বারা পাথারের সেই বিপুল জলরাশির আন্দোলন অনেকখানি প্রতিহত হত। চলনবিলটি ছিল একটি 'ভূমধ্যসাগর' বিশেষ। রাজসাহী এবং পাবনা জেলার সীমানার অনেকখানি জুড়ে এটি অবস্থিত ছিল এবং উত্তর বঙ্গের আত্রাই (আত্রেয়ী) করতোয়া প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়ে এসে এতে নিজেদের জলসম্পদ উজাড় করে আবার নানা নাম নিয়ে বেরোত, কেউ বা পদ্মা কেউ বা যমুনার (ব্রহ্মপুত্রের) সন্ধানে। এই প্রাকৃতিক বিন্যাসে চলনবিলের আশপাশের জমিগুলি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত উর্বর এবং নদীগুলির দুপাশে বিস্তৃত ঘাসের জমিগুলি ইজারা নিয়ে অবস্থাপন্ন দুধের ব্যবসায়ীরা প্রধানতঃ কলকাতার সঙ্গে অনেক টাকার দুধ-ঘি এবং ছানার কারবার করতেন। তখনকার স্বল্পতোয়া নদীগুলির তীরে, ঢেউ খেলানো সবুজমাঠে (বা 'ছাহামে') বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা হৃষ্টপুষ্ট গরুতে ভরা এই 'বাথান'-গুলি দেখে আমার আপনা থেকেই মনে পড়ত বিলেতী বইগুলিতে দেখা হল্যাণ্ডের অনুরূপ ছবি। আর, পূজোর সময়কার ভরা বর্ষার শান্তদিনে জলেডোবা ধান ক্ষেতগুলির মাঝখানে কুমুদ ফুলের পাড়-দেওয়া খালগুলিতে খোলা নৌকায় বসে দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির পারে ছবিতে দেখা কাশ্মীরের পর্বতগুলি বসিয়ে নিতে আমার একটুও অসুবিধা হত না।

এই গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে এসে বিহারীলাল যাঁদের বাড়ীতে থাকতেন,—স্কুলের সেক্রেটারী অম্বিকানাথ, তাঁর দাদা তারানাথ এবং ছোট ভাই কুমুদনাথ ছিলেন বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থ। বহুকাল আগে এঁদের পূর্বপুরুষদের বাস ছিল বারেন্দ্রভূমে,—এখনকার বগুড়া জেলার যে অংশে উঁচু এবং লাল মাটি, সেই অঞ্চলে।

এই অখ্যাত গ্রামটির এই অজ্ঞাত পরিবারটির আধুনিক কালেরও একটি গর্ব করবার মত ইতিহাস আছে যা পরে বিহারীলালকেও স্পর্শ করেছিল।

এই বংশের কালিনাথ রায় তাঁর বন্ধু নিকটবর্তী গাঁড়াদহ গ্রামের জমিদার নিত্যানন্দ নাগের সহযোগে উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ দস্যুদলপতি ভবানী পাঠককে গ্রেপ্তার করতে সাহয্য করে উভয়ে ইংরেজের কাছে ডিহি সাহাজাদপুর নামে একটি জমিদারী মহাল পুরস্কার পান। যৌথ সম্পত্তি ভোগদখলে অসুবিধা হওয়ায় পরে এটি বিক্রি করা হয়, কেনেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার। এ-সম্বন্ধে কথাবার্তা চালান এ পক্ষে যৌথপরিবারের কর্তা আমার পিতামহ গৌরীনাথ রায়, ও পক্ষে ঠাকুর-পরিবারের কর্তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সেই উপলক্ষে মহর্ষি আমাদের গ্রামের বাড়ীতে আসেন। ছেলেবেলায় ঠাকুমা-পিসিমাদের কাছে শুনেছি 'পণ্ডিতা-ডাকাত'কে (ভবানী পাঠক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন বলে এই নাম) ধরিয়ে দেওয়ার কাহিনী, ঠাকুর বাবুর (দেবেন্দ্রনাথের) দেবদুর্লভ মূর্তির বর্ণনা, আর তিনি আমার বালিকা পিসিমাদের যে সব কাশ্মীরীশাল উপহার দিয়েছিলেন তার কথা।

ডিহি সাহাজাদপুর কিনে ঠাকুররা আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র ক্রোশখানেক দূরে সাহাজাদপুরে প্রকাণ্ড কাছারী বাড়ি তৈরী করালেন। আমাদের গ্রামেও আমাদের সরিক জমিদার হলেন। কিন্তু বিদেশী জমিদার বলে জমিদারি পরিচালনায় আমাদের সাহায্য নিতে হত এবং সে সাহায্য করতেন প্রধানতঃ আমার মেজ-জেঠামশায় অম্বিকানাথ রায়।

পোতাজিয়া স্কুলের সেক্রেটারী হিসাবে পরিমল অম্বিকানাথের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু বলা দরকার।

অম্বিকানাথ ছিলেন তারানাথের বিপরীত। তারানাথ যদি হন 'অ্যারিসটোক্রাট', অম্বিকানাথ ছিলেন 'প্রোলেটারিয়ান'।

শুনেছি ছেলেবেলায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন বাড়ির বৃদ্ধা দাসীর গৃহে এবং জমিদারণী মায়ের কাছ থেকে নানা ছলে আদায় করে নিতেন নানা জিনিষ গরীব ধাই-মার জন্য। এর ফলে তাঁর মন হয়ে উঠেছিল সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ এবং তাদের কল্যাণ চেষ্টাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এর জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তিনি দেশের বড়লোকদের কাছে যেতেও কুণ্ঠিত হতেন না এবং তাঁরাও এঁর নিঃস্বার্থ সেবা-পরায়ণতার জন্য এঁকে শ্রদ্ধা করতেন, সাহায্য করতেন। এঁর শিক্ষাও স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি, কিন্তু দেশের লোকের শিক্ষাবিস্তারে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ এবং সে কাজে সঙ্গী পেয়েছিলেন ছোটভাই কুমুদনাথকে। তিন ভাইয়ের

মধ্যে কুমুদনাথই স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করেছিলেন। পিতা গৌরীনাথের প্রতিষ্ঠিত একটি বাংলা মাইনর স্কুল গ্রামে ছিল, এই দুই ভাইয়ের চেষ্টাতে তা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তা ছাড়া অম্বিকানাথের চেষ্টায় স্থাপিত হয় ছেলেদের ও মেয়েদের জন্যও দুটি উচ্চ প্রাথমিক স্কুল, মুসলমান ছেলেদের জন্য মক্তব। অদ্ভুত ছিল তাঁর কর্মশক্তি, অসাধারণ ছিল সংগঠনের ক্ষমতা।

কুমুদনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে এম-এ পাস করে গ্রামে এসে নবগঠিত ইংরেজী স্কুলের অবৈতনিক হেডমাষ্টার হয়ে স্কুলটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ভার নেন। কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁর একাজ করা সম্ভব ছিল না, তাই খোঁজ পড়ে এমন একজনের যাঁর হাতে তিনি স্কুলের ভার দিয়ে যেতে পারেন। পাবনা ছোট জেলা, বিহারীলালের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁদের কানে আসতে দেরি হয়নি এবং তাঁদেরই আমন্ত্রণে বিহারীলাল হেডমাষ্টার হয়ে এ গ্রামে আসেন।

ডিহি সাহাজাদপুর কেনবার পর মহর্ষি মহাল দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের উপর; রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে বোটে পদ্মা পার হয়ে পাবনা শহরের ভিতর দিয়ে ইছামতী উজিয়ে যেতেন সাহাজাদ-পুরের দিকে। দুপাশের গ্রামগুলির সুখদুঃখের ছবি ফুটে উঠত তাঁর কবিতায়, তাঁর গল্পগুচ্ছে। পোতাজিয়া গ্রামের পূবদিক ঘেঁষে বইত নাম-সর্বস্ব 'বলেশ্বর নদ'—তার কূলে ছিল 'ঠাকুরবাবুদের 'হাট খোলা', সাহাজাদপুর পৌঁছানোর আগে কবির বোট ভিড়ত সেখানে। তাঁর "বিবিধ প্রবন্ধে"র কয়েকটি প্রবন্ধের নীচে এই স্থানের নাম আছে। তিনি এলে গ্রামে সাড়া পড়ে যেত; বিহারীলালও সেই সূত্রে তাঁর সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্কুল পরিদর্শন করেন, স্কুলের লাইব্রেরীতে নিজের বই উপহার দেন, আর তাঁর রচিত কবিতা পড়ে মুগ্ধ হন।

বিহারীলাল ছিলেন একাধারে কবি ও চিত্রশিল্পী। 'প্রবাসী' সম্পাদনার আগে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রদীপের সম্পাদক ছিলেন। আমার মা সেই মাসিক-পত্র নিতেন। ছেলেবেলায় তাতে দেখি বিহারীলাল গোস্বামী রচিত 'মেঘদূত' সম্বন্ধে একটি কবিতা এবং তার উপরে বিরহশয়নে শায়িতা যক্ষপত্নীর একখানি ছবি। তখন বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদক ছিলেন। মায়ের কাছে শুনি কবিতাটি আমাদের গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টার

মহাশয়ের লেখা এবং ছবিখানি তাঁরই আঁকা। ছবির পশ্চাৎপটে জানালার প্যানেলের ফাঁকে ফাঁকে লেখা ছিল "আধিক্ষামাং বিরহ শয়নে সন্নিষন্নৈক পার্ষাং"। শুনলাম লেখাগুলিও তাঁর। তখন বোধহয় হাফটোনের তেমন প্রচলন হয়নি, ছবিখানি ছিল 'উডকাটে' ছাপা; তাতে মূলের সৌন্দর্য রক্ষিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। তবু আমার শিশুমন মুগ্ধ হয়েছিল এই কবিতা, এই ছবি ও হাতের লেখা দেখে এবং একটা গর্বমিশ্রিত কৌতূহল জেগে উঠেছিল এদের রচয়িতা সম্বন্ধে, যদিও সে বয়সে এ কবিতা ও এই ছবির অর্থ বোঝা সম্ভব ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, বিহারীলালকে দেখার আগেই এই ছবি ও কবিতা দেখি। পরে তাঁর সংস্পর্শে এসে দেখি তিনি আমার কল্পনার মানুষটির চেয়ে অনেক বড়।

রবীন্দ্রনাথ পরিমলকে বলেছিলেন তিনি 'একবার' তাঁকে ডেকেছিলেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু আমি শুনেছি এই 'একবার' দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, এর অর্থ এ নয় যে এই ডাক একটিবার মাত্র এসেই থেমে গিয়েছিল। নব প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ দেশের নানাস্থান থেকে জ্ঞানীগুণীদের আমন্ত্রণ করছিলেন। এ সম্ভব নয় যে বিহারীলালের মত গুণী, যাঁর ছন্দের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হয়ে, স্বয়ং ছন্দের যাদুকর হয়েও তাঁকে 'ছন্দোবিনোদ' উপাধি দিয়েছিলেন, তাঁকে অত সহজেই তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এও সম্ভব নয় যে এই অখ্যাত গ্রাম্য স্কুল ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে গেলে খ্যাতিলাভের যে বিপুল সম্ভাবনা ছিল সে সম্বন্ধে বিহারীলাল সচেতন ছিলেন না। তবে কেন তিনি এই সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিলেন?

পোতাজিয়া গ্রামটির সঙ্গে পরিমলের সুদূর পিয়াসী মন নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারলেও কল্পলোকবিহারী বিহারীলাল দীর্ঘকাল এখানে বাস করতে অসুবিধা বোধ করেননি। গ্রামের অদ্ভুত নামটি নিয়ে তিনি গবেষণাও করেছিলেন। তাঁর নানা থিওরির মধ্যে একটি ছিল, গ্রামের নাম হয়েছে 'পুত্রংজীব বা পুতজিয়' গাছের নাম থেকে, আর একটি ছিল ঐ অঞ্চলে প্রচলিত একটি পুরাকাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বহুকাল আগে পারস্যের এক ধার্মিক শাহ্‌জাদা মখদুম শাহ্‌ দলবলসহ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশে আসেন। ভরা বর্ষায় চলনবিলের বিপুল জলরাশি দিনের পর দিন জাহাজে অতিক্রম করে এই গ্রামে তাঁরা প্রথম ডাঙা পান এবং জাহাজ ভেড়ান। এখানে নামাজ পড়ে মখদুম শাহ্‌ এর নিকটবর্তী একটি স্থানে

নিজের আস্তানা স্থাপন করেন এবং সে জায়গাটির নাম হয় 'শাহজাদপুর' যা পরে বাংলা রূপ ধরে সাহাজাদপুর হয়েছে। সেখানে মখদুমসাহেবের মসজিদ এবং সমাধি (দরগা) এখনও আছে। বিহারীলালের মতে 'পোত' (জাহাজ) 'আওজানো (ভেড়ানো) হয়েছিল বলে এ গ্রামের নাম হয় 'পোতআওজিয়া' যা পরে হয়ে দাঁড়ায় 'পোতাজিয়া'। অবশ্য, তাঁর এইসব গবেষণার শ্রোতা ছিলাম আমি; কিন্তু এর থেকে বোঝা যায় জায়গাটির প্রতি তাঁর মমতার অভাব ছিল না। গ্রামের লোকদেরও তিনি অপছন্দ করতেন না; শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তাঁর যোগ্য না হলেও তিনি সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতেন, রসিকতাও করতেন; তারাও তাঁকে ভালবাসত শ্রদ্ধা করত

কিন্তু গ্রাম বা গ্রামবাসীদের ছেড়ে না যাবার এ কারণ যথেষ্ট নয়। স্কুলের দায়িত্ব হঠাৎ ছেড়ে যেতে যদি তাঁর দ্বিধা হয়ে থাকে তাও অত দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না, কারণ শান্তিনিকেতনের দ্বার তাঁর কাছে খোলাই ছিল।

রবীন্দ্রনাথ পরিমলকে বলেছিলেন "হয়তো যেখানে ছিলেন সেখানকার সবাই তাঁকে ছাড়তে চায়নি।" কিন্তু কবির এই অনুমান বোধ হয় পুরোপুরি ঠিক নয়। গ্রামের লোক তাঁকে ছাড়তে চাইবে না এটা স্বাভাবিক, কিন্তু তারা কেউ তাঁর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পথে বাধা দিয়েছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ যাঁরা স্কুলের স্বার্থে বাধা দিতে পারতেন, যেমন আমার বাবা বা মেজ জ্যাঠামশায় স্কুলের সেক্রেটারী অম্বিকানাথ, এঁরা কেউ বাধা দেন নি বরং উৎসাহই দিয়েছেন যেতে এ আমি শুনেছি। আমাদের গ্রাম 'বাইরের সঙ্গে যোগাযোগহীন' হলেও একদিক দিয়ে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে আমাদের পরিবারের নিবিড় সংযোগ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি আমাদের বাড়িতে প্রথমে প্রদীপ পরে প্রবাসী, ভারতী (প্রথমে ছোট, পরে বড়), বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), সাহিত্য প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলি আসত এবং তাদের মধ্য দিয়ে বয়ে আসত দেশ বিদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, প্রভাবিত করত আমাদের পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও মন। রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যে সচেতনতা আমার মা, জেঠাইমা, এমনকি জেঠতুতো দিদিদের মধ্যেও দেখেছি, কলকাতার অনেক শিক্ষিত

পরিবারেও ততটা দেখিনি। তা ছাড়া সাহাজাদপুরের জমিদারি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে অম্বিকানাথ সাহায্য করতেন। তিনি বিহারীলালের শান্তিনিকেতন গমনে বাধা দেবেন সেটা সম্ভব নয়। প্রধানতঃ অম্বিকানাথের মধ্য দিয়েই ছিল এই দুই পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ। সাহাজাদপুরের সম্পত্তি পরে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশে পড়ে; তখন কর্তা হিসাবে গগনেন্দ্রনাথও অম্বিকানাথের সাহায্য নিতেন।...

সুতরাং অম্বিকানাথ বা তাঁর ভাইয়েরা বিহারীলালের শান্তিনিকেতন যাত্রায় বাধা দেননি এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। তবে কিসের জন্য বিহারীলাল পোতাজিয়া ছেড়ে গেলেন না?—এ বিষয়ে যাঁরা জানতেন, তাঁদের কাছে শুনেছি তাঁরা তাঁকে এ সুযোগ না হারাতে পরামর্শ দিলে তিনি বলেছিলেন, "আমি তারাবাবুকে (তারানাথকে) ছেড়ে যেতে পারি না।" আমার মনে হয় তাঁর এ গ্রাম ছেড়ে না যাবার এইটিই আসল কারণ।

আগেই বলেছি তারানাথ স্কুলের শিক্ষা শেষ না করলেও ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় নানা বই পড়েছেন। তার মধ্যে ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুগম্ভীর গ্রন্থও ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁর প্রায় সব সময়ের সঙ্গী বিহারীলাল। বিহারীলাল দেশী-বিদেশী নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, তার মধ্যে সংস্কৃত মেঘদূত, কুমারসম্ভব এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার এবং ফার্সী শেখ সাদীর পন্দ্‌নামার তিনি বাংলা পদ্যানুবাদ করেছিলেন। সংস্কৃত বইয়ের যখন যে অনুবাদ করতেন আগে তারানাথকে পড়ে শোনাতেন। এখনও মনে আছে, কুমারসম্ভবের অংশের অনুবাদ তিনি তারানাথকে পড়ে শোনাচ্ছেন, মাঝখানে আমি বালকশ্রোতা, বুঝি বা না বুঝি তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছি তাঁর ছন্দের অপূর্ব ঝঙ্কার, সযত্ন-নির্বাচিত শব্দগুলির মধুর ধ্বনি। এ বিষয়ে তখনকার দিনে বোধহয় শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তার তুলনা চলত। পরিমলকে তিনি বঙ্গদর্শনে ছাপা কুমারসম্ভব পড়ে শুনিয়েছেন। কিন্তু তার আগে আমি শুনেছি তাঁর ছাপার অক্ষরের মত হস্তাক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে। 'ছাপার অক্ষরের মত' বলা বোধ হয় ঠিক হল না, তাঁর লেখা ছাপার অক্ষরের মত সুগঠিত হলেও তার ছাঁদ ছিল সুকুমার, ছাপার অক্ষরের মত

উগ্র নয়।

সুবিমলের অকাল-মৃত্যুর (পৌষ, ১৩১৫) পরে তাঁর গীতার পদ্যানুবাদ গীতাবিন্দু প্রকাশিত হলেও তার সাংখ্যযোগ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ প্রভৃতি অংশের অপরূপ অনুবাদ আগেই লেখা হয়ে আমাদের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। একথা মনে করবার কারণ যে তারানাথের অনুরোধেই তিনি গীতার অনুবাদে হাত দেন। তারানাথের ইচ্ছায় তিনি এমন কি 'তিথিবিশেষে নিষিদ্ধ ভক্ষ্যের'ও সুন্দর পদ্যানুবাদ করেছিলেন এবং তারানাথের নির্দেশে আমাদের তা মুখস্থ করতে হয়েছিল।

সেতারে তাঁর হাত মিষ্ট ছিল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি তারানাথকে সেতার বাজিয়ে শোনাতেন। বেশ মনে আছে প্রায় অর্ধরাত্রে যখন পাড়াগাঁয়ে চারিদিক নিস্তব্ধ, জ্যোৎস্নাধারায় ভরে গেছে আকাশ ধরণী, তখন তারানাথের বৈঠকখানা থেকে দক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে আসছে তাঁর সেতারের সুর, অন্দরের যে-ঘরটিতে আমরা থাকি তার জানালায় বসে আমি তন্ময় হয়ে তাই শুনছি। তার পরে থেমে যেত সে সুর। তারানাথ খড়ম খট্‌খট্‌ করে ভেতরে আসতেন।

আমাদের গ্রামে একবার দারুণ অগ্নিকাণ্ড হয়ে আমাদের ঘরবাড়ি সব পুড়ে গিয়েছিল। তারানাথের বৈঠকখানায় যখন আগুন লেগেছে তখন বিহারীলাল তাঁর সাধের রচনাগুলি সমেত কাঠের বাক্সটি প্রজ্বলিত ঘর থেকে বের করছেন, সেই সময় আগুন নেভাতে তৎপর আমাদের নায়েব চক্রবর্তী মশায় চেঁচিয়ে বললেন, "বাবুদের সর্বস্ব পুড়ে গেল, আর আপনি আপনার ঐ কাঠের বাক্স বাঁচাতে ব্যস্ত!" এতে লজ্জিত হয়ে তিনি বাইরে আনা বাক্স আবার ঘরে তুলে রাখলেন, বাক্সসুদ্ধ ছাই হয়ে গেল তাঁর অনবদ্য ছন্দে রচিত মেঘদূতের প্রথম পাণ্ডুলিপি। এমনই ভাবে ভোলা, স্বার্থচিন্তাশূন্য মানুষ ছিলেন তিনি; পাড়াগেঁয়ে জমিদার তারানাথের প্রতি মায়ায় তিনি যে বিশ্বকবির বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ আহ্বান উপেক্ষা করবেন তাতে আশ্চর্য কি আছে?......"

কথাসাহিত্য ভাদ্র, ১৩৬৭ (১৯৬০)

শ্রীনলিনীরঞ্জন রায়ের কথা

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

ভাই পরিমল, ১-২-৬৬

তোমার চিঠিখানা পেয়ে আনন্দ হল, কারণ তুমি লিখেছ যাঁদের তুমি দেখেছ তাঁদের সম্বন্ধে একটি বই লিখছ। তোমার স্মৃতিচিত্রণ পড়ে যেরকম আনন্দ পেয়েছিলাম, সেই রকম আরও কিছু পাব আশা করছি। এর মধ্যে তোমার পিতৃদেবের কথা স্বভাবতঃ নিশ্চয়ই আসবে। আমি ওঁর ছাত্র বলে গর্ব বোধ করি। তাঁর শিক্ষকতা সম্বন্ধে আমাকে লিখতে বলেছ। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

আমি শৈশব থেকেই তাঁর ছাত্র, কারণ শিশু শ্রেণীতে যখন পড়ি (১৯০০) তখনই তিনি পোতাজিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। একটু উঁচু ক্লাসে উঠে তাঁকে সাক্ষাৎ ভাবে পেয়েছি ড্রয়িংএর ঘণ্টায়। তখন চেয়ার টেবিল ইত্যাদি দেখে মডেল ড্রয়িং করতে হত। সেই সময় তিনি perspective কথাটা বুঝিয়েছিলেন। তার বাংলা তিনি বলতেন পরিপ্রেক্ষিত। রং সম্বন্ধেও সাধারণ একটা ধারণা তিনি দিতেন। প্রথম তাঁর কাছে রামধনুর সাত রং VIBGYOR শিখি। আরও শিখেছিলাম যে (পেন্টিংএর ক্ষেত্রে) মৌলিক রং তিনটি—লাল নীল আর হলুদ। এবং এদের পরিপূরক যথাক্রমে হরিৎ, কমলা ও বেগুনি। আর সূত্র বলে দিয়েছিলেন হরি-লাল, নীল-কমল ও তেলে-বেগুনে। (সবুজের পরিপূরক লাল, নীলের কমলালেবুর রং ও তেল মানে সরিষা-তেলের রং হলুদ, তার পরিপূরক বেগুনি।) তোমরাও নিশ্চয় শুনেছ।

আমরা ১৯১০এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই। ১৯০৯ পর্যন্ত পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ছিল, মুখস্থ করে পাস করা যেত, বা বলা যায় পাস করতে হলে মুখস্থ করতে হত। এই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ১৯০৯এ শেষ হয়ে গেল। আমাদের ইংরাজি ও বাংলাতে কোন পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ছিল না, প্রশ্নপত্রে unseen passage থাকত, যার সাবস্ট্যান্স নিজের ভাষায় (in your own words) লিখতে হত। বাংলা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ ও রচনা। গ্রামারের প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নপত্রের ইংরাজি অনুবাদের জন্য ৭০ মার্ক ও দুটি রচনায় ৩০। দ্বিতীয় পত্রে substance of unseen passages-এর জন্য ৭০, গ্রামার

৩০। বাংলাতেও ইংরাজি থেকে বাংলা অনুবাদ—৭০, রচনা ৩০। এই নূতন ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান বেশ ভাল না হলে পাস করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সুতরাং পূর্বের শিক্ষণ পদ্ধতিও সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। আমরাই প্রথম দল, যারা এই অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হই ১৯১০ সনে। কিন্তু আমরা নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছি ঐ হেডমাস্টার মহাশয়ের পরিবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির গুণে।

বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজি ও বাংলার কতকগুলি বই নির্বাচিত করে দিয়েছিলেন যার মান অনুযায়ী আমাদের ভাষাজ্ঞান থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিপ্রেত ছিল। ঐ গুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকবে না। নির্বাচিত পুস্তকের তালিকা বেশ দীর্ঘই ছিল, সুতরাং সব পড়ান সম্ভব ছিল না, খুঁটিনাটি করে ত নয়ই। তিনি আমাদের Ivanhoe, Bengal Peasant Life ইত্যাদি পড়াতেন। যেভাবে পড়াতেন সেইটাই অপূর্ব। তিনি ক্লাসে বই পড়ে যেতেন তাঁর সুন্দর উচ্চারণে, নির্ভুল accentএ, তাতেই বিষয়বস্তু প্রায় পরিষ্কার হয়ে যেত। যেখানে শক্ত কোন কথা আসত সেইটার কিছু ব্যাখ্যা বা প্রতিশব্দ দিয়ে যেতেন, কোন ইডিয়ম পেলে সেটা আণ্ডারলাইন করে রাখতে বলতেন। বইটার একটা মোটামুটি ধারণা হলে বাকিটা আমাদের নিজে পড়ে নিতে বলতেন। এবং পড়লাম কিনা তার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের নিজের কথায় বইটার সারাংশ লিখে দেখাতে হত, ইংরাজি বইয়ের ইংরাজিতে, বাংলার বাংলাতে। তাতে ভাষার উপর স্বভাবতই একটা দখল এসে যেত, অনেক সময় স্টাইলটার ছাপও আমাদের অজ্ঞাতসারেই এসে পড়ত। এইভাবে পড়ানতে আমার যে কত ভাল লাগত এবং কত উপকার যে আমি পেয়েছি তাঁর জন্য তাঁকে ভালবেসেছি শ্রদ্ধা করেছি।

আমাদের যেমন পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ছিল না, তাঁরও তেমনি শিক্ষার বিষয়ও নির্দিষ্ট ছিল না। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের যতখানি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন, এই বোধহয় তাঁর লক্ষ্য ছিল। শিক্ষাদানের মাধুর্যে অতি অনায়াসে আমরা কত বিষয় তাঁর কাছে শিখেছি এবং আনন্দ পেয়েছি। ইংরাজি বা সংস্কৃত ছন্দ আমাদের পাঠ্য ছিল না, কিন্তু তিনি কবি ছিলেন এবং বুঝতেন যে ছন্দে জ্ঞান না থাকলে কবিতার মাধুর্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ইংরাজি ও সংস্কৃত ছন্দ আমাদের

শিখিয়েছিলেন। তাতে আমরাও বেশ আনন্দই পেতাম। এখনও মনে আছে তাঁর সেই সব সূত্র। তোমারও নিশ্চয়ই মনে আছে :

Iambics march from short to long

Trochee trips from long to short—ইত্যাদি।

আই-এ পড়ার সময় এর সুফল পেয়েছিলাম, প্রসোডি পড়তে।

সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে কত শিখেছিলাম, আশ্চর্য, এখনও ভুলিনি। এবং তার কারণ আমার স্মৃতিশক্তি নয়, বরং হেডমাস্টার মহাশয়ের শিক্ষাদানের ধারার অসাধারণত্ব। তাঁর কথা লিখতে গেলে অল্পে শেষ করা কঠিন।...

সংস্কৃত কাব্য ভালবেসেছিলাম তাঁরই কৃপায়। স্কুলেই আমরা শিখেছিলাম নখলু নখলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ ইত্যাদি, অথবা সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং ইত্যাদি আর তার সঙ্গে মালিনী ছন্দের সূত্র ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ। আবার এই সূত্র বুঝতে জানা দরকার—

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারঃ

ভাদি গুরুঃ পুনরাদি লঘুর্য।

জো গুরু মধ্যগতো বলমধ্যে

সোঽন্তগুরুঃ পুনবন্ত লঘুস্তঃ॥

আরও অনেক ছন্দ শিখেছিলাম মনে পড়ছে—

স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ

জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ।

হয় ত কোনদিন বলতে বলতেই ক্লাসে ঢুকলেন (ক্লাস কিন্তু ইংরাজির!)—গৃহিণী সচিবর সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—বিয়োগিনী ছন্দ, অজবিলাপ, রঘুবংশ। এইভাবে শিক্ষা দিলে সংস্কৃত কাব্যের উপর কার না আকর্ষণ হয়? তাই ত বি-এ পর্যন্ত সংস্কৃত ছাড়িনি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ছিলেন, তাই রবীন্দ্রকাব্যের রস যাতে আমরা গ্রহণ করতে পারি তার জন্য কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তখন বুঝিনি। আর তিনি নিজে যে একজন কবি তাই কি তখন ঠিক বুঝতাম?

ক্লাসে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাংলা কবিতার মধ্যে সংস্কৃত আছে এমন কবিতা বলতে পারিস? এর উত্তরে বন্দেমাতরমের কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন শোন আরও বলি—

দেখিয়া শঠে শিহরি ওঠে অঙ্গে স্বেদ বিন্দু
চলিয়া যেতে তুলিয়া পদ করিবে যাই ন্যস্ত
পথের মাঝে অচলরাজ আকুলা যেন সিন্ধু
নগাধিরাজ তনয়া আজ ন যযৌ ন তস্থৌ।

সঙ্গে এর সংস্কৃতটাও বলেছিলেন বটে। তখন বুঝতে পারি তিনি কুমার-সম্ভবের এইভাবে সুললিত অনুবাদ করছেন।

তাঁর ছাত্রদের উপর স্নেহমমতার কথা কি বলব। কোনও উপমা দিয়ে বোঝান যাবে না। এইটুকু বুঝি যখন তাঁর কথা মনে হয় ভক্তি শ্রদ্ধায় অন্তর ভরে ওঠে। তিনি ভালবাসতেন বলেই গীতার অনুবাদ 'গীতাবিন্দু' মুদ্রণের ভার আমাকে (তখন বি-এ ছাত্র) ও আমার বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে (তখন আই-এ ছাত্র) দিয়েছিলেন, যদিও ঐ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

তাই ভাবি যে, মামুলি পদ্ধতিতে শিক্ষা না দিয়ে এইভাবে শিষ্যের মনে আনন্দ জাগিয়ে নানা বিষয়ে ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে আমি আর কোন শিক্ষককে দেখিনি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন, যা কবির পক্ষে স্বাভাবিক। তাই সারা জীবন পল্লীগ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করে কাটিয়ে দিলেন।......তিনি যে কি রত্ন ছিলেন তা কেউ জানল না।......

—তোমার নলিনীদা

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা

প্রখ্যাত লেখক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা, "রবীন্দ্রনাথ ও সেকালের লেখকগণ" পর্যায়ের কয়েকটি রচনা যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে ছাপা হয়। তার একটিতে (১০ই এপ্রিল ১৯৬০) সেকালে বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ নিয়ে যে বাদানুবাদ চলে, সে সময়ে বিহারীলাল সে আন্দোলনে যোগ দেন এরূপ উল্লেখ করেন, এবং বিহারীলালের **ভারতী** জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ সংখ্যায় প্রকাশিত **"ব্যাকরণ প্রসঙ্গ"** নামক রচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে তাঁর সম্পর্কে বলেন—

> ......"এইরূপ বঙ্গের ভাষা বিচ্ছেদ ও ব্যাকরণ প্রসঙ্গ লইয়া যখন আলোচনা চলিতেছিল, সে সময় ব্যাকরণ প্রসঙ্গ লইয়া একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনা করেন। তাঁহার সঙ্গে আমার সেকালে

কলিকাতাতেই একদিন কোথাও আলাপ হইয়াছিল, কোথায় আজ তাহা আর আমার মনে নাই, সম্ভবত বাগবাজারের দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ি, কিংবা সাহিত্য পরিষৎ ভবনে। তাঁহার হাতের লেখা ছাপার লেখাকেও হার মানাইত। সেদিন আলাপ ও আলোচনা হইয়াছিল ব্যাকরণ প্রসঙ্গ লইয়া। মনে পড়ে অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার নাম বিহারীলাল গোস্বামী।"

বিহাবীলালেব হস্তলিপিব পূর্ণ পৃষ্ঠা নমুনা মেঘদূত অধ্যায়ে দেখা যাবে।

এরপর তিনি বিহারীলালের 'ব্যাকরণ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি বম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন (গদ্য রচনা বিভাগে সেটি মুদ্রিত হল) এবং পরিশেষে মন্তব্য করেন প্রায় ষাট বছর আগে ভারতীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২) বিহারীলাল গোস্বামী মহাশয় সেকালের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গভাষা ও ব্যাকরণ প্রসঙ্গ লইয়া যে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই মনোরম প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বিংশ শতকের বিভিন্ন দিক দিয়া যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতে চলিয়াছে, তাহাতেও বিশেষ ভাবে ভাবিবার অবকাশ আছে। সেকালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে যে, দলের সৃষ্টি এবং মতবৈষম্য ঘটিয়াছিল তাহার একটি সুন্দর সমাধানও আমরা পাই। এ বিষয় লইয়া বর্তমান যুগের সাহিত্যিক ও ব্যাকরণ-বিদেরাও অনেক কিছু ভাবিবার অবকাশ পাইবেন।

(যুগান্তর ১০।৪।৬০)

পিতৃদেব সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি

তিনি সহজ ও সরল জীবন যাপন করতেন। বিলাসিতা বর্জিত ছিলেন। তখন অর্থাৎ তাঁর চাকরি জীবনের সময় জিনিসপত্রের দাম খুব শস্তা ছিল, প্রতি মাসে পাঁচ টাকা হলে বেশ সচ্ছল ভাবে চলে যেত। দুতিন পয়সার বাজার হাতে বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল, এ কথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এজন্য সংসারের ভাবনা তখন আদৌ ছিল না। আর ঠিক এই কারণে বাবা আত্মগত ভাবে সাহিত্য চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন বিনা দুশ্চিন্তায়। শোক পেয়েছিলেন আমার পরবর্তী ভাই সুবিমলের অকাল মৃত্যুতে (১৯০৯)। সেই সময় তিনি কিছুকাল সাহিত্যে বেশি ডুব মেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর ভাষা, ছন্দ ও কবিত্ব শক্তির জন্য। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চিঠি যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে। দৈবক্রমে দু একখানা রক্ষা পেয়েছে, তার প্রতিলিপি এ পুস্তকে দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ বাবাকে শিক্ষকরূপে পেতে চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। এ জন্য চিঠি লিখেছিলেন, সাক্ষাতেও বলেছিলেন। কিন্তু কেন তাঁব যাওয়া সম্ভব হয়নি সেকথা ফণীন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ থেকে জানা যাবে। একখানি আমি এখানে ছেপে দিচ্ছি।

ওঁ শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—
বোলপুর
বিদ্যালয়ে ইংরেজি অধ্যাপনার জন্য
শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। বেতন
পঞ্চাশ — বিদ্যালয় গৃহেই বাস করিয়া
অন্যান্য অধ্যাপকদের সহযোগে ছাত্রদের
পরিদর্শন ভার লইতে হয়। যদি এ কাজের
গ্রহণ করা আপনার অভিমত হয় তবে
তিনদিনের মধ্যে আমাকে খবর দিতে পারি-
লে বাধিত হইব। লোকের অভাবে ক্ষতি
হইতেছে অতএব আপনার মত জানাইতে
বিলম্ব করিবেন না। আমি ফাল্গুনমাস
এইখানেই যাপন করিব স্থির করিয়াছি
যদি সুবিধামত আমার সহিত সাক্ষাৎ
করা সম্ভবপর হয় তবে সকল কথার
আলোচনা হইতে পারিবে। আশা
করি ভাল আছেন। ইতি ৩রা ফাল্গুন
১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

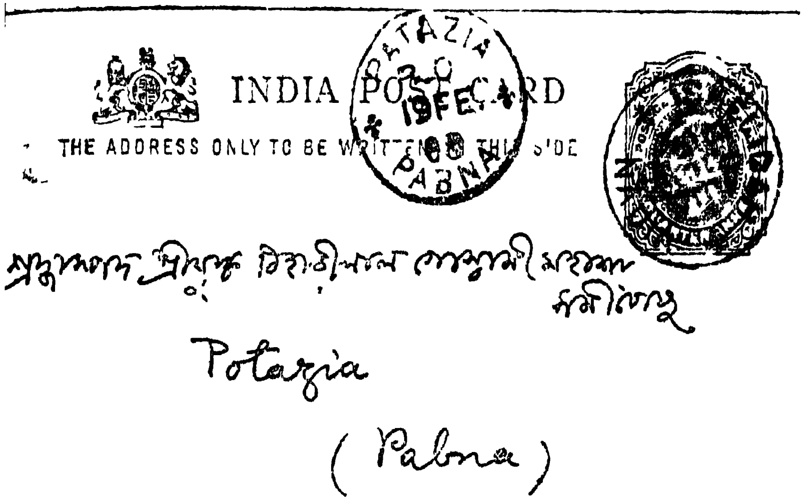

গত মাঘ-চৈত্র (১৩৭৬) সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় জগদানন্দ রায় বিষয়ে আমার লেখা একটি বড় প্রবন্ধ থেকে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকসংগ্রহ বিষয়ে যা লিখেছিলাম, সেই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি :

"জগদানন্দের ভাষার সরলতা বিষয়ে···আলোচনার আগে, পটভূমিতে যিনি আছেন, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর শিক্ষক খুঁজে বার করার সহজাত ক্ষমতাটা স্বীকার করে নেওয়া উচিত মনে করি। এ কথা সবারই জানা যে, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এস্টেটের কাজ থেকে ধরে না আনলে বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ অভিধান রচিত হত না। জগদানন্দ রায়কে এস্টেটের কাজ থেকে ধরে না আনলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার এমন ব্যাপকভাবে করবার মতো একা মানুষ আর কেউ ছিল না।"

এর পর আমার পিতার বিষয়ে লিখেছিলাম এইভাবে যে, গুণীলোককে ধরে আনার চেষ্টা এখানেও প্রকট। উপরের ঐ চিঠিখানা উদ্ধৃত করার পর লিখেছিলাম : লঙ্কেশ্বরবেশী জগদানন্দ ঋণশোধের সন্ন্যাসীবেশী রাজা ক্ষিতিমোহন সেনকে বলেছিলেন, "ঠাকুর চেলা ধরা ব্যবসা দেখছি তোমার।"—এই কথাটা পরিবর্তন করা যেত এইভাবে, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষক ধরা ব্যবসা দেখছি তোমার।"—বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের জন্য

রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ ও আগ্রহের অন্ত ছিল না, এগুলি তারই প্রমাণ। পিতৃদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি যে শিক্ষকরূপে বাঞ্ছনীয় ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

একটি কথা—যার আভাসমাত্র আমি শুনেছিলাম, সে কথাটি এখানে বলতেই হল। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাবার উপর কোনো অজ্ঞাত কারণে বিরূপ ছিলেন। তার প্রথম প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের কুমারসম্ভব বিষয়ে চিঠিতে লেখা আছে: চারু আজকাল এলাহাবাদে থাকেন আপনার লেখাটি মন্তব্যসহ পাঠাইয়া দিব যদি তাঁহারা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিহিত ব্যবস্থা করা যাইবে।"—চারুবাবু প্রকাশ করেন নি। দ্বিতীয় প্রমাণ গীতাবিন্দু প্রবাসীতে সমালোচনার জন্য পাঠানো হলে চারুবাবু সাত আট লাইন সমালোচনা করেন এবং লেখেন অনুবাদে "লালিত্যের অভাব আছে।" তিনি মূল গীতার কোন্ কোন্ অধ্যায়ে লালিত্য পেয়েছিলেন এবং অনুবাদে তা পাননি সে কথার অবশ্য উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া আরও কয়েকটি কথা ছিল (চিত্র বিষয়ে) যা সত্য নয়। তৃতীয় প্রমাণ, ভাষায় শব্দের পরিবর্তন কিভাবে হয়, কখনও কারণে কখনও অকারণে, এ বিষয়ে বাবা ছোট্ট একটা মনোজ্ঞ রচনা প্রবাসীতে পাঠানোমাত্র চারুবাবু তা ফেরৎ দিয়েছিলেন। এই শেষোক্ত ঘটনা বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা হলে বলবার কিছু ছিল না, কারণ লেখা মনোনীত হয় কাগজের পক্ষে প্রয়োজনীয় বোধে। কিন্তু তিনটি ঘটনা একসঙ্গে দেখলে অর্থটা অন্য রকম দাঁড়ায়। সাহিত্যিকদের মধ্যে বিদ্বেষ থাকা অস্বাভাবিক নয় কিছু। তবু ঘটনাটি এ স্থলে উল্লেখযোগ্য মনে হল, কারণ ফেরৎ পেয়ে বাবা হেসে বলেছিলেন ফেরৎ দেবে জানতাম। প্রবাসীতে বাবার লেখা একটিও প্রকাশিত হয়নি 'অবাঞ্ছিত' হিসাবে।

স্কুল পরিদর্শকদের মতে

হেডমাষ্টার রূপে বাঙালী ও ইংরেজ স্কুল পরিদর্শকগণ বিহারীলালের ইংরেজিতে অধিকার বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথনভঙ্গি এবং ক্লাসরুমে পড়াবার রীতিতে খুবই প্রীতি হয়ে যে সব প্রশংসাবাণী তাঁর সার্ভিস বুকে লিখে গেছেন, তা এই :

The Headmaster is a very capable man and I find everything in good order, and well-managed for the most part as far as it depends on him.

N. H. Hallward
Officiating Inspector of Schools,
Rajshahi Division
8. 8. 1903

I was very pleased with what I saw of this school and shall take great interest in its development.

C. W. Peake
Officiating Inspector of Schools, R. D.
30, 7. 1904

I place the result at the Entrance Examination to the credit of the Headmaster.

W. Booth
Inspector of Schools, R. D.
11. 8. 1905

Babu Biharilal Goswami, B. A., Headmaster of Potajia High English School is a competent man and he is doing his duties creditably.

P. Chatterjee
Inspector of Schools, R. D.
29. 7. 06

I am very favourably impressed about the qualifications of the Headmaster, Babu Biharilal Goswami.

Sig. Ill,
Inspector of Schools, R. D.
30. 8. 07

Delighted with what I saw of him. A rare find these days.

Sig, Ill., I C. S.
S. D. O. Sirajganj
21. 2. 24

অঙ্কন পটুত্ব সম্পর্কে পরিদর্শকদের অভিমত

Babu Biharilal Goswami B. A. Headmaster of Potajia H. E. School has shown me several of his pencil drawings. I consider them excellent and equal to any of the productions of the trained drawing masters of Zilla schools, that I have seen yet. He evidently possesses considerable natural talent in this direction.

C. W. Peake
Offg. Inspector of Schools, R. D.
31. 7. 04

বাবার মৃত্যু উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে আমাকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তা এই—

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইলাম। একদা তিনি আমার সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার রচনাবিশেষে আমি বিস্ময় বোধ করিয়াছি। সাধারণের কাছে তাঁহার লেখার যথেষ্ট প্রচার হয় নাই, তিনি জনতা হইতে দূরে ছিলেন — আশা করি তাঁহার কীর্ত্তি সাহিত্যক্ষেত্রে অগোচরে থাকিবে না, তোমাদের জন্য আমি সান্ত্বনা ও কল্যাণ কামনা করি। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৩৮

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুবাদ বিভাগ

কুমারসম্ভব

মেঘদূত

গীতাবিন্দু

পন্দনামা

কুমার-সম্ভব

বঙ্গদর্শন নবপর্যায়, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩০৮-১৩১৬)। এই মাসিকে বিহারীলালের অনুবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ :—

১। ১৩১২ সাল (১৯০৫ সন) শ্রাবণ ও ভাদ্র, ৫ম সর্গ, তপস্যার ফল।

২। ১৩১৪ সাল (১৯০৭ সন) আষাঢ়, চতুর্থ সর্গ, রতিবিলাপ।

৩। ১৩১৫ সাল (১৯০৮ সন) ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, ৭ম সর্গ উমাপরিণয়।

লেখাগুলি সবই রবীন্দ্রনাথের ঠিকানায় পাঠান হত। একখানি চিঠিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে ২৩শে ফাল্গুন ১৩১৪ তারিখে বিহারীলালকে লিখছেন—

"আপনার অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে পাঠাইয়া দিলাম।"

অনুবাদ সম্পূর্ণ হলে সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়েছিল, অনুরোধ ছিল, পুস্তকাকারে মুদ্রণের পূর্বে যদি কোনো সংশোধন প্রয়োজন মনে করেন, তা যেন তিনি অসঙ্কোচে করেন।

এই সময় (১৯০৯) বিহারীলালের দ্বিতীয় পুত্র সুবিমলের কলকাতা শহরে মৃত্যু ঘটে। পাণ্ডুলিপির প্রথমে যে কবিতাটি আছে, সেটি তার উদ্দেশে লেখা। পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে যে চিঠিখানি লেখেন তার প্রতিলিপি পরের তিন পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল। এই চিঠিতে ঐ কবিতাটির উল্লেখ আছে। কুমারসম্ভব মুদ্রণ বিষয়ে কিছু তথ্য প্রথম দিকে 'নিবেদন ও নানা পরিচয়' অধ্যায়ে আছে।

ষষ্ঠ সর্গ (উমার বাগ্‌দান হেমলতা ঠাকুর সম্পাদিত বঙ্গলক্ষ্মী মাসিকের ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

কুমারসম্ভব শোভন সংস্করণ রূপে মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সনে।

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন —

ছন্দ

ও আপনার কারুশিল্পে পূর্ণ আলপনার
কুমারসম্ভবের অনুবাদ আমি
হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইনা।
আপনি যে দুঃসাধ্য কাজে আশ্চর্য্য
সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা
আমাদের কাহারও দ্বারা সম্ভব
হইতে পারে বলিয়া আমি মনে
করি না অতএব ইহার সংশোধনচেষ্টা
করিতে গেলে ইহাতে বিকৃতি
ঘটাইবারই আশঙ্কা আছে।

হস্তলিপির প্রারম্ভের কবিতাটি পড়িয়া এমন একটা বেদনা অনুভব করিলাম যাহা যেমন অসহায়, তেমনি অসামান্য। সমবেদনা নিবেদন করিতে পারি, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার শক্তি আমাদের হাতে নাই।

তবু আর কারো এলাকাতে থাকে সেখানে আপনার লেখাটি আমার মন্তব্য সহ পাঠাইয়া দিব। যদি তাঁহারা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তবে বিহিতব্যবস্থা করা যাইবে।

তুমি সাময়িকার কবিতাটি হস্তগত

হয় নাই। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩১৬

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত চিঠিতে ছন্দ আবিষ্কার নামক যে কবিতাটির কথা আছে সেটি এই :

ছন্দ আবিষ্কার

ভারতী, আষাঢ়, ১৩১৬

সত্যেন দত্তের কবিতা ভারতীর অদ্য দেখলেম সকল সার।
মন্দাক্রান্তার রচনা সুমধুর কিম্বা সুন্দর নকল তার!
গম্ভীর গর্জন জান ত কামানের বয়া পদ্মার বিভল ধার?
বংশীর বাদ্যই সদা যে, কদাচিৎ আর-ডি-মণ্ডলের বিভঙ্গভার!
ইংলিশ বলছেন স্বদেশী অবেটার বাংলা ভাষাটার কাঠিন্যেই,
মুনসব পুঙ্গব ডেপুটি বাবু তার ঘণ্টা কিঞ্চিৎ স্বাধীন নেই।
দুর্বল মাস্টার কন কি অবতার? পূর্ব শিক্ষায় প্রাচীন তেঁই,
অন্দর লোকটাই বাংলা পড়িছেন যুক্ত অক্ষর না চিনতেই
বাংলার মধ্যেই রয়েছে এত গুণ, কিন্তু হই খুন বিতণ্ডায়,
পণ্ডিতবৃন্দের কত কি তকরার বিক্রি হোক সব দুগণ্ডায়।
মেঘদূত ছন্দের হয়েছে অনুবাদ বাংলাতেই, নয় উগাণ্ডায়।
মণ্ডার লক্ষণ লভেরে সবে শোন মুণ্ড ভক্ষণ কে খণ্ডায়?
পদ্মের সন্ধান রাখি না মোরা কেউ ছন্দ গুঞ্জন চমৎকার
করবেন কোন্ জন? নাহিক প্রয়োজন পঞ্জী দেখলেন গণৎকার!
নিন্দন বন্দন না মানে কিছু যেই এমনি হায়রে মন মহৎ কার?
অন্নের শঙ্কায় না টানে অনুখন টঙ্কা পায় ঋন ঝনৎকার॥

রাজধানী বহুদূর তারি ক্রূর কক্ষে
ক্ষীণ তনু দিনযামি ধরি আমি বক্ষে
কাটাই আড়াই মাস ! বড় আশ চিত্তে
সারিয়া উঠিবি ফিরে লুটিবিরে নৃত্যে ।
বাহিরিলে 'কুমারের' সপ্তম সর্গ*
সঁপি দিনু অবিপদে কবি-পদে অর্ঘ্য ।
আট বছরের মুনি পাঠ শুনি তৃপ্ত
ক্ষণ তরে যেত ব্যথা হত আঁখি দীপ্ত ।
ঘরে গেলে কি কি ছবি লিখিবি স্বহস্তে
কহিলি যে চাঁদ মুখে আজ তাহা অস্তে ।
পাশ কেটে যাস বাড়ি আমাদের পূর্বে
হতভাগা পিতা মাতা কত মাথা খুঁড়বে ?
সব সাধ এ জীবনে হৃদি সনে চূর্ণ,
তোর সেই শিশু আশা কর বাছা পূর্ণ ।

---

*বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১৫

ভূমিকা

কুমার-সম্ভব কাব্যে উমার "সম্ভব" বা জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারের সম্ভব বা জন্ম-"সম্ভাবনা" পর্য্যন্ত সাতটি সর্গ প্রচলিত। শিবের সহিত পার্ব্বতীর পরিণয় হইলেই দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের জন্ম সম্ভব হয়। সেই জন্যই মহাকবি কালিদাস স্বয়ং সাত সর্গের অধিক বর্ণনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। "কুমার-সম্ভব" এই নামটিও হরগৌরীর পরিণয়ান্তে সুদূর বৃত্তান্ত সমূহের সূচনা করে না। সুতরাং কাব্যের অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্য্যন্ত সমগ্র অংশ অন্য হস্তে রচিত হইয়া থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক।

কুমার-সম্ভব কাব্য লইয়াই কালিদাস প্রথমে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। কবিত্বরস কানায় কানায় পূর্ণ হইলেও তলে তলে পাণ্ডিত্য ফলাইবারও প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। প্রথম সর্গে, নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যের "সিনেমা" তুলিয়া তাঁহার গৃহে উমার জন্ম ও বাল্যজীবন, এবং দ্বিতীয় সর্গে, তারক-দৈত্য-নির্জ্জিত দেবগণের ব্রহ্ম-সমীপে গমন পূর্ব্বক প্রতিকার প্রার্থনাদি বর্ণনায়, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য পাশাপাশি হাসাহাসি করিয়া চলিয়াছে। তৃতীয় সর্গে, মদন ভস্ম হইতেই কবির হাত ক্রমশ পাকিতেছে—সুকুশল তুলিটি ধরিয়া ছবির পরে ছবি আঁকিতেছে, ফলত তৃতীয় সর্গে মদন-ভস্ম, চতুর্থে রতি-বিলাপ, পঞ্চমে পার্ব্বতীর প্রেমপরীক্ষা, ষষ্ঠে সপ্তর্ষির ঘটকালী এবং অবশেষে সপ্তমে উমার বিবাহ—ইহাদের প্রত্যেকটিই "ছোট" গল্পের পরাকাষ্ঠা! মধুর শব্দের পর সুমধুর শব্দ, সুচিত্র ছত্রের পর বিচিত্র ছত্র, উজ্জ্বল শ্লোকের পর সমুজ্জ্বল শ্লোকের সন্নিবেশে এক-একটি সর্গ যেন এক-এক নর নিটোল মোতির মালায় গ্রথিত হইয়া সাতটি সর্গ এক গাছি নাতনরীতে পরিণত। কোথাও এতটুকু খুঁত নাই, এতটুকু চ্যুতি নাই। কোথাও কথার এতটুকু জড়তা নাই, এতটুকু জোড়াতালি নাই! এইরূপ রস-রচনার পরে অষ্টম সর্গাদির বর্ণনায় যথেষ্ট কষ্টকল্পনা, মহান্ মুদ্রাদোষ ও অশেষ অশ্লীলতা পরিদৃষ্ট হয়। এই অংশের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও নাই; মনস্বী মল্লিনাথও টীকা করেন নাই।

কুমার-সম্ভব মাত্র সপ্ত সর্গাত্মক হইলে মহাকাব্য নামে পরিচিত হইবে না এ আশঙ্কা বোধ হয় কালিদাসের মনে উদিত হয় নাই। অথবা, কবি হয়ত মহাকাব্য লিখিতেই প্রথমে মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, স্বীয় ইষ্টদেবতা হরগৌরীকে লইয়া কাব্যচ্ছলেও ছেলেখেলা চলে না, তখনই সপ্তম সর্গে নব দম্পতীকে নেপথ্যে পাঠাইয়া যবনিকা খাটাইয়া আসর হইতে সরিয়া পড়িলেন। কিম্বা, কবি হয়ত ভিন্ন নামেই মহাকাব্যখানির লেখা আরম্ভ করেন, তাহার পরে সপ্তম সর্গের অন্তেই লেখা বন্ধ করিয়া কুমারের সম্ভাবনা হইল এই বিবেচনায় ইহার নাম "কুমার-সম্ভব" রাখেন।

—অনুবাদক

কুমার-সম্ভব

প্রথম সর্গ

উমার জন্ম

আছে উত্তর দিশি দেবাত্মা ধরিয়া
হিমালয় নামে ওগো সারা নগ সেরা যে,
পূব পশ্চিম ভিতে পয়োধিতে পড়িয়া
মাপারি যেন দাঁড়ি হেন সে রাজে। ১

যাঁরে বাছুরের মত ধরি' যত পাহাড়ে—
দোহন-কুশল মেরু দোহাল সে হইল,
কত-না মহৌষধি, রতনো কি বাহা রে,
পৃথু-মতে* ক্ষিতি হ'তে দুহিয়া যে লইল। ২

অগণিত মণি নিত' খনি যাঁর বিতরে,
হিমানীতে কি হানিতে পারে তাঁর সুষমা ?
এক্-ই দোষ ডুবে' যায় শত গুণ ভিতরে
ষোলকলা শশি-কোলে কলঙ্ক উপমা ! ৩

সিন্দূরে গৈরিকে কিন্নরী ললনা
বিভ্রম ভূষা করি বিহরিছে শিখরে,
ধাতু-আভা লেগে' যবে মেঘে শোভে ছলনা
অকাল সাঁঝের মত পর্ব্বত-উপরে। ৪

*কথিত আছে পুরাকালে পৃথু রাজার আদেশে পৃথিবী গো রূপ ধারণ করিলে পর্বত সকল হিমালয়কে বৎস কল্পনা করিয়া তাঁহাকে দোহন করেন। দোহনকালে পৃথিবী মাতার ন্যায় স্নেহবশতঃ হিমালয়কে ক্ষীররূপে পরিণত মণিরত্নাদি প্রচুর পান করান। এই জন্যই হিমালয় অনন্ত রত্নের আকর।

কটিতটে চলন্ত জলদের নিম্ন
ভুঞ্জি সানুর ছায়া সিদ্ধেরা সমুদয়
বৃষ্টির জলে পড়ে' হ'লে পরে খিন্ন
রোদ্দুরে গিরিচূড়ে লভিতেছে আশ্রয়। ৫

দ্রব হিমে বিধৌত রুধির সে চরণে,
করী বধি' গিরি-পথি পলাইছে কেশরী—
নখরের ফাঁকে তার মুকুতার ক্ষরণে
কিরাতেরা ফিরে তারে সন্ধানি যে-করি'। ৬

করি-শিরে বিরচিত বিন্দুর মত-না
সিন্দূর ধাতুরাগ-সুলিখিত আখরে
কিন্নরী কামিনীরা প্রেমলিপি কত-না
ভূর্জ্জের পাতে রচে পর্ব্বত-শিখরে। ৭

কন্দর-মুখ হতে সমীরণ ছুটায়ে'
বন্ধ্র পূরিছে গিরি বন-বেণু-বংশে;
কিন্নরে গান ধরে কড়ি সুর উঠায়ে'—
তাহাদের সঙ্গীতে তান দিতে মন সে! ৮

কপোলের কণ্ডুতি করিবারে বিনোদন
মাতঙ্গ দেবদারু-কাণ্ড সে ঘরষে;
সুমধুর ক্ষীব ধারা ঝর ঝরি' অনুখন
শিখরীর সানুদেশে সুগন্ধ বরষে! ৯

বিহরে বনিতাসনে বনেচর ব্যসনী—
গুহাগৃহে আহা মরি আলো করি বিতরণ
ওষধি সকল সেথা জ্বলে সারা রজনী
বাসর-প্রদীপ-পারা। তৈলে কি প্রয়োজন। ১০

চলে' যেতে পদ-তলে যন্ত্রণা বড় যে—
এ হেন তুহিনে ঘন ঢাকা বন-পন্থ,
তবু দুর্ব্বহ ভার শ্রোণী আর উরোজে
কিন্নরী ছাড়িতে না পারে গতি মন্দ! ১১

রবি হ'তে রাখে গিরি সুগভীর কুহরে
দিন-ভয়ে লীন হয়ে' আসে সেথা যে আঁধার,
করুণা শরণাগত ক্ষুদ্রেরো উপরে,
মহতের' পরে যথা, সর্ব্বথা সুচেতার! ১২

লাঙ্গুল বিতাড়িয়া বিথারিয়া আ মরি,
কি সুষমা শশিকর-সমতুল সিত তার—
কম কেশ দুলাইয়া সমুদয় চমরী
করিছে নগেশ নাম সার্থক নিত' তাঁর। ১৩

অংশুক হরণেতে শরমেতে ঘাবড়ি
কিন্নর বধূ হায় সদুপায় নাহি পায়।
দৈবাৎ দরী-গৃহে দুয়ারটি আবরি
লজ্জিত মেঘ রহে নব যবনিকা প্রায়। ১৪

গঙ্গার নির্ঝর-জলকণা লয়ে' গো,
অবিরত দেবদারু কম্পিত করিয়া,
বর্হ উড়ায়ে' বায় মৃদু যায় বয়ে' গো—
তাহে ব্যাধ মৃগয়ায় শ্রম লয় হরিয়া। ১৫

সপ্ত ঋষিরা প্রাতে নিজ-হাতে তুলিয়া
শির'-সরে সরসিজ রাখেন যা' অবশেষ,
আ মরি, মরীচিমালী নীচু নগে বুলিয়া
উন্মুখ ময়ূখে তা' করে সেথা উনমেষ। ১৬

সোমলতা প্রসবে সে, হোমের যা' সুসাধন,
ধরণী ধারণে, ধরে ক্ষমতাও সে যথা,
বিধাতা এতেক গুণ তাঁহে করি' দরশন
যজ্ঞের ভাগ সনে দেছে নগ-রাজতা। ১৭

মেরুসখ গিরিরাজা কুলধাঁজা বজায়ে'—
মুনিদেরো পূজনীয়া, নিজসমা শ্রেয়সী,
মেনা দেবী, পিতৃদেরি মনোজাতা প্রজা এ,
যথাবিধি মানিলেন আপনার প্রেয়সী। ১৮

কিছুদিন বহে আরো, দোঁহে আরভিলা যে
মনোমত পরিপূত প্রেমরীতি সর্ব্ব
নবযৌবনে মেনা কিবা সুশোভিলা যে
শুভকালে রূপসীর উপজিল গর্ভ। ১৯

প্রসবিলা নগজায়া নাগবধূপতি সে
সাগরের প্রিয়সখা মৈনাক শিখরী—
বাসর, সবারি পাখা ছেদে ক্রোধমতি যে,
তারে শুধু অশনিতে দেয়নিক' বিদরি'। ২০

তার পরে, পিতৃঘরে অনাদৃত-পতিকা
দক্ষজা—শিব-জায়া ছিলা যিনি গর্ব্বে—
সতী সতী যোগ পথি ত্যজি তনু-লতিকা
জনি* তরে অবতরে মেনারাণী-গর্ভে। ২১

নগরাজা স্বীয় জায়া সংযতা মেনকায়
করিলা সাধন শুভ-তনয়ার প্রসূতি—
কৌশলে সংযুত হ'লে পূত নীতিকায়
উৎসাহ যথা আহা জনমায় বিভূতি। ২২

*জনি—জন্ম

বিশদ হইল দিশি, সুবিমল বহে বায়,
শঙ্খ বাজিল ঘন, ফুলরাশি বরিষে,
স্থাবর কি জঙ্গম শরীরীরা সমুদায়
জনম দিবসে তাঁর ভাসিলরে হরিষে। ২৩

তনয়ার রূপরাশি ছুটে দিশে বিদিশে,
জননীর শোভা তাহে ফুটে' আরো ঢল ঢল,
নব ঘন গরজনে বিদূরের* ভূমি সে
মণির মুকুলে খুলে' করে যেন ঝলমল। ২৪

দিনে দিনে নগবালা লাগিলেন বাড়িতে—
শুক্লা নিশিতে সে যে সুধাংশু-লেখা প্রায়,
তনু-লতা ফুটিল তা' নিতি নব ললিতে,
চাঁদিনীতে যথা কলা ক্রমে ঝলা দেখা যায়। ২৫

নগেন্দ্রকুমারীরে, কুলনাম দিবারে,
বন্ধুরা পার্ব্বতী বলে ভাল বাসিয়া,
উ—মা! বলি তপে চলি' যেতে, মাতা নিবারে
সুমুখীর উমা নাম তাই জোটে আসিয়া। ২৬

গিরিরাজ তাঁরি আজ কত মেয়ে, ছেলে যে,
তবু নহে তিরপিত নিরখিয়া গিরিজায়,
মধু মাসে ফুল রাশি অলি সব ফেলে যে
কেবলি সে নবচূত মঞ্জরী ফিরি চায়। ২৭

প্রভাবতী শিখা পরি' প্রদীপ সে যেমনি,
সুরধুনী শিরে ধরি' স্বরগের সিঁড়ি প্রায়,
মার্জ্জিত ভাষা লভি সুকবির মতনি
পূত ও শোভিত আজ গিরিরাজ গিরিজায়। ২৮

* বিদূর-পর্বতজাত মণিকেই বৈদুর্যমণি বলে।

গঙ্গার বালুকায় বিরচিয়া বেদিকা,
কন্দুক লয়ে' আর কৃত্রিম ছেলেরে
সহচরী সাথে করি শিখরীর বালিকা
বাল্যের খেলা যত অবিরত খেলেরে। ২৯

শরতে মরালী যথা ফিরে ভাগীরথীতে,
ওষধিতে ভাসে ভাতি আসে যবে রজনী
উপদেশ-কালে তাঁর মেধাবিনী মতিতে
অতীতের বিদ্যাও উপজিল আপনি। ৩০

গহনা কহ না তবু অঙ্গে সে আভরণ,
মদ্য না যদি কহ মদিরারি মোহ সে,
কামেরি কুসুম ছাড়া কহ সে কি প্রহরণ
বাল্যের পরে বালা পড়িলা যে বয়সে। ৩১

উন্মীলি' উঠে যথা তুলিকাতে ছবি গো,
সুরয-কিরণে ফুটে পদ্মটি যেমনি,—
গৌরীর তনুলতা চৌরস-শোভিত
ফুটিয়া উঠিল নব যৌবনে তেমনি। ৩২

ধরা তলে যবে তার পা দুখানি লুটিত
উচ্চ আঙুল হ'তে নখ আভা বিছুরি'
থরে থরে রাঙা রাঙা যেন আহা, ফুটিত
চলন্ত থল কমলেরি কম মাধুরী। ৩৩

যৌবনে নত তনু নগরাজ-বালিকা
লীলা মদে মৃদু পদে সঞ্চরে অচলে,
হংসের কাছে বুঝি উপদেশ মালিকা
লভেছিলা নূপুরের শিঞ্জারি বদলে। ৩৪

নিটোল ক্রমশ সরু, নহে অতি আয়ত
জঙ্ঘা যুগল গড়ি,' হেন লয় এ চিতে
অঙ্গ গড়িতে আরো বিধাতারো না-কত
যতন লেগেছে পুন' মধুরিমা রচিতে। ৩৫

করীন্দ্র কর সে যে কর্কশ পরশন,
একান্ত সুশীতল কদলীর তরু যে
লভিয়াও ও যে তারা তাই চারু দরশন
উপমানে এরা মানে সেরা তাঁরি ঊরু যে। ৩৬

ইহাতেই অনুমানে করা যায় নিরূপণ
কি সুষমা দেখ তার মেখলার অঙ্গে
পরেশ যে পরে তাহা করে আহা আরোপণ
আপনারি আর নারী-আশাতীত অঙ্কে। ৩৭

যুবতীর সুগভীর নাভি কূপে পশি',ত
কচি কচি রোম রেখা একটু কি বিকাশে
বসনের কষি ছেড়ে উঠিছেরে অসিত
যেন তাঁরি মেখলারি ধুকধুকি শিখা সে। ৩৮

ডমরুর মত সরু কোমরের মাঝারে
ত্রিবলী ধরিলা বালা আমরি কি সুন্দর
নব যৌবন দিল বিরচিয়া আহা রে
অতনু চড়িবে বলি যেন সিঁড়ি থরে থর। ৩৯

এ উহারে নিপীড়িয়া চারু নয়নার গো
শ্যাম-মুখ শুভ্র উরোজ দুটি বাড়িছে—
এমনি যে তাহাদের মাঝখানে আর গো
মৃণাল-সূতাও ঠাঁই লভিতে না পারিছে। ৪০

শিরীষ কুসুম জিনি আ মরি কি সুকুমার
বিরাজিল আজি তাঁরি ভুজ অনবদ্য !
নহিলে কেমনে পরে পরাস্ত হয়ে' যার
করিবে তা' পিনাকীর গল পাশ ছদ্ম ? ৪১

যৌবন-বন্ধুর' বক্ষের উপরি
নিটোল মুকুতা ফল গাঁথা হায় লুটিছে,
মনোলোভা চারুশোভা ফুটাইয়া আ মরি
যেন আজি এ উহারি ভূষা হয়ে উঠিছে ! ৪২

চাঁদে যে রে কমলেরে ভুঞ্জিতে না পারে,
পাবেন কমলে গিয়া ও অমিয়া-লোক কি ?
সুমুখী উমার মুখ লভি' একই আধারে
সঞ্চিলা দোঁহা-সুখ চঞ্চলা লক্ষ্মী। ৪৩

শুভ্র কুসুম হলে' রাঙা পলে নিহিত,
অথবা মুকুতা ফল কিশলয় নধরে—
তবেই ধরিত শুধু তুলনা সে বিহিত
মধুর হাসির তাঁর ও বিম্ব-অধরে। ৪৪

সুধার সু-ধার পারা সুমধুর আওয়াজে
সুভাষিণী নগবালা কথা যবে কইত,
মনে বলে কোকিলারো সুকণ্ঠে গাওয়া যে
টুটা-তারে নিনাদিত বীণারব হইত। ৪৫

চপল পবনে নীল পঙ্কজ তুলনা—
ডাগর চোখের কি বা চকিত সে চাহনি,
মৃগবধূ হতে বালা লভিলা কি বল না,
অথবা তা মৃগীরেই প্রদানিলা আপনি ? ৪৬

কাজলে তুলিকা-যোগে যেন ওগো রচিত
লীলায়িত সুদীর্ঘ ভুরু যুগ মরি তাঁর—
নিরখিয়া যার শোভা অতনুরো ও-চিত'
ধনুর গরব যত করিয়াছে পরিহার! ৪৭

শরম জানিত যদি পশুজাতি-মর্ম্ম,
নিশ্চয় তবে আজ নগরাজকুমারীর
চিকণ চিকুর পাশ হেরি মনোরম্য
পুচ্ছেরি তুচ্ছতা হ'ত যত চমরীর! ৪৮

উপমার যাহা কিছু সব লয়ে' আহা রে,
যথাবিধি ক্রমশ' তা করি হোথা বিনিবেশ,
সযতনে বিধি বুঝি নিল সৃজি, তাঁহারে
একাধারে দেখিবারে মধুরতা সবিশেষ! ৪৯

একদা নারদমুনি ভ্রমণেরি সাধনে
নগেশ-নিবাসে আসি গিরিজারে দরশি'
কহেন,—"হবেন মেয়ে প্রণয়েরি বাঁধনে
পিনাকপাণির একা পরাণের প্রেয়সী। ৫০

পড়িলেও তেঁই বালা এই ঢালা বয়সে
আর কোনো বর নাহি সন্ধানে হিমালয়;
পরিপূত ঘৃতাহুতি কৃশানুর* বড় সে
কোন্ তেজে পড়িবে যে, কে তাহারে খুঁজি' লয়? ৫১

না চাহিতে হরে সুতা অরপিতে মন যে
নাহি সরে নগেশের, আগে কহি' আপনি,—
প্রার্থনা পূরিবে না ভয়ে সাধু জন যে
সাধের কাজেও রন উদাসীন যেমনি। ৫২

*বহ্নির

অতীত জনমে যবে সতীরূপে যুবতী
দক্ষের কোপে তাঁর ত্যজিলেন অঙ্গ—
সন্ন্যাসী হয়ে' শিব সেই দিন অবধি
অন্যা নারীর আর করেন নি সঙ্গ। ৫৩

আরাধনে তপোধন মৃগাজিন পরিয়া,
গঙ্গার বারি যেথা দেবদারু সিঞ্চে,
বহে মৃগনাভি বাস, গাহে কিন্নরীরা—
নগেশের সানু হেন নিবসিয়া নি'ন্ যে। ৫৪

নমেরু কুসুমশিরে প্রমথের সঙ্ঘ,
পরি' সুখ পরশন ভূর্জের বল্কল,
মন' শিলা ধাতুরাগে বিলোপিয়া অঙ্গ
উপবেশে সেথা এসে যেথা জতু ঝলমল। ৫৫

সংহত হিমশিলা খুরধারে চিরিছে—
মদকল বলদ সে সুবিশাল ঝুঁটিদার,
সভয়ে গবয়ে তারে কিছু হেরি ফিরিছে—
সিংহ গরজে যবে আসে রব ছুটি তার। ৫৬

অষ্ট মূরতি মাঝে তাঁরি এক মূরতি
বহ্নি সে সমিধের সনে জ্বালি রাখিয়া,
নিজে ভব হয়ে' তপ'-সফলতা-প্রপতি
করিতে লাগিলা তপ না-জানি কি লাগিয়া। ৫৭

নগনাথ, অনঘ সে অমরের সহিত
মহেশে বহূপচারে পূজা করি সবিশেষ,
শুশ্রূষা তরে দুই সহচরী সহিত
সংযত তনয়ারে করিলেন সমাদেশ। ৫৮

সাধনারি বাধা নারী, জানিয়াও তবু গো
শিব তাঁরে সেবিবারে অনুমতি প্রদানে,
বিকারের হেতুতেও সুবিকৃত কভু গো
নহে যাঁর চিত'—তাঁরে ধীরে বলে প্রধানে। ৫৯

তুলিয়া পূজারি ফুল্ দল, মার্জ্জিতেন যজ্ঞ-ঠাঁই রে!
ক্রিয়াতে লাগে যে কুশ জল,—প্রত্যহই আন্‌ত তাই রে!
এমতি সেবিয়া তন্বীর শ্রান্ত যেই হইত গাত্র,
ভুলিত ভালেরি চন্দ্রের জ্যোছ্‌নাতেই নাইবা মাত্র! ৬০

মহাকাব্যের রীতি অনুযায়ী প্রতি সর্গের শেষ স্তবক ভিন্ন ছন্দে রচিত হয়। অনুবাদেও সে রীতি লক্ষণীয়। প্রথম সর্গের শেষে সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গ

ব্রহ্মলোকযাত্রা

এতেক দূরে তারকাসুরে তাড়িত দেববৃন্দ
ব্রহ্মলোকে চলিলা বয়ে' অগ্রে লয়ে' ইন্দ্র। ১

কাহারো মুখে নাহিক হাসি, সরোজী আসি উরিল—
সরোজ ঘুমা'-সরসে সবে স্বরয যেন ফুরিল! ২

বিশ্বপতি বাগীশ্বর চতুর্বানন-চরণে
প্রণমি' সবে বন্দে তবে সুসঙ্গত বচনেঃ— ৩

"সুচির আগে আছিলে ওগো আপন মাঝে আপনা,
ত্রিগুণে ভেসে' মূরতি শেষে ত্রিতয় সাজে যাপনা। ৪

অমোঘ ওজঃ তুমি যা, অজ, কারণ-জলে ফিঁকিলে,
তাহারি ফলে সৃষ্টি চলে বিশ্ব ভব নিখিলে! ৫

সৃজন তরে প্রথমে করে, আপন তনু খণি' তা
পুরুষ নারী সাজিলে, তাঁরা জগন্মাতা-জনিতা! ৬

আত্মকাল তুলনাধীন রাত্রিদিন নিতি গো
ঘুমাও যবে ভাঙন ভবে, জাগ' জগৎ হিতি গো! ৭

ত্রিগুণ যোগে প্রকাশি' লোকে মহিমা তুমি একেলা
সৃষ্টি-থাকা-প্রলয়-চাকা চালায়ে' কর কি খেলা! ৮

জগতে সৃজ, অজ যে নিজ, নিখিলান্ত নিঃশেষ,
বিশ্বে আদি, অনাদি তুমি, অনীশ তুমি বিশ্বেশ! ৯

আপনি তুমি আপনা বোঝ' আপনি রচ আপনায়—
আপনা মাঝে প্রলয়ে মজ' আপনকারি প্রাপনায়। ১০

স্থূল সূক্ষ্ম, গুরু ও লঘু, তরল ওগো সুকঠিন,
প্রকাশ্য ও গুহ্য তুমি—ঐশ্বর্য্যে কি স্বাধীন! ১১

ত্রিবিধ স্বরে যে বেদে ধরে আদি অন্তে ওঙ্কার,
কর্ম্ম যেথা যজ্ঞ, ফল—স্বর্গ, তুমি কারু তার! ১২

প্রকৃতি বটে তোমারি নাম, ভোগে প্রবর্ত্তিনী যে,
পুরুষও তুমি সমুদাসীন, সাক্ষী শুধু তিনি যে! ১৩

দেবতাদেরো দেবতা তুমি, প্রপিতামহ-প্রপিতা,
তুমিই সৎ পরাৎপর, বিধিরো তুমি সবিতা। ১৪

হোতা ও হবিঃ, ভোজ্য ভোগী, তুমি যে চিররচম,
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, তুমি সে প্রিয় পরম। ১৫

স্তবন যত সমঞ্জস শুনিয়া অতি মনোহর,
কমলাসনে ফুল্লাননে দিলেন প্রতি-উত্তর; ১৬

প্রবীণ পুরা কবির চারি বদন পরসঙ্গে
সরস্বতী সার্থকতা লভিলা সারা অঙ্গে— ১৭

"এস গো যুগ-দীর্ঘভুজ স্বর্গবাসী সকলে,
'স্বকীয় বলি' যা কিছু বলি, রাখিছ নিজ দখলে? ১৮

বাছারা, আজি তোদের মুখে না দেখি জ্যোতি আগেকার—
কুয়াসা ঢাকা আনন আঁকা থাকে কি ভাতি তারকার? ১৯

নিবিয়া গেছে বহ্নি, শিখা উঠিছে নাকো ঝলকি—
বৃত্রহার বজ্রে ধার বিকুণ্ঠিত হ'ল কি? ২০

আরো যে, অরি-অজেয় পাশ বরুণ করে জড়িয়া
মন্ত্রবশে বীর্য্য-বসা' ফণীর দশা ধরিয়া। ২১

বিত্তেশের বক্ষে শেল বেজেছে যেন অজয়ে,
গদাটি ঘুচে,—ভগ্ন ভুজে তরুর যেন ধ্বজ'এ! ২২

অমোঘ যম-দণ্ড সমভূমিতে রেখা আঁকি যে
অগ্নি হারা আঙরা পারা কেবলি লাগে ফাঁকি যে! ২৩

ঐ যে দ্বাদশাদিত্য-রা ধারাল কর হারায়ে'
চিত্র পটে লিখিত প্রায় দৃষ্টিপথে দাঁড়ায়ে'! ২৪

ব্যস্ত আজি বায়ুরা—বুঝি স্বেচ্ছা গতি না জানে,
রুদ্ধ যদি না হবে নদী চলে কি স্রোত উজানে? ২৫

জটার জূটে গ্রথিত শশী পড়িছে খসি' লুটিয়া—
রুদ্রদেরও হুহুঙ্কার গেছে কি ধসি' টুটিয়া? ২৬

সামান্য যে বিধান, তারে বিতাড়ে বিধি বিশেষে—
তাহারি প্রায় তোদেরে হায় রোধেরে বড় কিসে সে? ২৭

কিসের তরে, বাছারা ওরে, আসিছ হেথা বুঝি তাই
জানি যে মোর রচিত ভবে রাখিছ সবে তোমরাই! ২৮

গুরুর পানে সুরেশ হানে সহস্রেক আঁখিয়া,—"
কমলবন উঠিল যেন মৃদুল বায় কাঁপিয়া! ২৯

হাজারো দিঠি জিনিয়া দুটি নেত্র উঠে উজলি,'
বৃহস্পতি বিধিরে কন বদ্ধ করি' আঁজলি; ৩০

'যা' বর্ণিলে, যথার্থই ধ্বস্ত মোরা এ হেন।
সবারি তুমি হৃদয়যামী, জানিবে নাকো সে কেন? ৩১

তোমারি বরে দৈত্যবর তারক আজি দুর্জয়
উদিয়া ধূমকেতুর সম ত্রিলোক-কে যে উচ্ছয়। ৩২

তাহারি পুরী সভয়ে ঘুরি কোমল কর পরশে,
কমল ফুল ফুটায় রবি কেবল ক্রীড়া সরসে। ৩৩

সকল কলা মিলায়ে সদা তারেই সেবে সুধাকর
না লয় রেখা মাত্র একা, শিবের শিরা শোভাকর। ৩৪

পাছে সে ওর পুষ্পচোর ভাবে এ ভয়ে সমীরণ
তাহারি পাশে বহিছে ধীরি পাশরি' যত উপবন। ৩৫

ঋতুরা তারি বাগানে মালী, আপনা পালি করি ভুল
সকলি এক সঙ্গে মিলি যোগায় খালি তারি ফুল! ৩৬

তাহারি ভেট দিবার মত রয়েছে যত রত্ন
জলধিবরে জঠরে ধরে করিয়া কত যত্ন! ৩৭

বাসুকিরাও, সারাটি নিশি দীপ্ত মণি শিরে তায়,
সেবিছে আসি অনির্ব্বাণ প্রদীপসম ঘিরে তায়। ৩৮

সুরেন্দ্রও কৃপার ভিখ্ মাগিছে আজি তারি হাত,
কত-না দূত পাঠায়ে তারি দিতেছে ডারি পারিজাত! ৩৯

এতেক সেবা পেতেছে কেবা? মথে সে তবু ত্রিভুবন।
দমিবে খলে অমঙ্গলে—কুশলে তিনি বশে নন। ৪০

করুণ করে দেবীরা যার চয়িত চারু পত্র,—
কল্পলতা যা' ছিল, সে তা' ফেলিল ছিঁড়ি দৈত্য! ৪১

অমরবালা বন্দিনীরা ঘুমালে সেই পামরে,
নয়নজলে নিশাস সম ঢুলায় গায় চামরে। ৪২

অরুণ-বাজি-ক্ষুণ্ণ আজি মেরুর চূড়া উপাড়ি'
লইল ক্রীড়া-শৈল করে' আপন ঘরে উহারি। ৪৩

হয়েছে আজ তুরগ রাজ উচ' উচ্চৈঃশ্রবা সে—
দৌঃপতির সুখ্যাতির মূর্ত্তিমতী শোভা সে। ৪৪

গঙ্গা শুধু গর্ভে ধরে হাতীতে ঘোলা হত জল,
রুয়েছে নিজ পুকুরে সে যে সোনার যত শতদল। ৪৫

ভুবন ভরা ভ্রমণ করা ঘুচিয়া গেছে দেবতার—
কি জানি আজ দানব আসি যানের পথে পড়ে তার। ৪৬

যজ্ঞ-হুত মোদের যত বহ্নিমুখে পড়ে, হায়
কাড়িয়া খায় মায়াবী, মোরা চাহিয়া থাকি নিরুপায়। ৪৭

অসুর-বধে মোদের মতে ফন্দি আর আঁটে না,
বীর্যবতী মহৌষধি সন্নিপাতে খাটে না। ৪৮

'সুদর্শনে' জয়াশা মনে যা' ছিল আহা দেবতার
কণ্ঠে ঠেকি' হইল একি আ মরি বাহা শোভা তার। ৪৯

ঐরাবতে জিনিয়া ঐ দৈত্যরাজ-করী যে
পুষ্করে ও আবর্ত্তকে বজ্রকেলি করিছে। ৫০

সেনানী তাই সৃজিতে চাই সুরারিবরে ছেদিতে,
যতিরা যথা সুকৃতি চাহে ভবের বাঁধ ভেদিতে— ৫১

স্বর্গ-সেনা বাঁচাবে যে-না, ত্রিদিব-রাজ যাঁ দিয়া'
জয়শ্রীরে বাঁদির সম আনিবে আজ বাঁধিয়া।" ৫২

গুরুর বাণী সমবসানে সরোজী ভাণে পরে যা'
সে তারো আগে সু-তার লাগে, গরজ শেষে ঝরে যা। ৫৩

"পূরিবে, বাছা, তোদের আশা, তিষ্ঠি থাক্ কিছু কাল,
আমি যে নিজে ভুঞ্জিব না সৃষ্টিপনা জঞ্জাল। ৫৪

আমারি হাতে বৃদ্ধি তার, ধ্বংস সে কি খাটে রে,
বিষের গাছ বাড়ায়ে আজ নিজে কি তাহা কাটে রে? ৫৫

'দেবেরো নহ বধ্য তুমি'! সাধে কি সাধি বর তার?
নহে ত সে যে তপের তেজে দহিত সারা সংসার। ৫৬

সমরে যদি সমুদ্যত তারে কে তবে জিনিবে?—
কেবল সেই শিবের তেজে সুতের জনি যে নিবে। ৫৭

কিন্তু হর দেবতা দড়; তমোর যিনি পরপার,
আমি কি হরি কেহই নাহি মহিমা জানি বড় তাঁর। ৫৮

উমার রূপে জুড়িয়া তবে ধূর্জ্জটির যত মন
চুম্বকেতে লৌহ সম আকর্ষিবি সযতন। ৫৯

* * *

তা' পরে শিতিকণ্ঠ-সুতে বরি' সৈনাপত্যে
খুলিবি সুর বন্দিনীর কবরী—বধি' দৈত্যে।" ৬০

এ কাজে তাঁরি ক্ষমতা ভারি, কুসুম যাঁর কার্ম্মুক,
তাঁরেই স্মরে অমরপতি, সমর প্রতি উৎসুক। ৬১

সরোজী চলি' গেলেন, বলি' এ হেন দেববর্গে,
বিহিত কাজে নিহিত মন, তাঁরাও যান স্বর্গে। ৬২

আঁজলি বাঁধিয়া আইলেন, পুষ্পধন্বাও,—কেমন তাঁর
প্রিয়ারি চুড়ীতে চিহ্নই হইল কণ্ঠের অলঙ্কার। ৬৩

প্রমদারি ভুরু-ভঙ্গীর তুল্য বঙ্কিম্ ধনুক তায়,
মধু ঋতু বঁধু সঙ্গীব হস্তে বৌলের বিশিখ্ ভায়। ৬৪

তৃতীয় সর্গ

মদন ভস্ম

স্বরের সব দূরে রাখি' রাজার হাজার আঁখি
একেবারে পড়িল সে মনোজেরি উপরে ,—
অনুগত জন-মাঝে যখন যে লাগে কাজে
তাহারেই প্রভুবা যে সমধিক আদরে। ১

বাসব, "আমারি এই আসনের সকাশেই
হেথা উপবিশ" বলি' ঠাঁই দিলা মদনে ;
স্বামি-কৃপা মানি' সাথে মন্মথ তাঁরি সাথে
গোপনে আলাপ হেন আরম্ভিলা কথনে ঃ— ২

"পুরুষে বিশেষ জান,'— দাসেরে আদেশ দান,'
কি করিতে হবে আজি ত্রিভুবন কাঁদিয়া ?
আমারে স্মরিয়া, প্রভো, যে দয়া দেখালে তব,
বাড়াবে অধীন তাহা কোন্ কাজ সাধিয়া ? ৩

"ত্রিদিব কামনা করি' মহা তপ সমাচরি'
অসূয়া কে জনমায়ে দিল তব মানসে ?
এ যোজিত-শর মম কার্ম্মুক নির্ম্মম—
পড়িবে ইহার কোপে নিশ্চয় জান' সে ! ৪

"কে আজি মুকুতি পথ, অবহেলি' তব মত,
পুনর্জনম-ভয়ে আশ্রয় করিল ?—
সে জনা যে, মনে লয়, কঠোর ভ্রূকুটিময়
কামিনীর কটাক্ষে বাঁধা আজি পড়িল ! ৫

"শুক্রেরি নিজ কাছে নীতি-বিধি শিখিয়াছে—
হেন কোন্ শত্রুর ধর্ম্ম, ও অর্থ
নাশিব বলনা, স্বামি, বাসনা-প্রনিধি আমি,
নদীর দু'ধারি যথা ভাঙে স্রোত মত্ত ? ৬

"প্রিয়' পরে দৃঢ় মতি, বল' হেন কোন্ সতী—
চারুতায় যারে চায় তব লোল চিত্ত ?
আপনি সে বর-নারী লজ্জা শরম ছাড়ি
ও-গ্রীবা জড়াবে তারি ভুজ ডোরে নিত্য ! ৭

"পর-প্রেম করে সাধে—তব এই অপরাধে
কে রমণী মনোবাদে পড়াইয়া চরণে
অপমান করে তব ?—ঘোর অনুতাপে দ্রব
তারি তনু ডারি' লব পল্লব-শয়নে ! ৮

"স্থির হোন্ ; অশনির বিশ্রাম দি'ন, বীর !
এ কুসুম-শরে মম কতম* সে সুরারি,
বাহু-বল হারাইয়া মরিবে না ডরাইয়া,
ক্রোধে কম্পিতা ধরা নারীরেও নেহারি' ? ৯

"ধরুক্ না ধনু ফুল ? তুমি যদি অনুকূল,
মধুরে লইয়া তবে শুধু এক সৈন্য
পারি সে পিনাকপাণি হরেরও ধীরতা-হানি
করিতে অবাধে আমি—থাক বীর অন্য।" ১০

উরু হ'তে সুরপতি করি তবে পদ-নতি—
স্থাপনায় পাদ-পীঠে বহু মান জাগিল,—
বাঞ্ছিত বিষয়েই ব্যক্ত-শকতি এই
মনসিজে অমনি যে কহিবারে লাগিল ;— ১১

*অনেকের মধ্যে কে।

সেথায় সে গিরি-বনে পঁহুছিয়া পর খনে,
ঋতুরাজ—মুনিদের সমাধির অরি সে,—
মনোভব অতনুর অভিমানে পরিপূর
মধুর মূরতি ধরি' বিরাজিলা হরিষে। ২৮

কুবের-পালিতা দিশে* সহস্র-রশ্মি সে
সময় বিলঙ্ঘিয়া সঙ্গত হইল ;
অমনি যেন গো দুখে দক্ষিণা দিক্ মুখে
দীর্ঘ নিশ্বাস সম সমীরণ বইল। ২৫

অশোক বিটপিকুল অমনি প্রসবে ফুল,
গুঁড়ি হ'তে ফুঁড়ি উঠে কিশলয় গয়না,—
শিঞ্জিত মল পায় সুন্দরী-দল হায়
আঘাতি' ফুটা'বে তার বিলম্ব সয় না। ২৬

কচি কচি কিশলয়ে পালক রচিয়া লয়ে'
চেতা'য়ে নূতন শর চূত-ফুল স্বরূপে।
ঋতুরাজ তারি পবে কামেরি নামাক্ষর
সারি সারি লিখি' দিল যেন কালো মধুপে। ২৭

বর্ণ বিপুল লুটে কর্ণিকা ফুল ফুটে—
কেবল সুরভি টুটে দুখী করে চিত্ত।
সারা গুণ একাধারে দিতে নাহি বিধাতারে
দেখা যায় হায় হা-রে এ জগতে নিত্য। ২৮

নব শশি-সম বাঁকা ঈষৎ মুকুল আঁকা
কিংশুক বিকশিল টুকটুকে রঙ্গে।
মনে লয়, ঋতুরাজ-সঙ্গে মিলনে আজ
বিরাজিল নখরাগ বণানীর অঙ্গে। ২৯

* উত্তর দিকে।

মধুশ্রী, অলিদলে বিরচিত কজ্জলে
বিচিত্র তিলক সে মুখানিতে ধরিয়া।
তরুণ অরুণ-ছলে অলক্ত-গোলা-জলে
চূত-কিশলয়-ঠোঁট নিল রাঙা করিয়া। ৩০

মৃগেরা, পিয়াল-তরু-কুসুম-পরাগে অন্ধ'
নয়নে চাহনি হারা,—ধাইল রে উদাসী
মাতালের মত ভুলে বাতাসের প্রতিকূলে;
সারা বনে পাতা ঝরে' পড়িল রে উছাসি'। ৩১

কোকিল সে মন-সাধে, আম্র-মুকুল-স্বাদে
কণ্ঠ কষায় করি' কুহরিল মধুরে—
মানিনী কামিনী তারি ভাঙিবারে মান ভারি
অতনু আপনি যেন মুখরিল চতুরে। ৩২

টুটি' গেল হিম-বল। ঠোঁটে আভা সুবিমল,
ফোটে মুখ আপাটল কুসুম ছাড়িয়া—
কিন্নর-কামিনীর উপজিল স্বেদ-নীর,
ঘুচিল তিলক-ফোঁটা উষ্ণতা বাড়িয়া। ৩৩

স্থাণু-বন অধিবাসী যত সব যতি আজি
অসময়ে বসন্ত দরশন করিয়া,
অতিশয় সযতনে নিবারি' বিকৃতি, মনে
কোনো মতে মনোমাঝে, রাখিলা যে ধরিয়া। ৩৪

ধনুতে আরোপি' ছিলা কাম যবে পঁহুছিলা
স্থাণু-বনে রতি সনে,—অমনি সে অচলে
পরম প্রণয়-রসে আর্দ্র ভাবের বশে
করিতে লাগিল ক্রিয়া সমুদায় যুগলে। ৩৫

স্বীয় প্রিয়া সনে মিলি' শিলীমুখে নিবিবিলি
মন'সুখে মধু পি'ল একি ফুল পাত্রে।
কুরঙ্গ কালসার শৃঙ্গ ঘরষে তার
পরশে মীলিত-আঁখি হরিণীর গাত্রে। ৩৬

করিণী প্রণয়-ভরে প্রদানিল করিবরে
গণ্ডূষে ভরি' জল পরিমল গন্ধি ;
আধ' খেয়ে আধ'খানি মৃণাল কবল আনি'
রথাঙ্গনাম্না* দিল প্রেয়সীরে বন্দি। ৩৭

স্বেদ-জল-বিন্দুতে আধ' ভাল-ইন্দুতে
প্রেয়সীব ললাটিকা উঠিল রে উমিয়া,
সীধু পানে আঁখি ঘোরে বিধুমুখে গান ধরে—
মাঝে মাঝে কিন্নরে নিল তারে চুমিয়া। ৩৮

প্রচুর কুসুম-গোছা-বিরচিত-বক্ষোজা,
স্ফুরিত প্রবালাধরে আ মরি কি মধুরা—
সুকুমার শাখা-ভুজে তরুরেও প্রেমে পুজে
বাঁধিল নিবিড়তম নিজে লতা-বধূরা। ৩৯

অপ্সরা অবিদূরে গাহিল মধুর সুরে,
তবু ধ্যানে রহে পূরে' শম্ভুর সুমতি—
যাঁহারা আপনা' প্রভু, বিঘ্ন কি বাধা কভু
তাঁদের সমাধি ভাঙে, নাহিক সে শকতি। ৪০

কুঞ্জ-কুটীর-দোরে নন্দী দাঁড়া'য়ে পরে,
স্বর্ণ-রচিত ছড়ি বাম-করে ধরিল ;
দক্ষ-আঙুল একে সঙ্কেতে মুখে রেখে'
অপ-গণ-চপলতা নিবারণ করিল। ৪১

*চক্রবাক

পাতাটি না নড়ে গাছে, অলিরা নিরলে আছে,
  কূজে না বিহগ আর, মৃগ নাহি চরিছে ,
তাহারি শাসন হেন, নিখিল কানন যেন
  চিত্রে লিখিত প্রায় বর্ত্তন করিছে। ৪২

দৃষ্টি-নিপাত তার দূরে করি' পরিহার—
  যাত্রায় ত্যজে যথা শুক্রেরে সামনে,
গোপনে পশিলা স্মর ধ্যানে রত যেথা হর,—
  নিবিড় নমেরু যেথা চারিধারে সঘনে। ৪৩

আসন্ন-নিদহন মনসিজ সেইখন
  দেবদারু-বেদিকায়—দেখিলেন পশিয়া—
শার্দ্দূল ছাল পেড়ে' আস্তৃত করি' বেড়ে
  ত্র্যম্বক সংযমে রয়েছেন বসিয়া। ৪৪

বীরাসনে স্থিরতর ঊর্দ্ধে আধেক ধড় ;
  সরল আয়ত দুটি অবনত কন্ধ ,
অঙ্কে উপরিতল পাণিযুগ সুবিমল—
  শোভে যেন অবিকল শতদল দ্বন্দ্ব। ৪৫

ভুজগে উঠা'য়ে তুলি' বাঁধা কটা জটাগুলি ;
  দ্বিগুণিত জপমালা লম্বিত শ্রবণে ;
কালো মৃগাজিনে করি' গ্রন্থিল উত্তরী—
  কণ্ঠ-কিরণে ঝলা ঘন নীল বরণে। ৪৬

ঈষৎ বিকচ পারা স্তিমিত কঠোর তারা,
  পলক ফেলিতে আর অনুরাগ নাহি রে,
নীচু পানে খর ভাতি কাঁপে না ধোঁয়ার পাঁতি—
  তিনটি নয়ন আছে নাসাগ্র চাহি' রে। ৪৭

সে যেন নিঝুম-নীর অম্বুদ গম্ভীর,—
কিম্বা জলধি যেন, নাহি যাহে ঢেউটি ;
হৃদে যত সদাগতি রুধিয়া রয়েছে যতি
নির্ব্বাত-নিকম্প যেন আহা দেউটি। ৪৮

ঊর্দ্ধ আঁখির ফুটে পদবী লভিয়া উঠে'
শিরোদেশ হ'তে ছুটে সুবিমল জ্যোতি সে,
ললাটে করিছে মলা অভিনব শশিকলা—
মৃণাল-সুতারো চেয়ে' সুকোমল অতি সে। ৪৯

দেহেব দুয়ার নব তা হ'তে ফিরা'য়ে ভব,
সংযত চিত' কবি' হৃদি মাঝ স্থাপনা,
জ্ঞানীরা যাহারে কয় 'অব্যয়', 'অক্ষয়',
সে আত্মা নিরীখয় আত্মায় আপনা'। ৫০

মানসেরো অবিজ্ঞেয় অযুগ্ম-আঁখি যে ও ;—
অদূরে অতনু তাঁরে দরশন করিয়া,
বুকে চাপে বড় ডর, হাত কাঁপে থর থর।
অলখে ধনুক শর গেল তার পড়িয়া। ৫১

অমনি নিবাণ প্রায় স্মর-তেজ পুনরায়
সন্ধুক্ষিয়া* যেন তনুরুচি রাশিতে,
বন-দেবী সহচরী-দুজনা পিছনে করি'
নগেন্দ্রকুমারীরে দেখা গেল আসিতে। ৫২

বাসন্তী ফুল-ভার বরাঙ্গে পরা' তাঁর ;—
অশোক গলার হার—পলার কি নিন্দা।
কনক-কিরণ হানে কর্ণিকা দুল কানে ;
মোতির মালার মাঝে গ্রথিত নিসিন্দা। ৫৩

*প্রজ্বলিত কবিয়া।

স্তনযুগে তনুখানি কিছু নত, অনুমানি ;
পরনে দুকূল—নব রবি-হেন জ্বলিছে ;
প্রচুর সে গোছা-ধরা' ফুলভরে নুয়ে' পড়া'
রাঙা কিশলয় পরা' লতা যেন চলিছে। ৫৪

কটিতে পড়িছে খসি', ঝটিতি ধরিছে কষি'
মেখলা সে—বকুলের ফুলমালা রচিত,
অতনু যেন রে ঠাঁই উপযোগী জানিয়াই
ধনুর আরেক ছিলা রেখেছিলা গছিত'। ৫৫

সুরভি নিশাস বায় উপচিত তিয়াষায়
বিম্ব-অধরে ধায় চঞ্চরী চপলে ;—
তরাসে চকিত আঁখি সুকুমারা থাকি' থাকি'
বারণ করিতেছিলা কম' লীলা-কমলে। ৫৬

উমার এমনি সব অনিন্দ্য অবয়ব—
রূপবতী রতিরেও কত লাজ না দিল !
অতনু তা নেহারিয়ে পিনাকী জিতেন্দ্রিয়ে
স্বকার্য্য সিদ্ধির আশা-সেতু বাঁধিল। ৫৭

ভাবী পতি ভবেশের প্রতীহার-প্রদেশের
পুরোভাগে পরে যেই নগবালা আগত,
অমনি পরম জ্যোতি নিরখি' হৃদয়ে যতি
সমাধি-সাধনা হ'তে হইলেন বিরত। ৫৮

তখন ভুজগবরে হাজারো ফণার পরে
অধোভূমিভাগ ধরে ক্ষণ তরে খিন্ন।
প্রাণ-বায়ু অন্তরে মৃদু মৃদু সঞ্চরে,
নিবিড় সে বীরাসন হইল রে ভিন্ন। ৫৯

নন্দী কহিল এসে' বন্দিয়া ব্যোমকেশে—
'সমাগত উমা তব সেবা-সমারম্ভে।'
পিনাকীর আঁখি-ঠারে অনুমতি পেয়ে', তাঁরে
কুঞ্জ কুটীর মাঝে আনে অবিলম্বে। ৬০

নগজার সহচরী-দুজনা, প্রণতি করি'
নিজ হাতে তোলা' যত বাসন্তী ফুলেতে
মিশাইয়া কিশলয় বিছাইয়া রাখি' লয়
থরে থরে মহেশের দুটি পদ-মূলেতে। ৬১

উমাও প্রমথনাথে পূজিলা প্রণত মাথে ;
নমিতে আচম্বিতে পড়ি' গেল খুলিয়া
অভিনব কুরুবক, পরিহরি নীলালক।
খসিল প্রবাল, কানে আছিল যা দুলিয়া। ৬২

অনন্য-রতি মন লভ' তুমি পতি-ধন'—
উমারে আশিসে শিব সার্থক বচনে।
মহাপুরুষেরা যাহা বলেন, কখনো তাহা
প্রকাশে কি বিপরীত অর্থ এ ভুবনে ? ৬৩

অতনু ছুড়িতে শর অপেক্ষি' অবসর,
পতঙ্গমের মত বহ্নিতে পশিতে,
উমার সমুখে হরে লক্ষ্য সুদৃঢ় করে'
সঘনে ধনুর ছিলা লাগিলা যে কষিতে। ৬৪

তপস্বী মহাদেবে প্রদান করিলা এবে,
রাঙা হাত বাড়াইয়া, নগরাজ-বালিকা,
সুরধুনী-সঞ্জাতা বিসিনীর* বীজে গাঁথা
রবিতেজে বিশোষিত একগাছি মালিকা। ৬৫

*পদ্মফুলের

প্রীতি-উপহার মানি' গ্রহিতে সে হার খানি
করিলা পিনাক-পাণি প্রক্রম যেমনি—
'সম্মোহন্'অভিধান অমোঘ-নিরীখ্ বাণ
কুসুম ধনুকে কাম ধরিলেন অমনি। ৬৬

তখন হরেরও মন কিছু হ'ল উচাটন,—
চন্দ্র উদিতে যেন অম্বুধি গণি ঠিক!
বিম্ব-অধর-শোভী উমারি সে মুখ-ছবি
লখিতে লাগান তিনি আঁখি তিন্ই অনিমিখ। ৬৭

কুমারী উমারি গায়, কাঁটা দিয়া উঠে হায়—
আধ-ফোটা কদম্ব-কেশরের উপমা।
কম মুখে আঁখি দুটি অমনি পড়িল লুটি'—
ব্রীড়াতে ফিরা'তে ফুটি' উঠে আরো সুষমা। ৬৮

সচকিতে ত্রিলোচন স্বচিত্ত বিলোড়ন
বশিত্ব হেতু পুন অতি বলে বারি'য়া—
কিসে যে এ চপলতা মনোমাঝে উদিল, তা'
খুঁজিবারে চারিধারে দিঠি দিলা ছাড়িয়া। ৬৯

দেখিলেন,—ডানি আঁখি-অপাঙ্গে মুঠি রাখি';
কাঁধে নত, নাম পদ কুঞ্চিত করিয়া,
প্রহারিতে উদ্যত রহিয়াছে মন্মথ—
চক্র-আকারে চারু চাপ খানি ধরিয়া। ৭০

সমাধির প্রশমনে মন্যু* বাড়িল মনে,—
কে চাহিবে সে আননে ভ্রূভঙ্গে কুটিল'?
স্ফুলিঙ্গ ঝলকিয়া ললাট নয়ন দিয়া
সহসা অনল-শিখা মহাবেগে ছুটিল। ৭১

*ক্রোধ

ক্রোধ, প্রভু শঙ্কর',—সম্বর ', সম্বর' ।
বহিতে না বহিতে এ নভোবাণী পবনে,
ভব-আঁখি-জাত সেই বহ্নি যে নিমেষেই
ভস্মে বিনিঃশেষ করিলেক মদনে। ৭২

এ বিপাকে স্মর-প্রিয়া পড়িলেন মুরছিয়া,—
ইন্দ্রিয় যত তাঁর স্তম্ভিত হইল !
ক্ষণ তরে দুর্গতি না করা'য়ে অবগতি
মহা উপকারে যেন মোহ হ'য়ে রইল। ৭৩

সাধনারি অরি কামে এই রূপে পরিণামে,
তরুরে অশনি সম, বিনিপাত করিয়া,
রমণীর সন্নিধি পরিহারে, তপোনিধি
প্রমথগণের সনে পড়িলেন সরিয়া। ৭৪

শৈল-কুমারী তখন পিতারি সমুচ্চ অভিলাষ,
আপনারো আর বন্ধু সুকুমার,—সকলি বিফল হেরে।
সখীরা দুজনে রয়েছে সামনে, কেমনে ঢাকিবে লাজ ?
শূন্য পরাণে ভবনের পানে কোন' মতে তাই ফেরে। ৭৫

অমনি গিরি, —মুদিত-আঁখি রুদ্র-রোষ-ভয়ে,
সুদুঃখিতা সে দুহিতারে দু'হাতে তুলি' লয়ে,—
স্বর্গ-করী শোভিল কি'রে দন্তে ধরি' পদ্মিনীরে।
পূর্ব্ব পথে দীর্ঘ দেহে চলিলা বেগে বয়ে' ।৭৬

চতুর্থ সর্গ

রতি-বিলাপ

অথ মূরছিয়া অতনুর প্রিয়া রতি
হারায়ে চেতনা ছিলা যে এত-না হোথা,
জাগা'ল বিধিতে শুধু প্রাণে দিতে অতি
নব বিধবার অসহ্য-ভার ব্যথা! ১

হৃদি-টানে নারী দিঠি হানে চারি ভিত'—
মোহ টুটি গেলে আঁখি দুটি মেলে' এবে—!
না জানে, সে চির চোখেরি' অ-তিরপিত
প্রিয় যে তাহার দেখা নাহি আর দেবে। ২

"অয়ি প্রাণ-নাথ! আছো প্রাণ' সাথ ধরি'?"
বলি' উঠি' মূঢ় নিরখিলা পুরোভাগে
পুরুষ-আকৃতি লুণ্ঠিয়া ক্ষিতি 'পরি
হর-কোপানল ভস্ম কেবল জাগে! ৩

স্মর-প্রিয়তমা শোকে পুন' সমাকুল,—
বসুধায় লুটে' ধূসরিয়া উঠে বুকে,
বিলাপে অঝর এলায়ে' চাঁচর চুল,
কাঁদায়ে বনানী যেন সম মানি' দুখে। ৪

"তব কলেবর রূপের আকর মানি'
বিলাসিবর সে ধরে আদর্শে তারি।
এ দশাপন্ন নিরখি' অঙ্গ খানি
এখনো টুটি না, দেখ কি কঠিনা নারী। ৫

"কোথা গেলে বয়ে' ফেলিয়া তব এ দাসী,
ক্ষণে করি' ভিদ স্নেহ সৌহৃদ হেন ?
নলিনীরে ছাড়ি' বলীয়ান বারি-রাশি
পলাইল ছুটি' সেতু-বাঁধ টুটি' যেন। ৬

"করনি কো, প্রিয়, মোর অপ্রিয় কভু,
প্রতিকূল পিছু করিনিও কিছু আমি,
কেন অকারণ নাহি দরশন তবু
দিতেছ রতিরে—তিতি আঁখিনীরে, স্বামি। ৭

"স্মরিছ কি, স্মর ? যবে নাম ধর' ভুলি,
বাঁধিতাম গলা কনক-মেখলা ডোরে ;
মারিতাম ছুঁড়ি কুণ্ডল-কুঁড়ি খুলি,—
ছুটি নেত্র যে যেত' ঝরা' রজে ভরে'। ৮

"হৃদে আছ সদা'— মম প্রিয় কথা হেন
বলিতে তুমি যে, বুঝিনু সে মিছে অতি !
চাটুবাণী হবে না যদি সে, তবে কেন
তব তনু হতা, আমি অক্ষতা রতি ? ৯

"পরলোকে আজি হ'লে পরবাসী, কাম !
আমিও এখনি ধরিব শরণি তব !
নিখিল-পরিধি বঞ্চিল বিধি বাম,—
তোমারি বিহনে বাঁচিবে কেমনে ভব ? ১০

"রজনী-তিমির-ঘোমটা পুরীর পথে
ঘন-গরজন-শঙ্কিতা প্রেমিকারে
প্রিয়-নিকেতনে আপন ভবন হ'তে
তোমা ব্যতিরেকে হে প্রিয় ! নিতে কে পারে ? ১১

"অরুণ নয়ন ঘন ঘূর্ণন রত;
বচনগুলার পদে পদে আড় বনা'—
তুমি জীয়ে নাই—মধু পিয়ে তাই যত
প্রমদা এখন মানিবে বিড়ম্বনা। ১২

"আছে তব দেহ শুধু শবদে ও বেঁচে
জানি' তাহা তব প্রিয়-বান্ধব শশী
কালো নিশি চলে গেলেও বিফলে সে যে
কোন' মতে নভে উপচিত হবে খসি'। ১৩

"হরিত ছটায় ললিত বৃন্ত-ভরে,
কল কুজন্ত কোকিল-কণ্ঠরবে
ফুটি' উঠি আর বল না কাহার শরে
নব চূতফুল আজিকে আকুল হবে? ১৪

"অলি-পাঁতি দিয়া নিরবধি যে আপনি
ফুলধনু-ছিলা বিরচিয়াছিলা বাঁধি'—
আজি সকরুণ করি' গুন্ গুন্ ধ্বনি
মোর শোকে তারা হতেছে যে সারা কাঁদি'। ১৫

"মনোমোহকর পুন কলেবর ধরি',
হে প্রিয় আমার, উঠি' আগেকার মত
রতিদূতিপদে লহ পিকবধূ বরি'—
মোহন মধুরালাপে যে চতুরা স্বত'। ১৬

"শির পাতি' নিতি যাচিতে পীরিতি মোর,—
কম্প্র শরীর বাঁধিতে নিবিড়তম;
সেই তোমা সনে বিজনে মিলনে ভোর—
হে স্মর, স্মরিয়ে শান্তি নাহি রে মম। ১৭

"তোমারি রচিত হে রতিদয়িত, এ যে
অঙ্গে অঙ্গে মোর বসন্তে-ভব
কুসুমভূষণ' রয়েছে এখনো সেজে—
কোথা হে অতনু, সুচারু সে তনু তব ? ১৮

"ক্রূর সুরগণ করিল স্মরণ যবে,
এ অঙ্গরাগ পুষ্পপরাগ মাখি'
সারা না করিতে গেলে যে ত্বরিতে, তবে
এসে' রচ রাগ—বাম পদভাগ বাকি। ১৯

"পতঙ্গসম বহ্নিতে মম দেহ
ঢালি' দিয়া তব কোলে পুন লব ঠাঁই—
স্বরগে চতুরা অমর-বধূরা কেহ
তোমা-ধনে চুপি' লয় পাছে লুকিয়াই। ২০

"মদনবিহনে ক্ষণেক কারণে তবু
ছিল রতি জীয়ে' কলঙ্ক কি এ ঘোর
আর কোনমতে ঘুচিবে জগতে কভু,
যদিও রমণ, যেতেছি পিছন তোর ? ২১

"কেমনে করিব অন্তিমে তব সাজ —
তুমি পরলোকে চলি' যাবে, ও-কি জানি ?
কিছু না কহিতে লুকালে চকিতে আজ—
প্রাণেরি সঙ্গে গেছে যে অঙ্গখানি। ২২

"সেই পড়ে চিতে—সরল করিতে শর ;
ক্রোড়দেশ-ভরা কুসুমিত শরাসন ;
বসন্ত সনে রত আলাপনে, স্মর !
মুখে হাসি ছিল, অপাঙ্গে বিলোকন। ২৩

"সে তোমার কোথা প্রিয়সখা ঋতুরাজ—
যে তব রচিত কুসুমযোজিত ধনু ?
দারুণ পিনাকী রোষভরে নাকি আজ
লভিল মিতারি গতি, ওগো, তাঁরি তনু।" ২৪

শুনিয়া রতির এতেক অথির বাণী—
হৃদে বিষ-মাখা শেল সম ছাঁকা লাগে ;
কাতরা রতিরে বাঁচাতে ভরসা দানি'
মধু আসি' দিলা দরশন পুরোভাগে। ২৫

মাধবে নিরখি' কাঁদিল কত কি বালা,
স্তন-সম্বাধ বক্ষে আঘাত হানে—
আপনাজনের সামনে মনের জ্বালা
ছুটে শতধার, যেন খোলা দ্বার মানে। ২৬

বিরহবিধুরা কহিলা মধুরে তবে—
সখার তোমার নেহার' কি আছে আর ?
গুঁড়ায় গুঁড়ায় অই যে উড়ায় নভে
পায়রার পারা হায় রে পাংশু ছার। ২৭

"অয়ি, সম্প্রতি দেহ দরশন আসি'—
এ যে সমাকুল বসন্ত তোমা তরে।
দয়িতার দায় প্রেম কোথা যায় ভাসি'
টলে না প্রাণের সুহৃদ্‌জনের 'পরে। ২৮

"ইনিই না তব রহিয়া পার্শ্বচর
সুরাসুর সনে আনেন ভুবনে বশে।
মৃণাল-ছিলায় পেলব পুষ্পশর
যোজি' ধনু তবে কেমনে এ ভবে পশে ? ২৯

"গেছেই, সে মধু,—ফিরিছে না বঁধু প্রাণে।
সে-যে বাতাহত প্রদীপের মত সারা;
আমি দশাসম, চেয়ে দেখ মম পানে—
কি দুঃখ ঘোর ঘিরেছে ধূম্রপারা। ৩০

"বিধির করণে আধেক মরণে মরি—
বধিল মনোজে আমারে হেন যে ছেড়ে'।
দৃঢ় আশ্রয়-তরু উপাড়য় করী,—
লতার তখন ধূলায় পতন যে রে। ৩১

"তাই ত এখন করহ অনন্তরে—
বান্ধবজন মানে প্রয়োজন যাহা,
বিরহ-কাতরা, (চিতা জ্বালি' ত্বরা করে')
লহ গো রতিরে পতি-পদতীরে, আহ। ৩২

"শশী সহ মুদি' যায় কৌমুদী সতী,
মেঘের সহিত মিলায় তড়িৎলতা—
প্রমদা যতেক পতির পথের পথি',
চেতনা-বিহীনো বিদিত এ হেন কথা। ৩৩

"ওই সুন্দর প্রিয়-কলেবর-ছাই
হরষে আপন উরসে লেপন করি',
নব কিশলয়ে যেন মানি' লয়ে' ঠাঁই
রাখিব এ তনু চিতাহুতাশন'পরি। ৩৪

"কুসুম-শয়ন করিতে রচন মোরা
কত না সহায় হ'তে মধু, হায় তুমি—
তবে মোর চিতা কর বিরচিতা ত্বরা,
যাচি করপুটে, ওগো শির লুটে ভূমি। ৩৫

"তার পর মোরে চিতানল করে' দান,
দক্ষিণ-বায় বীজনি' ত্বরায় জ্বাল'—
জানই ত মধু, তব প্রিয়বঁধু কাম
ক্ষণেক' না রহে রতির বিরহে ভাল'। ৩৬

"এতেক আচরি', দোঁহে দিয়ো করি' মনে
সলিলাঞ্জলি শুধু এক, বলি মধু।
বারি সে পরম পরলোকে মম সনে
এক সাথে পান করিবে সে প্রাণবঁধু। ৩৭

"পরলোক-বিধি হে মধু, সাধিবি আর—
অতনুরে স্মরি' চূতমঞ্জরী দিয়ো,
কচি কিশলয়ও কিছু সাথে লয়ো' তার—
সখা যে তোমার বড় এ-সবার প্রিয়।" ৩৮

দেহবিমোচনে হেন দিলা মনে সায়।
—রতিরে তখন আশ্বাসে গগনবাণী ;
সর-শোষাহতা শফরীরে যথা হায়,
প্রথম বরষা বাঁচায় ভরসা আনি'। ৩৯

"স্মর-বধূ অয়ি ! দুরলভ দয়িতার
রবে না জানিয়ো চির তব প্রিয়তম।
শুন যে-কারণ হয়েছে মরণ তাঁর
হর-আঁখি-ভব অনলে শলভসম।— ৪০

"যবে তব প্রিয় ক্ষোভে ইন্দ্রিয়চয়—
স্বীয় আত্মজা অভিলাষে প্রজাপতি ;
ক্ষণে ক্ষরি' তাঁর চিত্তবিকার জয়
শাপে অতনুর সেহেতু এ দুর্গতি।— ৪১

"উমা-পরিণয় করি' যে সময়, হরে
(গিরিজার তপে প্রীত হ'য়ে সঁপে' হৃদি)
লভিবে হরষ নিভৃতে পরস্পরে
নিজ কলেবরে যোজিবেন স্মরে বিধি ! ৪২

"—উপযাচে যম, বিধি পাছে কন হেন
তোমার প্রাণেশ-অভিশাপ-শেষ কথা।
অশনি, অমৃত, এ উভয়েরি ত জেন'
যতি, জলধর জনয়িতা সর্ব্বথা। ৪৩

"তাই সুশোভনে ! ও তনু যতনে রেখ'
হবে এ শরীরে প্রিয়াগম ফিরে যদি
রবিতেজে ভারি শুকালেও বাবি দেখ
নিদাঘের পরে পুন স্রোতে ভরে নদী।" ৪৪

এরূপে তখন অলখে সে কোন্ দেবতা
করিল রতির বাসনা শিথিল মরণে !
মনোজসুহৃদো মানিয়া প্রকৃত সে কথা
অতনু-বধূর আশাসে মধুর বচনে। ৪৫

রতিও এ বিপাক পরিপাক যতদিন
প্রতীখে প্রতি নিশা, অতি কৃশা জাগিয়া।
দিবসে বসি' একা শশিলেখা যথা ক্ষীণ—
কিরণ নাহি সাজ—রহে সাঁঝ লাগিয়া। ৪৬

পঞ্চম সর্গ

তপস্যার ফল

এহেন চোখের' পরে পিনাকী দহিলা স্মরে,
তাহাতে উমার করে হৃদয় বিকল।
এরূপ ও যৌবনে ধিক্ দিলা মনে মনে—
না চাহিলে প্রিয়জনে চারুতা বিফল। ১

উঠিল বাসনা জাগি'—অমোঘ রূপের লাগি'
তপোজপে অনুরাগি' পূরাবে দুরাশা।
নহিলে কেমনে তাঁর এ উভয় মিলিবার—
সেইরূপ স্বামী, আর সেই ভালবাসা? ২

কঠিন সাধন তরে বালিকা যতন করে,
পিনাকপাণির 'পরে সঁপি প্রাণমন।
শুনিয়া মেনকারাণী উমারে বুকেতে টানি'
কহিলা সোহাগবাণী তপোনিবারণ ঃ— ৩

"দেবতা যে মনোমত গৃহে আছে শত শত;
কোথা, বাছা, মুনিব্রত, কোথা তনু তোর।
ভর সহে ভ্রমরার শিরীষ সে সুকুমার,
তা বলে' কি পারে আর পাখীর কঠোর?" ৪

দৃঢ়মনা মেয়েরে সে মেনা হেন উপদেশে
তপোনীতি হ'তে শেষে নিবারিতে নারে;
সাধের সাধনে যদি ধায় মন নিরবধি,
কে ফিরাবে দ্রুতনদী-স্রোত'সম তারে? ৫

সখী যে নিকটে আছে পাঠায়ে পিতার কাছে
একদা কামিনী যাচে—"যাইব বিপিনে,
মন'-আশা সকলি ত আপনি জানেন, পিতঃ,
করিব সাধনা নিত' ফলে যতদিনে।" ৬

অনুরূপ অভিলাষে গিরিরাজ মনে হাসে,
তনয়ার বনবাসে দিলা অনুমতি।
যায় বালা,— যা ভুবনে পরে তাঁরি নামে ভণে—
গৌরীশিখর-বনে, শিখীর বসতি। ৭

তপোমতি মতি বালিকার ঘুচে সাধ মালিকার-
বুকের সুরভিসার লুটিত যা' আগে,
বাঁধিল বাকল বালা অরুণ-পাটল আলা—
টুটিল যা', এ কি জ্বালা, উচ' কুচভাগে। ৮

চিকণ চিকুরে লুটে' যে-মুখে মাধুরী ফুটে,
রাজিল তা' জটাজুটে আজিও তেমন।
কেবল ভ্রমর-সা'রে কমল ত শোভে না রে,—
শেহালাদলেও তারে সাজায় কেমন। ৯

ব্রতবতী তিন-নরী তৃণ-গুণ নিল পরি',
তনুলতা কি শিহরি' উঠে থেকে' থেকে'।
কভু তা পরে নি আগে, কটিতে কঠিন লাগে—
চারিধার রাঙা রাগে দিল এঁকে' এঁকে'। ১০

অধরে আলতা দিত যে-হাতে সে অবিদিত,
স্তনরাগে অরুণিত ভাঁটা নাহি ধরে;
কুশ-সূচে অবিরত আঙুল হতেছে ক্ষত,
করেছে প্রণয় কত জপমালা'পরে। ১১

কোমল শয়নে, ভুলে' ফিরে-শুতে যেত খুলে-
সেই সে চুলের ফুলে বাজিত বেদন,
ভুজলতা-উপাধানে শুধু বালা সাবধানে
বসে'-শুয়ে' ও পাষাণে কাটিছে এখন। ১২

আজিকে নিয়মবতী ছুটি ধন দোঁহা প্রতি
রাখি' দিলা, পেলে পতি লইবেন ফিরে—
লতিকা সে সুকুমারী লীলাগতি দিলা তারি,
চকিত চাহনি ছাড়ি' দিলা হরিণীরে। ১৩

নিরলসা নিজে-থেকে' ঘটস্তনবারি-সেকে
বাড়াইলা একে একে চারাগাছগুলি,—
প্রথমে জনমে বলে' বনের এ তরুদলে,
নবীন 'কুমার' হ'লে, যাননিকো ভুলি'। ১৪

মুঠা-মুঠা বনবীজে মৃগ পালিতেন নিজে,
তাই তারা এমনি যে তাঁহাতে ভুলিত—
সখীরা সমুখে থাকে তবু নাহি ভয় রাখে,
কুতূহলে তাঁরি আঁখে আঁখিটি তুলিত। ১৫

স্নান সারি', চীর পরি', হোমযাগ সমাচরি',
যথাবিধি বেদ পড়ি' যাপিত দিবস।
সদা তাঁর দরশনে আসিতেন ঋষিগণে,—
ধরমে যে বড়, গণে কে তার বয়স ? ১৬

প্রতিকূল প্রাণিকুলে আগেকার দ্বেষ ভুলে :
তরুগুলি ফলফুলে অতিথিরে সেবে ;
কুটীরে সারাটি ক্ষণ জ্বলে হোম-হুতাশন ;
হইল সে তপোবন সু-পাবন এবে। ১৭

বুঝিলেন উমা যবে—প্রথম ক্রমের তপে
কখনো নাহিক হবে ফল মনোমত,
তখন তাপসব্রতা নাহি বাসি' কোমলতা
করিলা সে তনুলতা আরো তপোরত। ১৮

আগে যেবা ভঁাটা খেলে' বাঁচিত না শ্বাস ফেলে',
ধরিল সে অবহেলে মুনির আচার।
কনক-কমলদলে তনু না রচিত হ'লে,
কেন হেন সুকোমলে এমন স-সার? ১৯

সুহাসিনী চারিধাব হুতাশন জ্বালি' চার,
বাখিতেন মাঝে তার ক্ষীণ তনুখানি;
নিদাঘে ভানুর দিক্ চাহিতেন অনিমিখ—
চোখে যে ঠিকবে চিক সে কিছু না মানি'। ২০

এইরূপে সবিতার সহি' কব খরধার
ধরিল মুখানি তাঁর কমলের ছবি।
অবিরল বিলোকনে ডাগর নয়ন-কোণে
কেবল কালিমা ক্রমে লভিল পদবী। ২১

অযাচিত ধারা-পয়, বিধুকব সুধাময়,
শুধু এই দুয়ে হয় তাপসী বালার
পারণের বিধি সারা। বিটপিগণেব পারা
জীবিকা এতেক ছাড়া নাহি ছিল আর। ২২

দহি এ দ্বিবিধানলে—সমিধে, নভে যা' জ্বলে,*
—নিদাঘ যাইত চলে'। বরষা শুধাও?
তখন নূতন বারি শরীরে ঝরিলে, তাঁরি
ধরা-সহ তাপ ছাড়ি' ধাইত উধাও। ২৩

*আকাশের অগ্নি সূর্য্য।

ক্ষণ থাকি' ঘন- জল আঁখি-লোমে টলমল,
পীড়িয়া অধরদল লুটে কুচশিরে।
ত্রিবলীর খাঁজে খাঁজে স্খলিত, চলিত না যে—
অবশেষে নাভিমাঝে পশিত সুচিরে। ২৪

শুতেন শিলার 'পর ছাড়িয়া কুটীরঘর,
অবিরাম জলঝড় না মানি' মানিনী
কি কঠোর ব্রত রাখে। চপলা-চমক-আঁখে
যেন তা দেখিতে থাকে নিতি নিশীথিনী। ২৫

বহে ঘোর শীতবাত নাহি তাহে দৃক্‌পাত—
পউষের সারা রাত বারিমাঝে রহে।
চকাচকি তুটি পাখী অদূরে উঠিছে ডাকি'—
ঝরিছে উমার আঁখি তাদের বিরহে। ২৬

সরোজসুরভি মুখে রজনীতে জলে ঢুকে,
ঠোঁটখানি টুকটুকে কাঁপে ঠিক দল।—
ঘুচেছে তুষারঘায় কমল সকলি, হায়,
সেথা যেন শোভা পায় একটি কেবল। ২৭

তরুতলে ঝরি'-পড়া পর্ণে পরাণ-ধরা'
সেই ত তপের পরা'। তাহারো বিহনে
সুভাষিণী ধরে প্রাণ, তাই তাঁরে করে দান
'অপর্ণা'-অভিধান পুরাবিদ্‌গণে। ২৮

এইমত নিশিদিন সাধি' ব্রত সুকঠিন
করিতে লাগিলা ক্ষীণ মৃণালের দেহ—
সুদৃঢ় শরীর দিয়া অবিরত আচরিয়া,
পারেন নি হেন ক্রিয়া মুনিরাও কেহ। ২৯

অজিনে আষাঢ়ে* সেজে', জ্বলি' যেন তপ'তেজে,
যতি এক—কয় সে যে অভয়বচনে,
শিরে বহি' জটাভার, সাধনারি অবতার—
একদা পশিল তাঁর নব তপোবনে। ৩০

গিরিজা অতিথিপরা, যতিরে পূজিতে ত্বরা
উঠিলা ত্যজিয়া ধরা দিলা বহুমান;—
সাধুরা সুধীরমতি লোকবিশেষের প্রতি
দেখান অধিক রতি, হ'ন্ না সমান। ৩১

গৃহাগত, গ্রহি' তাঁর বিধিমত পূজাচার,
ক্ষণতরে শ্রমভার যেন করি' দূর,
অকুটিল দুটি আঁখি উমার উপরে রাখি'
কহিলা বিনয় মাখি' বচন মধুর।— ৩২

"বলি, তব ক্রিয়াতরে কুশকাঠ জোটে ত' রে?
বারিও ত' মেলে তোরে—স্নানে যত লাগে?
আপন শকতিমত তপ তুমি করিছ ত'?
সাধিতে ধরমব্রত শরীরই যে আগে। ৩৩

"বলি, নিত' ঢালি' জল আপনি ত নবদল
ফুটাইছ এ সকল বনলতিকায়?
তাই চির রাগহারা ও-রাঙা ঠোঁটের পারা
পাটলবরণে তারা হেন শোভা পায়। ৩৪

"মৃগ পরে' তব মন রয়েছে ত সযতন—
ভালবেসে অনুখন লয় তৃণমুঠি?
বলি' লো নলিন-আঁখি, তোমারি চাহনি নাকি
চল-চোখে নিতে আঁকি' তোলে আঁখিদুটি? ৩৫

*পলাশ দণ্ড।

"শোন, বালা, লোকে বলে—স্বরূপ না পাপে টলে—
সে বাণী সদাই ফলে জানিনু বিশেষ ;
নহে কেন, সুশোভনে। ও-স্বভাব-দরশনে
মুনিগণো সযতনে লবে উপদেশ ? ৩৬

"সাতঋষি-পূজা শেষে ফুল আসে ভেসে' ভেসে'।
সুরধুনী হেসে হেসে নামেন বরিতে—
তাহাতেও নগরাজ নাহি হন তত আজ
পরিপূত, যত আজ ও-শুভ চরিতে। ৩৭

"ধন আর কামনার করিয়াছ পরিহার—
সেবিতেছ অনিবার কেবল ধরম ;
হে ভাবিনি। আমি তাই ভাবিতেছি, তব ঠাঁই
এ তিনের শেষটাই পরম চরম। ৩৮

"আজি এত সমাদর দেখালে আমার 'পর।
হে সুতনু, মোরে পর ভেবো নাকো আর—
বলেছেন বুধগণ—'সেই ত আপন জন,
যার সাথে আলাপন সাতটি কথার !' ৩৯

"জানি' তুমি ক্ষমাবতী, এবে এ চপলমতি
দ্বিজ কিছু তোমা' প্রতি পুছিবারে চায় ;
শুন অয়ি তপোধনে। বড় আশা করি মনে,
গোপন নহিলে, ক্ষণে বলিবে তাহায় :— ৪০

"জনম তোমার মূলে প্রথম বেধার কূলে,
ত্রিলোকমাধুরী তুলে' তনুটি তোমার।
ধনসুখ মনোমত, বয়স নবীন অত।
সাধনার ফল কত, বল চাহি আর ? ৪১

"সহি' ঘোর অপকার মহীয়সী মহিলার
হ'তে পারে অনিবার এ হেন মনন—
বিশেষ বিচার করি' দেখিলাম কৃশোদরি।
সেও ত তোমার 'পরি ঘটে নি কখন। ৪২

"রূপ যার মধুঢালা স'বে না সে দুখজ্বালা—
গৃহে তব চারুবালা। কোথা অবমান?
পীড়া নাহি দিবে পরে,—মণিশলাকার তরে
ফণিনীর শিরে করে কে করপ্রদান।

"যৌবন, এ কি মরি—আভবণ পবিহরি'
রহিয়াছ চীব পরি' প্রাচীনের ভূষা?
শশিতারা লয়ে' সাঁঝে রজনী মধুরে বাজে,
সে কি বে অরুণে সাজে, না হইলে উষা? ৪৪

"যদি গো স্বরগে আশ, বৃথা তবে এ আয়াস,—
তোমার পিতার বাস ত্রিদিব ভূমি যে।
স্বামী যদি চাহি, তবে প্রয়োজন নাহি তপে—
রতনেরি খুঁজে সবে, সে খুঁজে না নিজে। ৪৫

"ছাড়িলে দারুণ শ্বাস। বুঝিনু বরেই আশ,
আমার এ দ্বিধা নাশ কর তুমি তবু -
কোনো-কিছু নাহি যাব মনোমত চাহিবার,
চাহিলে কি সে আবার নাহি পায় কভু? ৪৬

"তুমি চাহ যে যুবায়, সে এত নিঠুর হায়,
হেরি' তব এ দশায় রয়েছে কি করে'—
ঘুচেছে কমলতুল ; ধানের শীষের তুল
পাটল জটিল চুল গালে লুটি' পড়ে। ৪৭

"তপজপে অবিরত শুকায়েছে দেহ কত,
গহনার ঠাঁই যত দহে রবিকর।
দিবা শশিলেখাপ্রায় নিরখি' ও কৃশ কায়
কোন্ সহৃদয় হায় হবে না কাতর। ৪৮

"বুঝিলাম তব প্রিয়, রূপের গরবে স্বীয়
ঠকেছেন ও অমিয় মুখানি ভুলিয়া ;
আঁখিপুটে, বলিহারি, কুটিল রেঁায়ার সারি—
দেখিল না আজো তারি নয়ন খুলিয়া। ৪৯

"ওগো, আর কতদিন তপে তনু হবে ক্ষীণ ?
আমারো ত যোগাধীন সুকৃতি রয়েছে।
তাহারি আধেকে লভ মনোমত বর তব—
কে তবে সে জানি' লব বাসনা হয়েছে। ৫০

হৃদে হেন পশি' দ্বিজে শুধালেন সাধ কি যে ;
লাজে নগবালা নিজে বলিতে না পারে।
কাছে ছিল সহচরী, ফিরায়ে' তাহার 'পরি
কাজলবিহীন, মরি, দুটি আঁখি ঠারে। ৫১

যতিরে কহিল আলি*—"যদি এত কুতূহলী,
হে সাধু, শুনুন বলি, ইনি যে-কারণে
এ কোমল তনুলতা করেছেন তপে রতা,
কমলের দল যথা রোদনিবারণে।—৫২

"মহেন্দ্র-আদি চারি দিক্‌পাল ভারি ভারি,
অবহেলে সবে ছাড়ি' শুধু এ মানিনী
করেছেন দৃঢ় পণ পেতে পতি ত্রিনয়ন—
স্মরজিৎ—রূপে নন ভুলিবার যিনি। ৫৩

*আলি—সখী সহচরী।

"অতনু যে বাণ ছুঁড়ে' হর-কোপে যান পুড়ে'
সেই সে সায়ক ঘুরে' অঘোর-গরজে
না সহি' আসিল ফিরে, পরিহরি' পুরারিরে
গিরিজারি হৃদি চিরে' বিধিল বড় যে। ৫৪

"সে হ'তে পিতার ঘরে সখী মোর জরজরে,
শীতল তিলক করে অলক ধূসর।
দিশে নাহি পায় বালা কিসে যে জুড়ায় জ্বালা—
বিফলে তনুয়া ঢালা হিম-শিলা' পর। ৫৫

"সখী সুর-গায়িকারা—রাজার কুমারী তারা—
হর-জয়গীতি ধারা ছাড়ে বনপাশে।
শুনি' মনোব্যথাভরে উমার না কথা সরে,—
দেখি' তারা আঁখিলোরে কতদিন ভাসে। ৫৬

"তি পহর রাতি পরে যদি বালা ক্ষণতরে
আঁখিদুটি মুদিত রে, জাগিত অমনি
স্বপনে কহিয়া কথা—'অয়ি দেব, যাও কোথা।'
মিছে গলে ভুজলতা বাঁধিত রমণী। ৫৭

"'বোলেছে জ্ঞানীরা সবে—তুমি আছ সারা ভবে;
এ ভকতজনে তবে কেন জিগাঁস' না?'—
এত বলি' নিজ-করে আঁকা' ছবিখানি' পরে
সরলা নিরলে হরে করে ভর্ৎসনা। ৫৮

"যখন দেখিল এরে—লভিতে সে মহাদেবে
আর ত উপায় ভেবে' নাহি পায় মনে,
তখন পিতারে কয়ে' সখী আমাদেরে লয়ে'
ব্রত লাগি' আসিল এ হুত তপোবনে। ৫৯

"সেই-যে আসিয়া তপে সখী নিজে তরু রোপে,
সাধনার সে পাদপে দেখা দিল ফল।
ফল-ধরা' থাক্‌ দূরে যে-বাসনা শশিচূড়ে,
আজ তার বীজ ফুঁড়ে' উঠিল না দল। ৬০

"না-জানি সে দেব কবে সখীরে সদয় হবে।
মোদের এ চোখে ব'বে কত আঁখিধার
হেরি' ওরে তপে ক্ষীণা? ধরা যেন ধারা বিনা।
করুণা ঝরিবে কি না নভোদেবতার। ৬১

গিরিজার গূঢ় চিত' সখী ছিল পরিচিত—
খুলিল সে সকলি ত' চারু দ্বিজরাজে;
"অয়ি' সহচরী-ভাষ প্রকৃত, না পরিহাস?"
পুছে যতি মনোহাস চাপি' মনোমাঝে। ৬২

যতিবর কুতূহলে এতেক পুছিলে ছলে,
মুকুলিত করতলে রাখি' জপমালা,—
লাজে অবনত মাথা,—কোনমতে গোণাগাঁথা
চিরবিরচিত গাথা কহে নগবালা :—৬৩

"হে দ্বিজ, শুনিলে যাহা সকলি প্রকৃত তাহা—
এ-জনা চাহিছে, আহা, উচপদ অতি।
সেই পদ লভিবার মিছে তপ এ আমার—
তবু, হায় বাসনার নাহি আর গতি।" ৬৪

তখন তাপস ভণে,—"জান ত সে ত্রিলোচনে,
তারি আশা তব মনে উঠিয়াছে পুন'?
অশুভ আচারে যার অনুরাগ অনিবার
কভু না সেবিবে তার, বলিতেছি শুন। ৬৫

"কি ছার বিষয়-প্রতি মজেছে তোমার মতি।
না-জানি, লো গুণবতি, কেমনে আগু যে
বিবাহের সূতা-পরা' তব হাত দিবে ধরা
ভুজগ-বলয়ে ভরা' পিনাকীর ভুজে। ৬৬

"তুমি নিজে বিবেচনা করি' কেন দেখিছ না,
উভয়ের এ যোজনা মানাইবে কি রে,—
বধূর দুকুলবাস আঁকা' যাহে কলহাঁস,
আর গজাজিনপাশ ভিজে যা' রুধিরে? ৬৭

"ফুলে-ছাওয়া মেজে'পরে সদা যে চরণ চরে —
চলিতে ফিরিতে ঝরে আলতার আলো।
বেড়া'লে শ্মশানে এসে' ছড়ানো মড়ার কেশে,
অরাতিও হেন কে সে বলিবেক ভালো? ৬৮

"অনুচিত এর পরে কি আছে বলত' মোরে —
তুমিও শিবের ক্রোড়ে পড়িবে সহজে।
কোথা উরসিজ দুটি সুরভিতে রবে ফুটি,'
তা' না হ'য়ে লুটোপুটি খাবে চিতারজে। ৬৯

"আরেক মজার কথা শোন, লো কনকলতা,
গজরাজে তুমি কোথা সাজিয়া আসিবে—
না, তব বিবাহ সেরে' বুড়া ষাঁড়ে চড়াবে রে,
মহতে যে তাহা হেরে' মুচকি' হাসিবে। ৭০

"পিনাকীর সহবাস যখন করেছ আশ,
তখন উভয় আজ লভিল শোচনা—
সুবিমল শশিকলা ভালে আগে সে বিকলা,
তুমিও হইলে মলা জগতজোছনা। ৭১

"উপ-আঁখি বপুখানা! কুলেরি বা কি ঠিকানা?
ধন যত গেছে জানা দিক্-বসনেই।
লো মৃগনয়না, বরে লোকে যা' বাসনা করে,*
তার যে এ-হেন হরে কিছু লেশ' নেই। ৭২

"এ কু-আশা হতে, অহো, মানস ফিরায়ে, লহ।
কোথা সে পিনাকী কহ, তুমি, শুভে, কোথা?—
কে সাধু শ্মশান-পাঁকে আরোপিত শূলটাকে
যূপসম পূজে' থাকে, বেদে বিধি যথা?" ৭৩

"দ্বিজ যদি এই মত প্রতিকূলে বলে কত—
অধরে ক্রোধের স্রোত' বাধা নাহি মানে,
ভুরুলতা বাঁকাইয়া আঁখিকোণ, রাঙাইয়া
রহে উমা তাকাইয়া কুটিল নয়ানে। ৭৪

বলে শেষে—"তুমি হরে জান নাকো' ভাল ক'রে
তাই ত আমার' পরে কহিছ এমন।
সাধুদের সদাচার সবে দেখা সদা ভার—
না বুঝিয়া হেতু তার দূষিবে কুজন ৭৫

"বিপদে হরিয়া নেবে, অথবা বিভূতি দেবে,
তাই লোকে সদা সেবে শুভ বাস হার—
যিনি জগতের গতি, বাসনাবিহীন অতি,
আশা-কলুষিত-মতি এ-সবে কি তাঁর? ৭৬

"কিছু তাঁর নাহি বটে, তবু ধন তাঁহে ঘটে।
নিবসে শ্মশানতটে ত্রিভুবন ভূপ।
ভীষণ মূরতি প্রভু শিব শোভাময় তবু—
হায়, তাঁর কেবা কভু জানিবে স্বরূপ? ৭৭

*কন্যা রূপ, মাতা ধন, বিদ্যা চান পিতা।
বান্ধবে চাহেন কুল, অপরে মিষ্টিটা॥

"ভূষণে ভাসুক শোভা, বাঁধা থাক্ ভুজগ বা,
দুকুল খুলুক প্রভা, কিবা গজাজিন,
মাথায় মড়ার খোলা উঠুক বা শশিকলা —
কিছুতে না যায় বলা সে তনুর চিন্। ৭৮

"অই দেহে লভি' ঠাঁই পূত যে চিতার ছাই,
তাহে আর ভুল নাই—দেখেছ আপনি,
নাচিতে নাচিতে শূলী ঝরিলে গায়েব ধূলি,
দেবতারা লন তুলি' মাথায় অমনি। ৭৯

"কাঙাল সে, ষাঁড়ে ফেরে ?   সুরেশ' যে তাঁরে হেরে'
মাতোয়ারা হাতী ছেড়ে' পড়েন চরণে,
লুটিতে মুকুট খুলি' ফোটা-পারিজাত-ধূলি
রাঙায় আঙুলগুলি অরুণ বরণে। ৮০

"অসৎ স্বভাব-বশে মহেশে ফেলিতে দোষে
তোমারো রসনা ঘোষে ভাল এক কথা—
দেবাদি কমলযোনি যাঁ' হ'তে লভিলা জনি,
তাঁহার জনমখনি কে জানিবে কোথা ? ৮১

"আর না, হয়েছে ঢের !   কাজ নাই বিবাদের—
হোক সে শতেক-ফের জান যা,' তাপস।
তাঁহাতেই মোর মন মজি' আছে অনুখন —
না ডরে প্রেমিকজন পর-অপযশ। ৮২

"নিবার' নিবার,' সখি, আবারো এ বটু, লখি,
কি-যেন উঠিবে বকি'— ফুটিছে অধর।
সাধুরে যে অপভাণে তারে শুধু পাপে টানে,
তা' নয়, যে শোনে কানে সেও যে পামর। ৮৩

"হেথা হ'তে, দূর-ছাই ! আমিই চলিয়া যাই" –
বলি' বালা ছুটে যায়, বুকে টুটে চীর ।
অমনি স্বরূপ ধরে' শিব মৃদু হাসিভরে
গিরিজারে ভুজ ডোরে বাঁধিলা নিবিড় । ৮৪

নিরখি' শঠে শিহরি' ওঠে ! অঙ্গে স্বেদবিন্দু ।
কমলপদ তুলিয়া শুধু করিবে যাই ন্যস্ত—
পথের মাঝে অচলরাজি-আকুলা যেন সিন্ধু, -
নগাধিরাজ-তনয়া আজ 'ন যযৌ ন তস্থৌ ।' ৮৫

"আজি অবধি, হে পার্ব্বতি, হইনু দাস তব,—
কিনিলে মোরে সাধনা-মূলে," কহিলা ব্যোমকেশ,
ঝটিতি বালা যতেক জ্বালা ভুলিলা তপোভব ।
লভিলে ফল, নবীন বল প্রদানে পুন' ক্লেশ । ৮৬

ষষ্ঠ সর্গ

উমার বাগ্দান

গৌরী তখন বিশেষে কন বহস্য-সখী দিয়া,—
"মোরে হিমবান্ করিবেন দান, বিধান করুন ইহা"। ১

সঙ্গিনী-দিয়ে পুছিলেন প্রিয়ে নগেন্দ্রবালা, যথা
সখী পিক-বধূ সম্ভাষে মধু, মৌনিনী চূতলতা। ২

"ভাল, তাই করি।" কহি' পরিহরি' উমারে কথঞ্চিৎ
দীপ্তি-শরীর সপ্তঋষির স্মরিলেন স্মরজিৎ। ৩

প্রভা-মণ্ডলে নভ' ঢল্ ঢলে। মহামহর্ষিরা যে
অরুন্ধতীর সহিত ত্বরিত প্রভু-পুরে আসি' রাজে। ৪

দিঙ্ মাতঙ্গ-মদ-সুগন্ধ গঙ্গার জলে নেয়ে'—
কুল-মন্দার-ফুলগণ যার তরঙ্গে চলে বেয়ে'— ৫

পরি' হেম-চীর, মাল্য মণির, পৈতা সে মুকুতারি,
আসে যেন সব কল্প-পাদপ সাজিয়া ব্রহ্মচারী। ৬

নিম্ন গগনে তুরঙ্গগণে স-রথ-পতাকা বাখি'
আপনি তপন যাঁদের চরণ বন্দে উর্দ্ধ-আঁখি। ৭

ভুজলতা-সারে বসুন্ধরারে হেলায় তুলিয়া লয়ে'
বিশাল বরাহ-দন্তে যাঁহারা বিশ্রামে পরলয়ে। ৮

ইহারাই ভব-সৃষ্টের অবশিষ্টের নির্ম্মাতা—
তাই পুরাতন পুরাবিদ্গণ ইহাদেরো কন ধাতা। ৯

আগে আচরিত' যে তপ তারি ত পরিণত ফল লভে
তবু অনুখন তপ' আচরণ করিছেন এঁরা নভে। ১০

পতির চরণে নমিত নয়নে স্বাধ্বী অরুন্ধতী
সাত ঋষি-মাঝে যেন রে বিরাজে সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী। ১১

দেবীরেও মান দিলা ভগবান সপ্তঋষির সনে,—
গুণেরি পূজন করেন সুজন, স্ত্রী পুরুষ নাহি গণে। ১২

নিরখি' সবারে মহেশের বাড়ে বিবাহের সাধ অতি,
ধর্ম্মানুগত ক্রিয়া-মূলে যত পত্নীরাই যে সতী। ১৩

ধর্ম্মেরি ভাবে পার্ব্বতী-লাভে কামনা করিলে ভব,
পূর্ব্বের পাপে আজিও সে কাঁপে, তবু খুশী মনোভব। ১৪

গণ-মহাদেবে প্রণমিয়া এবে সবে সবিনয়ে কয়,—
আনন্দ-ভরে সারা কলেবরে রম' রোমাঞ্চ হয়। ১৫

"সফল মোদের অন্ত, বেদের যতেক অধ্যয়ন,
করে'ছিনু যত যাগ বিধিমত, যত তপ' আচরণ—১৬

সারা জগতের পতি আমাদের তুমি যদি এক্ষণে
আরোপিলে, হেরো, ও তব মনেরো অনধিগম্য মনে। ১৭

তুমি যার চিতে চাহ বিরাজিতে সেই কৃতার্থবর—
কি কথা তাহার চিত্তে তোমার বর্ত্তে যে শঙ্কর? ১৮

রবি-শশী হ'তে সমুচ্চ পদে সদা মোরা বটে রাজি,
তব মনে পড়ি' আরোহণ করি আরো যে উচ্চে আজি। ১৯

তোমার আদরে আত্মা মোদের-এ কতই যে গৌরবে।—
নিজ-গুণে হয় তবে প্রত্যয় উত্তমে মানে যবে। ২০

আজি, ত্রিলোচন, কবিয়া স্মরণ দিলে যে কি সুখ আহা,
কি আর কহিব ? জানিতেছ, শিব অন্তর্য্যামী, তাহা। ২১

নয়নে নেহারি, না জানি তোমাবি স্বরূপ কেমন তবু—
জ্ঞানাতীত অযি, দাও তুমি কহি' সে আজি আপনি, প্রভু। ২২

যে রূপে সৃজন, যে রূপে পালন করিছ নিখিল ভব,
যে রূপে প্রলয়ও করিছ, বলহ এ কোন্ রূপ সে তব ? ২৩

নহে সম্প্রতি এ কথা মহতী থাক্, মহাদেব আজ—
চিন্তিত বড় আসিয়াছি, কব আদেশ, সাধি কি কাজ ? ২৪

বিরজা তখন বিশদ দশন-কিরণে শিরসি গত
শশি-কলা-কর বাড়ায়ে উতর প্রদানিলা এই মত—২৫

"জানেন সকলে, আপনার বলে' নাহিক কোন'ই আশ,
আমার এ আট মূরতি বিরাট করিছে তা' পরকাশ। ২৬

তৃষিত চাতক সলিল যাচক যেমন সুনীল মেঘে—
অরাতি-আতুর এসেছিল সুর সূত নিতে মোয় মেগে'। ২৭

সে-আমি এখন পুত্র-কারণ উমারে গ্রহিব তথা
যাজ্ঞিকবরে বহ্নির তরে অরণি আহরে যথা। ২৮

গিরীন্দ্রে যেয়ে' গৌরীরে চেয়ে' লন মোর করি' নাম,
যদি পরিণয় সাধে সাধু, হয় শুভ তার পরিণাম। ২৯

হিম-সানুমান্ সুধীর মহান্ ধরেন ধরার ভার—
তাঁহারি বংশে পাণি-পীড়ন সে নিন্দায় কি আমার ? ৩০

কনে' লাগি' নগে বলুন হেন গে'—উপদেশ দিব মিছে।
ভবৎ-প্রণীত যত বিধানই ত' জগৎ সম্মানিছে। ৩১

ইনিও আর যে লাগুন কার্যো-আর্য্যা অরুন্ধতী
এ-সব ব্যাপারে পুরন্ধ্রী পারে দেখা'তে পটুতা অতি। ৩২

যান ত্বরা করি' নগেশ-নগরী ওষধিপ্রস্থে তবে ;
মহাকোশী-খ্যাত জলপ্রপাতে পুন' সাক্ষাৎ হবে।" ৩৩

তপস্বিবর পরমেশ্বর পরিণয়েচ্ছু হেরে'
ব্রাহ্ম-যতিরা বিবাহ-জনিতা লজ্জা দিলেন ছেড়ে'। ৩৪

'যে-আজ্ঞা', বলি' সবে যান চলি', আর বিলম্ব নাই—
প্রভুও নিমেষে পঁহুছিলা এসে' পূর্ব্বকথিত ঠাঁই। ৩৫

বশী ঋষিকুল-অসি-সমতুল শ্যামল আকাশ পথে
আসিলা ব্যস্তে ওষধিপ্রস্থে চড়ি' যেন মনোরথে। ৩৬

সে নগ-নগরী যেন গো, আ মরি, অলকা তুলিয়া পোঁতা
নহে দেবতারা নভে ঠাঁই-হারা নীড় নির্মল হোথা। ৩৭

'পরিখার প্রায় ঘেরা' গঙ্গায়, রম্য বনৌষধি
জ্বলে ঝিলিমিল্ মহামণিশিল পাঁচালী সে যদবধি। ৩৮

সিংহেরে করি' শঙ্কে না করী! তুরঙ্গ দরী-জাতে।
নিবসে লক্ষ গায়ক যক্ষ বনদেবী করি' সাথে। ৩৯

সৌধ-শিখরে ঘন মেঘ করে গুরু গম্ভীর ধ্বনি।
সঙ্গে কি মাঝে মৃদঙ্গ বাজে? বড় সংশয় গণি। ৪০

কল্প-লতায় দুকুল তথায় পতপতে অবিরত,—
পৌর-জনের অজ' যতনের ধ্বজ'-পতকার মত। ৪১

স্ফটিক-শিলার অট্টালিকার ছাদে ভায় পান-ভূমি,
সারা রজনীর তারা স্বজনীর রাঙা-ছায়া মুখ চুমি।' ৪২

ওষধি-আলোকে পথি সে ঝলকে, নিশীথে ঘষিতে চলে,
বাদল-দিনেও নাহিক চিনে ও আঁধার কাহাকে বলে। ৪৩

যৌবনে সায় বয়স যেথায়, কৃতান্ত শুধু কাম,—
নিশি জাগরণে নিদ্রা নয়নে, মৃত্যু তাহারি নাম। ৪৪

শুধু ভ্রূভঙ্গে অধর- কম্পে, অঙ্গুলি-তরজনে
প্রমদার কোপ, ক্ষণে তারো লোপ, সাধে যবে প্রিয়জনে। ৪৫

সন্তান'-ছায় পান্থ ঘুমায়—কিন্নর কিন্নরী।
গন্ধমাদন-নিকুঞ্জবন ছাড়ে কি গন্ধ, মরি। ৭৬

সুর'-ঋষিগণ করি' দরশন হেন নগেন্দ্রপুর
মানিলা, স্বর্গ লাগি' যে যজ্ঞ করে লোকে-সব ভূর।—৪৭

চিত্রিতানল-সম নিশ্চল কটা জটা-জূট ধারী
বেগে রাজধানী আসিছেন নামি', ঊর্দ্ধে চাহিল দ্বারী। ৪৮

ছাড়িয়া গগন তপস্বিগণ বয়সে যে যাঁর বড়
অচলে দাঁড়ান—জলে খান্ খান্ তপন যেমনতর'। ৪৯

দূরে সানুমান্ হন আগুয়ান, হস্তে অর্ঘ্য ভরা'
ঋষিগণ-তরে, গুরু পদভরে কাঁপায়ে' বসুন্ধরা। ৫০

দেবদারু শাল বাহু সুবিশাল। গেরু ঠোঁট টুক্‌টুকে,—
সত্যই আজ শৈলাধিরাজ বিকাশিলা শিলাবুকে। ৫১

যথা-উপচার করি' সৎকার, আপনি দেখায়ে' পথি,
লয়ে' যান শেষে শুদ্ধান্তে সে শুদ্ধ সপ্ত যতি। ৫২

বেত্র-আসনে রাখি' ঋষিগণে, আপনি আসনে লুটে'
নগেশ তখন কহেন বচন কৃত-অঞ্জলি পুটে। ৫৩

"বিনা মেঘে জল, ফুল বিনা ফল শুনায় যেমন ধারা—
তাহারি মতন মোরে দরশন দিলেন যে আপনারা। ৫৪

ভবৎ-কৃপায়, আজি মনে ভায়, জ্ঞানী হ'নু, ছিনু মূঢ়।
লৌহ ছিলেম, হইলাম হেম, মর্ত্ত্য স্বর্গারূঢ়। ৫৫

আজি হ'তে জীবে শুদ্ধি লভিবে আসি' মোর এইখানে,—
সাধুরা যে-ঠাঁই থাকে, লোকে তাই তীর্থ বলিয়া মানে। ৫৬

দ্বিজ-সত্তম, এ আত্মা মম পবিত্র হ'ল দু'য়ে—
শিরে সুরধুনী ধরি,' আর মুনি-চরণপদ্ম ধুয়ে। ৫৭

স্থাবর অঙ্গ শ্রীচরণাঙ্কে, জঙ্গম চর্য্যায়—
কৃত কৃতার্থ এ মম গাত্র হইল দু'পর্য্যায়। ৫৮

মহর্ষিদিগে পূজিয়া আজিকে কত যে হর্ষি চিত্তে,—
দিগন্ত-পার অঙ্গ আমার না পারে সংস্থিতে। ৫৯

দরশে শুধু রে নাহি যায় দূরে দরীর অন্ধকার—
হৃদয়েরো মম রজ' পরে তম' ঘুচিল যে এইবার। ৬০

কাজ কৈ দেখি? থাকিলেও সে কি অসম্পন্ন রবে?
শুধু মনে ভায়, আসিলা আমায় ধন্য করিতে সবে। ৬১

তবু কোন' কাজ এ দাসেরে আজ আদেশ হউক দিতে—
প্রভুর নিয়োগ পেলেই সেবক প্রফুল্ল হয় চিতে। ৬২

এই আমি নিজে, ওরা গৃহিণী যে, এ কুলজীবন মেয়ে—
বল এর মাঝ কারে হবে কাজ, আর সমস্ত চেয়ে'। ৬৩

দরী-মুখ দিয়া প্রতিশব্দিয়া উঠিল এতেক বাণী,
হেন মনে লয়, নিল হিমালয় সকলি দু'বার ভাণি'। ৬৪

অঙ্গিরা মুনি অগ্রণী উনি,—তাঁরে তপস্বিগণ
ইঙ্গিত করে, তিনিই ভূধরে প্রতি-উত্তরে কন ;— ৬৫

"বর্ণিলে যত সবি অবিতথ। বুঝি, ওগো কত আর
উদার ও মন, - শিখর যেমন উচ্চ আপনকার। ৬৬

ও-দেহ-পাষাণে 'বিষ্ণু' বাখানে। সত্য সে, ধরাধর,
তব কন্দরে যে-কারণ ধরে এ বিশ্ব চরাচর। ৬৭

ভোগী কি কেবল মৃণাল-কোমল ফণাতে রাখিতে ভূমি—
পাতাল অবধি তাহারে না যদি ধরিয়া থাকিতে তুমি। ৬৮

নদী যত, আর কীর্ত্তি তোমার, সদা সুবিমল ধারে
ভুবন পাবনি', উর্ম্মি না গণি', ধায় সমুদ্র-পারে। ৬৯

বিষ্ণু-চরণে জনম-গ্রহণে গঙ্গার মান যত,
দ্বিতীয় পিতাই তুমি,—তিনি তাই মান্যও পান তত। ৭০

বলিরে কি করি' ছলিলা শ্রীহরি—একদা ত্রিপদ ক্ষেপে
স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে বর্ত্তে, তুমি তা' নিত্য ব্যেপে'। ৭১

যাগ-ভাগ হ'লে দেবতা-মহলে লভিয়া মহৎ স্থান
সুমেরু গিরির স্বর্ণের শির করিয়াছ তুমি ম্লান। ৭২

পাষাণেরি দেহে পুষিয়াছ যে হে তব যত কঠোরতা—
ভক্তি-নমিত এই তনুই ত শুধু সাধু-সেবা-রতা। ৭৩

"যে লাগিয়া সবে আসিলাম তবে, শোন', ওহে নগাধিপ',
তোমারি সে কাজ, মোরা শুধু আজ সু-পরামর্শ দিব,—৭৪

অণিমাদি ছয় গুণের বিষয়, ঈশ নাম যাঁর ভবে—
যা' কোন' পুরুষে আর না পরশে ; শশী যাঁর শিরে শোভে। ৭৫

যিনি এ-উহারি সাহায্যকারী ভূমি-আদি স্ব--মূরতে
করেন ধারণ বিশ্ব ভুবন, অশ্ব যেমন রথে। ৭৬

মুনিগণ যাঁরে মনের মাঝারে সতত ধেয়ান করে,
যাঁহার চরণ-মনীষীরা কন—পুনর্জনম হরে। ৭৭

সেই সাক্ষাৎ জগৎসাক্ষী সিদ্ধিদ ভগবান্
মোদের প্রেরণে'—তিনি তব কনে' বিবাহ করিতে চান। ৭৮

"কথা-সনে যথা সদর্থ, তথা সাধ' এ মিলন তাঁর—
যদি সাধু বরে কন্যাটি পড়ে, কি দুঃখ জনিতার? ৭৯

এ বিবাহ হ'লে উমারে সকলে—স্থাবর অস্থাবর,
মায়ের সমান করিবে জ্ঞেয়ান, পিতা যে মহেশ্বর। ৮০

আরো হেরো, হরে প্রণমিয়া পরে ত্রিদিব-বাসীরা যত,
কিরীটের মণি-কিরণে অমনি রঙাবে উমারি পদ। ৮১

উমা বধূ তার দাতা তুমি, আর যাচক আমরা যতি,
পাত্র সে ভব,—বংশ যে তব সমূহ সমুন্নতি। ৮২

পূজে না যে কারে, সবে পূজে যাঁরে, হরি হ'তে করি' সুরু,
তুমি সেই ভবে মেয়ে দিয়ে হবে বিশ্বগুরুর গুরু।" ৮৩

ঋষি যবে কন, পিতার সদন উমা অধোমুখে লাজে
বসিয়া কেবল বিলাস-কমল- দলগুলি গুণিলা যে। ৮৪

পূরে চির আশ, তবু গিরিরাজ স্ত্রীর মুখপানে চায়,—
মেয়ের ক্ষেত্রে গৃহিণী-নেত্রে চাহে গৃহস্থ প্রায়। ৮৫

মেনকা-রাণীও নিলেন মানি' ও স্বামীর সকল রীত—
কখন' সতীর প্রকৃতি পতির চলে নাকো বিপরীত। ৮৬

সবিতা যার দেবতা সেই শুভ মুহূর্ত্তকে,
উত্তর ফাল্গুনী আর চন্দ্রমার যোগে,
মাঙ্গলিক অঙ্গরাগ সাজা'তে পার্ব্বতী
লাগিল যত বন্ধুবধূ পতিপুত্রবতী। ৬

শরীরে শ্বেত সর্ষিষা পড়ি' দূর্ব্বাদল সাথে—
আ মরি, কিবা পার্ব্বতার মধুর শোভা তাতে।
শিথিল করি' দুকূল পরি', হস্তে ধরি' শেল
ফুটায় ভূমি যে-ঠাঁই উমা অঙ্গে মাখে তেল। ৭

গ্রহিলে বালা বিবাহে-পালা' নূতন সেই শর,
ও-তনুখানি উঠিল ফুটি' তাহারি লুটি' কর।
অসিত তিথি অতীতে নিতি যেমতি শশিকলা
নবীন রবি-কিরণ লভি' অতীব উজ্জ্বলা। ৮

লোধ্র-রজে গাত্র মাজি' হরে তৈল-ভার,
কালেয়-যোগে অঙ্গরাগ করে শৈলজার ;
স্নানের বাস পরায়ে' তবে গৃহিণী সবে তাঁয়
চারিটি থামে রচিত এক ভবনে লয়ে' যায়। ৯

বসায়ে' সেথা 'বিদূর'-মণি-মেদুর শিলাতলে—
বিলম্বিত মুকুতামালা ঝলকি' ঝলমলে—
ঝরায়ে' হেমকুম্ভবারি করায় তাঁরি স্নান,
সঙ্গে উঠে বাদ্য বাজি' মোহন মধু তান। ১০

কুশল স্নানে অচলবালা বিমল-কলেবরা,
কি শোভে পতি-বরণোচিত বসন হ'লে পরা'।
বরষা-শেষে থামিয়া গেছে মেঘের বারি-ঝরা—
বিকচ কাশ-কুসুমে আজ খচিত যেন ধরা। ১১

সেখান হ'তে পতিব্রতা রমণী কতিপয়
পার্ব্বতীরে তখন এক বেদীর প্রতি লয়—
সাধিবে বেশ-বাসন সেথা ; আসন পাতা তলে,
চারিটি মণি-দণ্ড 'পরে চন্দ্রাতপ দোলে। ১২

পূর্ব্ব-মুখী করিয়া সেথা বসায়ে' প্রমদায়
সমুখে বসি' থমকি' রহে রমণী সমুদায়।
নিরখি' তাঁর স্বভাব-শোভা ভুলিল দু'নয়ন—
ক্ষণেক তরে রহিল পড়ে' যতেক প্রসাধন। ১৩

ধূপের ধূমে শুকায়ে' পরে উমার ভিজে চুল,
রমণী এক তাহার মাঝে প্রথমে গুঁজে' ফুল,
বাঁধিয়া দিল চিকুর জাল কি সুন্দর করে'
দূর্ব্বা-সাথী শুভ্র-ভাতি লোধ্র মালা-ডোরে। ১৪

চর্চ্চি' চারু অঙ্গে শ্বেত অগুরু চন্দন,
রোচনা গুলি' পত্রাবলী করিল বিরচন।
ফুটিল তাহে উমার শোভা মন্দাকিনী জিনে'—
চক্রবাক-বিহগ যার অঙ্কিত পুলিনে। ১৫

ভ্রমর-ছায় কমল যায় কেমন ভালো দেখা।
কি-শোভা ধরে শশীর 'পরে মেঘের কালো রেখা।
উমার মুখে চিকণ চারু অলকদাম লুটি'
তুলনা-কথা দুটির কোথা দিলেক নাম টুটি'। ১৬

কপোলে মাখা হইল রুখু লোধ্র ফুল-কণা,
তাহারি প্রতি রচিল অতি গৌর গোরোচনা ;
কর্ণপুর যবাঙ্কুর-বর্ণ লাগি' শাদা
এমনি শোভা উঠিল জাগি,' পড়িল আঁখি বাঁধা। ১৭

সুঠামে-ভাঙা অঙ্গ ; রাঙা ঠোঁঠে সে কাটা রেখা।
মাজিয়া দিতে মধূখিতে* যেতেছে মিঠে দেখা।
স্ফুরিয়া উঠে' কি ছটা ছুটে কেমনে কে বলিবে ?
সূচিছে যেন অচিরে তার লাবণ্য ফলিবে। ১৮

আরেক সখী চরণতল রাঙায়ে' আলতায়—
"পতির শিরে চাঁদের কলা দলিবি এই পায়।"
বলিয়া যবে আশীর্ব্বাদ করিল পরিহাসি ;
বালিকা তারে মালিকা মারে কথাটি নাহি ভাষি'।

ফুল্লতম কমলফুলদলের সম লিখা'
নয়ন দুটি নিরখি' তাঁর, যতেক প্রসাধিকা—
ফুটিবে কিবা বিশেষ বিভা মানসে নাহি মানে,
কুশল কাজ বলিয়া আজ কাজল চোখে টানে। ২০

বিকচ ফুল-নিকরে যথা ললিত লতা সাজে,
উদয়শীল তারায় যথা রজনীবালা রাজে,
বিলীয়মান মরালগণে তটিনী যথা ভায়,
উজলে উমা তেমনি, মরি গহনা পরি' গায়। ২১

এমন মনোমোহন রূপ মুকুরখানি ধরে'
নিরখি বালা ডাগর চোখে, পলক নাহি পড়ে।
মহেশ্বরে মিলন তরে আকুল বড় মন,—
হেরিলে পতি সফল সতী-নারীর আভরণ। ২২

লইয়া এক আঙুলে করি' তরল হরিতাল,
আরেকটিতে গ্রহণ করি' পুণ্য মন'ছাল,
দিলেন রাণী তিলক টানি' মেয়ের মুখ তুলে'—
শ্রবণ-মূলে অমল তুল 'দন্তপাতা' দুলে। ২৩

*মোম

উমার যবে উদিল সবে প্রথম যৌবন,
তখন হ'তে মাতার মনে যে-আশা অনুখন
বাড়িতেছিল—আজিকে যেন সেই সে মনোরথে
সুতার ভালে ফোঁটায় তোলে' ফুটায়ে কোন মতে। ২৪

নয়ন-জলে আকুল, ঝলে রাণীর দুটি আঁখি—
আরেক ঠাঁই বাঁধিলা তাই উর্ণাময় রাখী।
ধাত্রী আসি' আঙুল দিয়ে সরায়ে' নিয়ে তায়
পরায়ে' দিল উমার হাতে সঠিক জায়গায়। ২৫

ক্ষীরোদ-বেলা যেমনি সাজে শুভ্র ফেনা-সরে,
শরতে যথা রজনী রাজে পূর্ণশশিকরে—
দুকূল পরি' নবীন, নব মুকুর করে ধরি',
তেমনি উমা শোভিল কিবা, আ মরি মরি মরি। ২৬

যতেক কুল-দেবতা ছিল পরম পূজনীয়া,
কুলের প্রভা উমারে সবা' প্রণাম করাইয়া—
কি কাজ তবে করিতে হবে যান নি মাতা ভুলি',
লওয়ান্ সতী-ললনাদের পুণ্য পদধূলি। ২৭

"অখণ্ডিত পতির প্রেম লভহ তুমি, উমে।"
- আশিসে তাঁরা, যখন তিনি নমিলা ভূমি চুমে।'
ধূর্জ্জটির অর্দ্ধদেহভাগিনী বালা পিছু
তাঁদের হেন আশীর্ব্বাদও করিয়াছিলা নীচু। ২৮

শৈলেশের বিষয় আর আশয় সে যেমন
তাহারি মত করিয়া যত বিবাহ-আয়োজন,—
সুধীর মনে, সুহৃদ্-জনে শোভিত সভামাঝে
রহিলা বসি', যবে না শশিশেখর আসি' রাজে। ২৯

এদিকে তবে 'কুবের'-নগে* শিবের পুরোভাগে
যেমনি শুভবিবাহে তাঁর হইয়াছিল আগে—
তাহারি মত গহনা কত মাতৃকা-মণ্ডলী
স্তরে স্তরে ন্যস্ত করে পরম কুতূহলী। ৩০

মাতৃকাদের সম্মানের তরে সে বিভূষণ
পরম ঈশ করিলা শুধু ঈষৎ পরশন।
সেই যে চির-গৃহীত বেশ হরের অনুগত
তাহাই এবে ধরিল শোভা বরের অনুমত। ৩১

ভস্ম সে ত' হইল শ্বেত চন্দনের তুল,
কপাল-মালা করিল ভালে শিরের ভূষা ভুল।
প্রান্ত-ভাগে রক্ত-রাগে হংসপাঁতি-আঁকা'
দুকূল-সাজে বাজিল গজ-অজিন লোহ-মাখা। ৩২

শঙ্খ*-মাঝে কিরণ লভি' নয়ন সবি ফোটে।
পিঙ্গ তারা-ভরা' যে-আঁখি জ্বলিছে ভাল-পটে—
তাহাই মানি, ললাটখানি হরিতালাঙ্কিত।
তিলক-হেন তুলিল যেন করি' অলঙ্কৃত। ৩৩

ও-কলেবরে ভুজগবর আছিল যতটাই
সকলি আজ ভূষার কাজ করিল যথা-ঠাঁই।
কেবল সারা দেহেই শুধু রূপান্তর ঘটে—
ফণীর শিরে মণির শোভা তেমনি-তর' ফোটে। ৩৪

শিখরে শশী ঠিকরে কর দিবস' নাহি মানি'।
মুদিত মলা শুধু যে কলা উদিত একখানি।
এ-হেন সিত-কিরণ নিত' ভূষণ যাঁর শিরে
মুকুট-মণি রচিতে তাঁর লাগিবে আর কি রে? ৩৫

*কৈলাস পর্ব্বতে।
*কপালস্থিত-মালা।

জগতে যত মধুর ছবি একা যে সখি সৃজে--
এরূপে চারু বরের বেশ রচিলা তিনি নিজে।
সন্নিহিত প্রমথ পরে আনিল তরবারি,
তাহারি মাঝে নেহারে প্রভু চেহারা আপনারি। ৩৬

ব্যাঘ্রাজিনে আবৃত পৃথুপৃষ্ঠ বৃষবর
ভক্তি ভরে নম্র করে বিপুল কলেবর ;
ভৃত্য-ভুজে করিয়া ভর চড়িয়া পিঠে তারি—
কৈলাসেই উঠিয়া যেন—চলিলা ত্রিপুরারি। ৩৭

পিনাকি-পিছে সপ্ত-মাতা আপনমত যানে
যেতেছে চলি'—বাহন টলি' তুলায় তুল কানে।
কমল-মুখে পরাগ-প্রায় স্ফুরিয়া প্রভা-রাশ
পদ্মফুলে সরসী-সম শোভিল নীলাকাশ। ৩৮

মাতারা সবা কনক-প্রভা বিথারি' চলিয়াছে ;
কপালমালা কলিতা কালী চলিছে পাছে পাছে।
সুনীল মেঘে বলাকা লেগে' অমনি যায় উড়ে'—
বিজলী-বালা চমকি' যার সমুখে ভায় দূরে। ৩৯

প্রভুর আগে যতেক জাগে প্রমথ—সবে মিলে'
বিবাহে-শুভ বিবিধরূপ বাদ্য বাজাইলে।
ত্রিদিব জুড়ে' বিমান চূড়ে পরশি' সেই স্বর
জানায়ে দেবে—শিবের এবে সেবার অবসর। ৪০

মরীচিমালী ধরিলা শিরে ভকতি-ভরে আনি'
অমর-কারু-রচিত চারু ছত্র একখানি।
ঝালর নব দুকূল-ধব শোভিল অবিদূরে
যেমন ধারা গাঙ্গ্য-ধারা গঙ্গাধর-চূড়ে। ৪১

মূর্ত্তিমতী গঙ্গা আর যমুনা সেই ক্ষণ
চামর হাতে প্রমথনাথে করিতে সু-বীজন
লাগিলা যদি উভয়ে নদী-মূরতি পরিহরি'
তবুও বাসি—হংস আসি' বসিছে দেহ' পরি। ৪২

প্রথম বেধা সরোজী সেথা করিলা আগমন,
আসিলা হরি পুরুষবর শ্রীবৎস-শোভন—
বিজয়-বাণী ভাষিলা, তাঁরি মহিমা সুমহৎ
বাড়ায়ে' দিতে আরো সে,—ঘৃতে বহ্নিরাশিবৎ। ৪৩

মূরতি এক, উপাধি-ভেদে শুধু যে ত্রিধা হন ;
প্রবর কিবা অবর ভাব সবারি সাধারণ।
হরির বড় কখনো হর, হরের বড় হরি,
দোঁহার বড় বিধাতা, কভু দুঁহুই বেধা' পরি। ৪৪

ইন্দ্র-আদি দিগধিপতি পঁহুছে তথি এসে',
ছাড়িয়া রাজ-চিহ্ন যত বিনীতমত বেশে।
"কোথায় প্রভু ?" ঠারিয়া পুছে, নন্দী বুঝে' উঠে'
দেখায় ভবে,—প্রণমে সবে কৃতাঞ্জলিপুটে। ৪৫

কমলাসনে কাঁপায়ে' শির আপ্যায়িলা হর,
হরিরে ভাষি', সুরেশে হাসি' করিলা সমাদর ;
দেবতা বাকি সবারে আঁখি চাহিয়া শুধু সেবা
করিলা প্রভু ক্রমান্বয়ে প্রধান যাঁর যেবা। ৪৬

সপ্ত-ঋষি সমুখে আসি' আশিসি' ভাষে জয়।
হাসিয়া তবে ঈষৎ হাসি সবারে ঈশ কয়—
"এই যে বিবাহ-সমিতি কিবা বিতত চারিভিত,
আপনাদেরে আগেই এতে বরেছি পুরোহিত। ৪৭

বিশ্বাবসু-প্রমুখ মুনি-গায়ক সুনিপুণ
মধুর স্বরে গাহিছে তাঁর ত্রিপুর-জয় গুণ।
সে গান শুনি' সারাটি পথ উতরে অবহেলে,—
প্রভুর শিরে আঁধার নাশি' চাঁদের হাসি খেলে। ৪৮

আকাশে বৃষ মহেশে বহি' চলিলা লীলা-মদে,
কনকজম্বু,ঘুমুর ঝুনু ঝুমুর ঝুঁ শবদে।
তটাভিঘাত করিয়া জাঁকে যেন রে পাঁকে লুটি'
বিষাণ-দুঁহু যেতেছে মুহু সঘন মেঘ টুটি। ৪৯

অচল পতি-পালিত, অতি অজেয়, বহু-শিলা,—
মুহূর্ত্তে সে পুরীতে এসে' বৃষভ পঁহুছিলা।
সমুখ-ভাগে পিনাকী আগে করে যে আঁখিপাত—
সে যেন ষাঁড়ে সোনার তারে টানিল অচিরাৎ। ৫০

নীরদনীলকণ্ঠ উপকণ্ঠে অবতরে—
নিরখি' নিল পৌরজন কৌতূহল ভরে।
ত্রিপুর-জয়ে যে পথ পানে সায়ক হানে আগে
তা' হ'তে নামি' আসিলা স্বামী আসন্ন ভূভাগে। ৫১

অমনি নগ অগ্রসরে লইতে হরে গ্রহি'।
ধনীর সেরা বান্ধবেরা মাতঙ্গে আরোহি'
চলিছে সাথে,—যেন রে মাথে বিকচ-তরুতান
আজিকে তাঁরি সানুর সারি হতেছে আগুয়ান। ৫২

অমর-বরযাত্রী আর ধরণীধর-দলে,
নগর-দ্বার হইলে খোলা, তুমুল কোলাহলে।
সুবহুদূরে অমনি উড়ে' ছুটিল কলনাদ—
যেন রে স্রোতে দু'ধার হ'তে টুটিল জল-বাঁধ। ৫৩

প্রণমে হর,—অবনীধব শরম মনে পায়,
উনি যে বিভু, পূজিছে ত্রিভুবনের জনে যাঁয়।
জানে না শিব-মহিমা-বশে আগেই ত সে নিজে
আনত চূড়ে অনেক দূরে লুটিছে ধরণী যে। ৫৪

বিকশি' উঠে শিখরি-মুখ, পরম সুখী হিয়া—
ফিরিছে ঘরে জামাতা হরে সরণি দেখাইয়া।
ডাহিনে বামে রতন-বেণী আপণ-শ্রেণী শোভে,
কুসুমরাশি-নিচিত পথে নিহিত পদ ডোবে। ৫৫

নগরে তবে রমণী সবে অমনি সেই ক্ষণে
হইল অতি লালসাবতী বরের দরশনে—
ফেলিয়া রাখি' হাতের বাকি অপর কাজ শত
করিছে সারা হর্ম্ম্যে তারা কর্ম্ম এই মত :- ৫৬

কেহ-বা ছোটে জানালা-ধার যা' দিতেছিল আলা,
কুসুমহারে চিকুর-ভার বাঁধিতেছিল বালা -
হেরিতে বরে আবেগভরে কবরী কেশপাশ
খসিল তার—তুলিতে আর নহিল অবকাশ। ৫৭

দাসীর ধরা' আলতা-পরা' দক্ষ পদখানি
কেহ-বা তার হস্ত হ'তে লইল বলে টানি'।
বিলাস-মৃদুমন্দ গতি সীমন্তিনী টুটে'
লাক্ষা রাগে রাঙায়ে' পথ জানালাপানে ছুটে। ৫৮

কেহ-বা সবে কাজলে টানি' দিয়েছে ডানি-আঁখি,
বামের চোখে টানিবে পাছে, এখনো আছে বাকি ;
সারা না হ'তে আলোক-পথে উতরে ত্বরা করি'
কাজল-টানা তুলিকা-খানা কমল করে ধরি'। ৫৯

জানালা থাকি' আকুল আঁখি হানিল কোন' বালা,
রভসে খোলা' নীবি সে তোলা মানিল মনোজ্বালা।
কাঁকন-প্রভা বিকশি' শোভা পশিল নাভি-কূপে—
বসনখানি ধরিয়া করে রহিল কোন' রূপে। ৬০

আরেক বালা আধেক মালা গেঁথে' যে ত্বরা উঠে,
ফেলিতে পদ মুকুতা যত যেতেছে ধরা লুটে'।
হায় রে, তার চন্দ্রহার – কি দশা ওর আজি —
আঙুল-মূলে পড়িল খুলে' কেবল ডোর গাছি। ৬১

সবার মুখে আসব ঢুকে' সুবাস ধীরি বয়,
পুলকে মাখি' চটুল আঁখি নারীরা নিরীখয়।
চপল অলি কপোল 'পরি, ছুটায়ে' পরিমল,
জানালা মাঝে যেন রে রাজে বিকচ শতদল। ৬২

উত্তরিয়া চন্দ্রচূড় আসিলা এই মতে
তোরণ-তোলা' পতাকা-দোলা' বিশাল রাজপথে।
অট্টালিকা-শিখরমালা না মানি' দিনমান
জোছনা লুটি' উঠিল ফুটি' দ্বিগুণ পরিমাণ। ৬৩

নয়ন ভরে' নিরখি বরে—দৃশ্য একি সেই।—
রমণী কুলে অমনি ভুলে! বিশ্ব সেকি নেই?
যেন রে বাকি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সবাকার।
নেত্র-মাঝে পশেছে করি' চিত্ত-সমাহার। ৬৪

"অপর্ণা যে কঠোর তপ করিল সুকুমারী
প্রাণেশ-রূপে পূজিতে শিবে—উচিত সে উমারি।
দাসীও তাঁর হবে যে নারী সফল তারি আশা,
সুভগা কি সে, লভে যে তাঁরি বুকের ভালবাসা। ৬৫

"আজিকে হেন মধুরতর বধূ ও বর যদি
পরস্পরে যোজিত করে' না দিত প্রজাপতি,
গড়িলা তবে যুগল রূপ অত যে সযতনে
সকলি সে ত বিফলে যেত' - এমনি লয় মনে। ৬৬

"সত্যই কি, অত্যধিক ক্রুদ্ধ হয়ে' কভু
পঞ্চশরে ভস্ম করে' ফেলিয়াছিল প্রভু ?
-অমন বেড়ে মাধুরী হেরে' শরমে, অনুমানি,
আপনা' হাতে অতনু পাতে আপন তনুখানি। ৬৭

"শঙ্করের সঙ্গে দিয়ে মেয়ের বিয়ে আজ
মনের চির বাসনা, ওগো লভিল নগরাজ ;—
ধরার ভার ধারণে তাঁর, লো সখি' তোরা শোন্,
উচ্চ যেই চূড়া, সে পাবে উচ্চতরাসন।" ৬৮

এরূপে কত মধুর কথা কহিছে পুরনারী—
শুনিয়া গিরি-ভবনে ধীরি পঁহুছে ত্রিপুরারি।
উপরি হ'তে পড়িল পথে যতেক লাজ-মুঠি
চূর্ণ যে ও-সকলি এয়ো-কেয়ূরে আজ লুটি'। ৬৯

থামিলা বৃষ ; নামিলা ঈশ হরির বাহু ধরি'—
যেন রে ভানু শারদ ঘন ছাড়িল, আহা মরি।
কমলাসন চলিলা আগে, পিছনে পরমেশ
শৈলেশের মহলে ঢের করিলা পরবেশ। ৭০

প্রভুর পাছ দিগধিরাজ-প্রমুখ দেবতারা,
ঋষিরা-সাত, তাঁদেরি সাথ পরম ঋষি যাঁরা,
সবার শেষে প্রমথ এসে' পশিলা শিলা-ঘরে—
সুফল-রাশি যেন রে আসি' সুকৃত অনুসরে। ৭১

সেথায় শুভ আসনে শিব বসিলা যথাচার—
রত্ন, মধুপর্ক-আদি অর্ঘ্য উপচার,
দুকুল ধব-যুগল নব, নগেশ থু'ল আনি'—
মন্ত্র পড়ি' সকলি পরিগৃহীলা শূলপাণি। ৭২

মহিলানারী-মহলচারী বিনীত দ্বারী সবে
দুকূলধারী বরেরে আনে বধূর খানে তবে ;—
নবীন শশি-কিরণ-রাশি, সাজায়ে' সাদা ফেনে
জলধিবরে যেমতি ধ'রে বেলার কাছে এনে'। ৭৩

চাঁদিনী-আলা শরদবালা এ বিশ্বের যথা
কুমুদ-আঁখি ফুটায়, জলে ছুটায় আবিলতা—
তেমনি চারু চন্দ্রমুখী নগেন্দ্র কুমারী
বিকশে আঁখি স্বামীর, করে বিমল মনোবারি। ৭৪

যেমনি শুভদৃষ্টি-কালে দোঁহার আঁখিদুটি
পরস্পরে দরশ তরে পিয়াসে ওঠে ফুটি'
অমনি লুটে! আবার উঠে, আবার যায় পড়ে'।
এমনি দু'হু শরমে মুহু মরমে যায় মরে'। ৭৫

হিঙুল-রাঙা আঙুল-গাঁথা' উমার পূত হাত
শৈল-গুরু সঁপিয়া দিলা, গ্রহিলা ভূতনাথ।
— পার্ব্বতীরই অঙ্গে নাকি পিনাকি-ভয়ে স্মর
লুকায়ে' ছিল, মুকুল তারি বাহিরিল এ কর? ৭৬

উমার তনু রোমাঞ্চিত হইল ঈশ-হেতু,
আকুল প্রেমে আঙুল-ঘেমে' রইল বৃষকেতু।
পরশে লুটি' হরষে দুটি জড়িল কম' কর—
অতনু যেন দোঁহারি দেহে করিল সম ভর। ৭৭

অপরাপর বধূ ও বর মধুর উপযমে
ধরে যে বড় সুষমা হর-গৌরী-সমাগমে—
আজিকে এঁরা রূপের সেরা মিলিয়া দোঁহে, আহা,
ধরিলা নিজে মাধুরী কি যে, কেমনে কহি তাহা। ৭৮

হোমাগ্নির চতুর্দ্দিকে মধুর বধূবর
প্রদক্ষিয়া যেতেছে চলে' মিলায়ে' কলেবর।
সুমেরু-গিরি যেমতি ঘিরি' নিয়ত নিশিদিবা
ঘুরিছে, আহা, মরি রে, দুটি শরীরে মিশি' কিবা। ৭৯

পরশে দোঁহে হরষে মোহে মুদিলা দুনয়ন।
দম্পতীরে তিনটি ফিরে ঘুরায়ে' হুতাশন,
পুরোধা তবে বধূরে হোম লইলা করাইয়া
জ্বলন্ত সে অনলে লাজ-আহুতি ছড়াইয়া। ৮০

অঞ্জলিতে অমনি পূরি' সুরভি লাজ ধূমা
গুরূপদেশে আনন-দেশে গ্রহণ করে উমা ;
কপোলে এসে' লাগিল যে সে রঙিল শিখা-ধারা
ক্ষণিক তাহা শোভিল, আহা, কমল-দুল পারা। ৮১

হোমের ধূমে ঘামিল রাঙা কপোলে রেণু-রেখা।
উছসি' উঠে নয়নযুগে কালাঞ্জন-লেখা।
শ্রবণে অবতংস যব-মুকুল সুকুমার
শুকায়ে' পড়ি'—মুখানি মরি ফুটিল কি উমার। ৮২

বধূরে দ্বিজ কহিলা,—"বাছা শৈলসুতা, শোন্,
বিবাহে তব সাক্ষী এই রহিল হুতাশন।
এখন তুমি স্বামীর সহ ধর্ম্ম-আচরণে
নিরত থাকো, করিয়োনাকো বিচার কিছু মনে।" ৮৩

নয়ন-কুটি অবধি দুটি কর্ণ অরপিয়া
গুরুর সেই বচন পান করিলা হব-প্রিয়া ;
নিদাঘে যথা প্রবল-দাপ তপন-তাপ সহি'
বরষাগমে নবীন বারি করেন পান মহী। ৮৪

মধুরাকৃতি পতি সে ধ্রুব, সুদূর ধ্রুব-তারা
হেরিতে নভে আদেশে যবে উমারে, শুভ দারা
মুখানি তুলি' শরমে হায় কণ্ঠ যায় বাজি'—
বিপুলায়াসে মৃদুল ভাষে কহিলা, "দেখিয়াছি।" ৮৫

বিধান জানা' বিপ্র নানা বিবাহ-উপচার
এরূপে যবে সমাধা করি দিলেন দোঁহাকার,
তখন সেই জগতজন-জনকজননীরা
কমলাসনে আসীন পিতামহেরে প্রণমিলা। ৮৬

বধূরে তবে আশীর্ব্বাদ করিলা প্রজাপতি—
"হে কল্যাণি, বীরের তুমি প্রসূতি হও, সতী।"
বাণীর নিধি যদিও বিধি, তবুও মহাদেবে
কেমনে শুভ কামনা ক'বে পান না তাহা ভেবে'। ৮৭

কৃতোপচার চতুরায়ত বেদীতে হেমাসনে
দম্পতীরা উভয়ে তবে বসিয়া এক সনে—
জগতে যথা লোকের প্রথা তাহাই অনুসরি'
আর্দ্র করা' আতপ-চাল গ্রহিলা তনু' পরি। ৮৮

লক্ষ্মীদেবী দোঁহার শিরে ধরিলা শতদল
ছত্রাকারে ; পত্র-ধারে মতির মত জল-
বিন্দু ভায় ঝালর-প্রায়, গ্রথিত সারি সারি।
রাজিল নাল দীর্ঘতম দণ্ড-সম তারি। ৮৯

তাহার পরে, উভয়বিধ ভারতী-ব্যবহারে
সরস্বতী করিলা মগ্ন আরতি দোঁহাকারে -
বরেণ্য সে বরেরে পূত 'সংস্কৃত' বলি',
বধূরে ভাষি' মধুরতর 'প্রাকৃত'-পদাবলী। ৯০

হেরিলা তাঁরা— অপ্‌সরারা করিল অভিনয়,
(নাটক-মাঝে কল্প-না আছে রচনা- পরিচয়।)
বিবিধ-রসে তুলিতেছিল মধুর সঙ্গীত।
রঙ্গ-ভরে দুলিতেছিল অঙ্গ সুললিত। ৯১

অনন্তর দেবতাগণ কৃতাঞ্জলি পুটে
গৃহীতদার ত্রিপুরহা'র চরণে শির লুটে'
মিনতি মানে,—"শাপাবসানে লভিয়া নিজকায়
অতনু যেন পারেন শিবে সেবিতে পুনরায়।" ৯২

এতেক বাদে মুদিলে ক্রোধ আদেশে ভগবান—
তাঁহারো' পরে পারিবে স্মরে ছাড়িতে ফুলবাণ।
—কর্ম্মে যাঁরা কুশল, তারা যোগ্য অবসরে
প্রভুর কাছে চাহিয়া কাজে সিদ্ধি লাভ করে। ৯৩

অমনি অমর বৃন্দে বর্জ্জিলা যে উমানাথ,
ক্ষিতিধরপতি-কন্যা-হস্ত খানা ধরে হাত।
কনক-কলস আলা, পুষ্পমালা থরে থর,
ক্ষিতি-বিরচিত শয্যা—আসিলা বাসরে বর। ৯৪

নব পরিণয়-লাজে সাজিলা চারুবালা।
বদন তুলিল শূলী—টানিলা মানি' জ্বালা।
শয়ন-সখি-জনারে না দিতে চায় ভাষা।
প্রমথ মুখ বিকারে,—হাসি না যায় হাসা। ৯৫

মেঘদূত

অনুবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি। পূর্বমেঘ ও উত্তর মেঘের কিছু অংশ যথাক্রমে ভারতী আষাঢ় ১৩০৮ ও শ্রাবণ ১৩০৮ (১৯০১) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত অংশই শুধু এখানে ছাপা হল।

বিহারীলালের হস্তলিপি। মেঘদূতের পাণ্ডুলিপির নমুনা। পূর্ণ পৃষ্ঠা নমুনা ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চাহিয়া মেঘপানে জাগে প্রাণে কামনা,

চাপিয়া আঁখিলোর করে ঘোর ভাবনা!

গগনে ঘন হেরি' সুখিদেরি যে মনে

প্রেয়সী পাশে রাজে, তবু বাজে বেদনা—

কি যে সে সহে ব্যথা কহিব তা' কেমনে

প্রিয় বধূরে ছেড়ে' দূরে ফেরে যে জনা!

●

ভারতীতে মেঘদূত প্রকাশিত হবার পর, রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে জানান—

"এরূপ কঠিন ছন্দে এতগুলি মিল সামলাইয়া আপনি যে এই দুরূহ অনুবাদ এতদূর সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। ভাষার উপর আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।"

●

১৯১৩ সনে গীতাবিন্দুর একাদশ অধ্যায় পৃথক ছাপা হয় বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে বিতরণের জন্য। তার প্রচ্ছদের চতুর্থ পৃষ্ঠা থেকে বিজ্ঞাপিত বিষয়ের ঐ অংশটুকু গৃহীত।

অনুবাদকের ভূমিকা

(সমগ্র অনুব দেব পাণ্ডুলিপব আরম্ভে লিখিত)

বর্তমান গ্রন্থখানি কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিনব ছন্দ অবলম্বনে অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত মানসী কাব্যগ্রন্থে বিরহানন্দ ও ক্ষণিক মিলন নামে দুইটি সুমধুর কবিতা আছে। আবৃত্তিতে যে একটি স্নিগ্ধ মধুর খেদের ধ্বনি উত্থিত হয় তাহাতে মুগ্ধ হইয়াই মেঘদূত অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

কবিতা দুইটির নামানুসারে ছন্দ দুইটিরও বিরহানন্দ অথবা ক্ষণিক মিলন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই ছন্দে পদে পদে মিল সামলাইয়া মাদৃশ অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে চলা সাধ্য ছিল না। বিশেষতঃ কালিদাসের কবিতা যে রূপ সুকুমারী স্বভাবসুন্দরী তাহাতে তাহার কোমলাঙ্গে এরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত নবরচিত অলঙ্কার পরাইতে হইলে সুকৌশলী সাবধান হস্তের প্রয়োজন—কি জানি সেই বরাঙ্গেই আঘাত লাগে! কিংবা স্থূল হস্তাবলেপে শিল্পকার্য্য মলিন বা বিলীন হইয়া যায়!

এই উভয়বিধ ভয়েই আক্রান্ত হওয়ায় অনুবাদটি আশানুরূপ হইয়া উঠে নাই। তথাপি প্রসাধনের প্রথম উদ্যম বলিয়া 'দর্শক' মণ্ডলী তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি— শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী

মেঘদূত

“পূর্ব্বমেঘ”

(ভারতী আষাঢ় ১২৮০)

যেথায় জানকীর স্নানে নীর নিরমল—
নিঝর নামে ধীরি রামগিরি পদতল,
সঘন তরু ছায় নিরালায় বনাগার,
যক্ষ দীনবেশে বসে এসে সে অচল ;
নিয়োগ হেলা পাপে অভিশাপে প্রভু তার
‘বরষ ভুঞ্জিব প্রেয়সী বিরহানল।’

কনক-বালা করে খুলে’ পড়ে অতিশয়,
ছাড়িয়া প্রিয়া পাশ কাটে মাস কতিপয় !
আষাঢ় প্রথমে সে প্রেমাবেশে সমাকুল
একদা হেন গিরি ’পরে ফিরি নিরীখয়—
খনন ক্রীড়াপর করিবর সমতুল
শোভন ঘনঘটা সানু গোটা ঘিরি’ রয় !

চাহিয়া মেঘপানে জাগে প্রাণে কামনা,
চাপিয়া আঁখিলোর করে ঘোর ভাবনা।
গগনে ঘন হেরি’ সুখিদেরি যে মনে,
প্রেয়সী-পাশে রাজে, তবু বাজে বেদনা।
কি যে সে সহে ব্যথা কহিব তা’ কেমনে
প্রিয় বধূরে ছেড়ে’ দূরে ফেরে যে জনা।

শ্রাবণ সম্মুখে ! মেঘ মুখে আপনার
কুশল-বাণী দানে প্রিয়-প্রাণে বাঁচাবার,
শৈল-মল্লিকা নব বিকাশিত ফুল
তুলিয়া মেঘতরে রচে যত্নে উপচার ;
পূজিয়া যথারীতি হৃদে প্রীতি সুবিপুল
স্বাগত সু-কথায় করে তায় সতকার।

সলিল ধূম তেজে মরুতে যে মেঘ ভায়,
বারতা বহিবারে সে কি পারে প্রাণি-প্রায় ?
যক্ষ—এ বিচার ভাবনার উছাসে
না করি অন্তরে, সকাতরে যাচে তায় !
চেতন-অচেতনে ভেদগণে মিছা সে
যে জন ফুল শরে ফুটে মরে যাতনায়।

জনম ঘনবর পুষ্কর-কুলে তোর,
তুমি হে কামরূপ, সুর-ভূপ-সহচর,—
তাই তো তব দ্বার উপকার লালসে,
এসেছি দেবাধীন প্রিয়াহীন সকাতর।
চাহি মহতপাশ হত-আশ ভাল সে,
তবুও লঘু থেকে লাভ ঠেকে হীনতর।

তাপিতে কর তাপ নিরবাপ, নীরধর।
কুবের-কোপ দায়ে অভাগা এ গিরি 'পর
পরাণ-সখী ছেড়ে 'দহিছে রে বিরহে,—
গিয়া সে অলকায় বল তায় কথা মোর
ধনেশ-নিকেতনে। উপবনে হের হে
হর্ম্ম্য করে আলো হর-ভাল-শশিকর।

ছাইলে তুমি নভ এই নব বরষায়,
পান্থ-প্রিয়তমা সেও তোমা ভরসায়
চাহিবে চুল গোছে আলগোছে ধরিয়া,
*বিরহাতুরা প্রিয়া ছেড়ে গিয়া দূরে হায়।
তোমারি সমারোহে সেই রহে পড়িয়া
যে জন চিরদিন পরাধীন মোর প্রায়।

তোমারে প্রবহায় সুসহায় মৃদুবায়,
চাতক স-গরবে মধুরবে বামে গায়।
এ পাশে কুতূহলে দলে দলে আসিয়া
মিলন-উৎসব হেতু সব বলাকায়।
চারু-চিকুর কালো তোরে ভালবাসিয়া
গাঁথিবে নভতলে তব গলে মালিকায়।

এখনো তব ভ্রাতা-বধূমাতা, প্রিয়া মোর,
রয়েছে প্রাণে বেঁচে, গণিতেছে দিন ঘোর,
দেখো গে অতি ত্বরা, পতি পরা রমণী—
হৃদি যে কম ফুল-সমতুল ; সুকঠোর
বিরহ-ভরে ঝরে' পড়ে পড়ে, অমনি
আটকি' রাখে তায় বোঁটা প্রায় আশাডোর।

ভূমি-কদলী শ্বেত সারা ক্ষেত ভরিয়া
ছেয়ে' যে তোলে ধরা উর্ব্বরা করিয়া,
আজি সে ধ্বনি নব শুনি' তব সুমধুর
*উড়িবে আকাশে রে মানসেরে স্মরিয়া
আকুল কলহাঁস কৈলাস যত দূর
পাথেয় সাথে লয়ে, কিশলয়ে হরিয়া।

প্রবাসীরা বর্ষাকালে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন— ইহা কবি-প্রসিদ্ধ।
*কবিগণ বলেন ''বর্ষাকালে হংসগণ মানস-সরোবরে গমন করে।

শুধাও শিখরি এ, আঁকড়িয়ে বুক মাঝ—
বরষ পর হায় বরষায দেখা আজ
পরম সখা তোর নগবর এ উদার,
শিরে—অমরসাধ—রামপাদ—আঁকা সাজ ।
চির বিরহ ভরে তাই ত রে আঁখিধার
ফেলিছে আবিরল ছল ছল গিরিরাজ ।

যে পথে যাবে তথা আগে কথা শুন তার,
তা' পরে সুধা সম পিয়ো মম সমাচার ।
চলিতে অলকায় হ'লে হায় হতবল
বসি শিখরি-শিরে হরিবিরে শ্রমভার :
লইবি শিলা শুষে' সুলঘু সে স্রোতজল
তবে ও কলেবর ক্ষীণতর যতবার ।

নিচুল তরু সেরা, তাহে ঘেরা সারা এ
ভূধর বাস-ভূমি এবে তুমি ছাড়া'য়ে
উঠিয়া নভ পরে উত্তরে বহ কায়,
পথে অলীক ঝাঁক দিক-নাগ হারা'য়ে—
ডরি'—এ গিরিচূড়া বুঝি উড়াইল বায়
সিদ্ধ-স্ত্রী সরলা চা'বে গলা বাড়ায়ে ।*

মণি-ভা সমবায় সম ভায় মরি রে
বাসব-ধনু ঠাম তব শ্যাম শরীরে
অই যে পুরোদিক বলমীক 'পর হে
উঠিল নিরুপমা কি সুষমা ধরি রে ।
যেন গো ঝলমল শিখাবল-বর্হে
সাজায় সমাবেশি' গোপবেশী হরি রে ।

*এই শ্লোকটি কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী কবি 'দিঙনাগে'র প্রতি কটাক্ষ । "নিচুল" শব্দেরও দুই অর্থ—মেঘপক্ষে, 'স্থলবতস, কটাক্ষপক্ষে কালিদাসের সহাধ্যায়ী তদাখ্য কবি ।

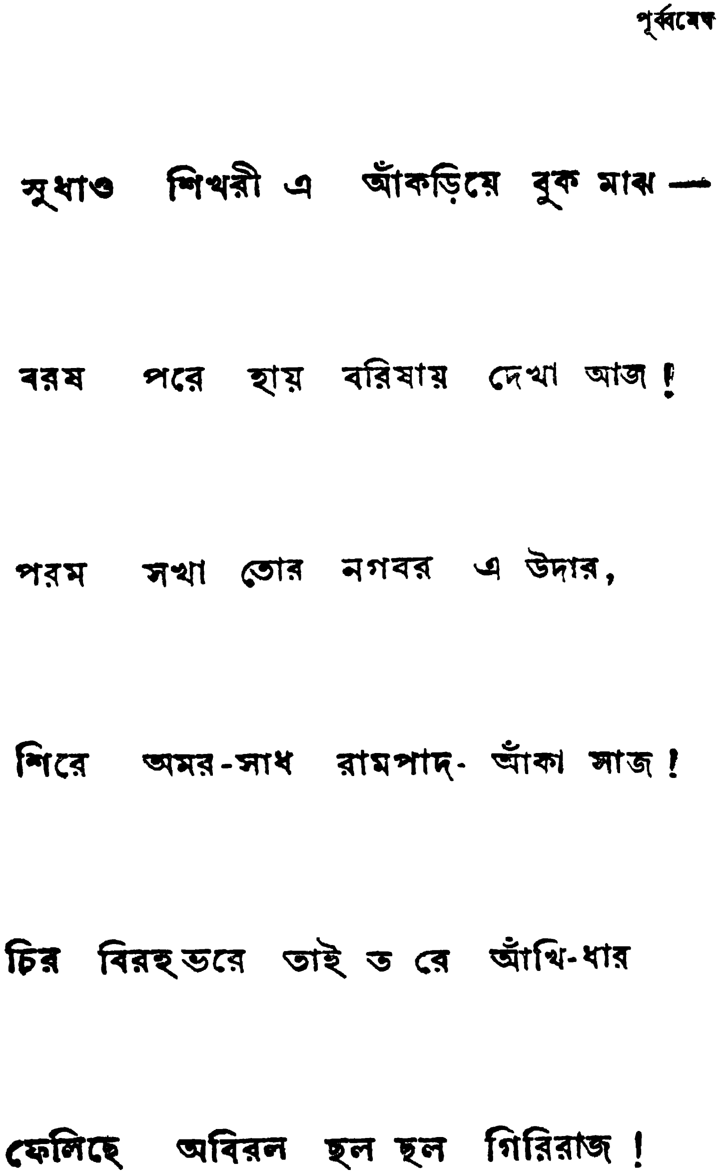
পূর্ব্বমেঘ

সুধাও শিখরী এ আঁকড়িয়ে বুক মাঝ—
বরষ পরে হায় বরিষায় দেখা আজ!
পরম সখা তোর নগবর এ উদার,
শিরে অমর-সাধ রামপাদ-আঁকা সাজ!
চির বিরহভরে তাই ত রে আঁখি-ধার
ফেলিছে অবিরল ছল ছল গিরিরাজ!

বিহারীলালের হস্তলিপিতে মেঘদূতের একটি পৃষ্ঠা

তোমারি করতল কৃষিফল বরষে—
জানিয়া ভুরুকুটি—হীন দুটি দরশে
গ্রামের বধূ সবে পি'য়ে লবে তোমাকায়।
ভূমিতে দেছে চাষ, ছুটে বাস নভসে,—
সেথায় উঠি'—পিছু হটি' কিছু পুনরায়
চলিবি উত্তর দ্রুততর রভসে।

মেঘদূত

"উত্তর মেঘ"

"কুবের গেহ ছাড়ি মোর বাড়ী উতুরে,
বাসব ধনু প্রায় দ্বার ভায় সুদূরে।
একটি চারাগাছে ফুটি' আছে পারিজাত
কুসুম থোবা থোবা চারু শোভা অদূরে,
আনত বিটপেতে ফুল পেতে পারে হাত,—
তাহাতে সুত সম পালে মম বধূরে।

মণিতে বাঁধা ঘাট সু-বিরাট সরোবর,
সোনার সরোজিনী নাল মণি মনোহর—
ফুটিয়া ছেয়ে' রয় জলাশয় ঘেরিয়া।
হংস সুধা নীরে—সদা ফিরে অকাতর ;
অদূর— তবু তো রে কভু তোরে হেরিয়া,
যেতে মানস সরে নাহি সরে অন্তর।

"তীরেই ক্রীড়াচল – নীলোপল শিরে ভায়,
কনক-কদলীতে চারি ভিতে ঘিরে তায়।
অই যে অনিবার চপলার সুহাসির—
কিরণ তোর পাশে পরকাশে—হেরে' হায়
নগ সে রমণীয় অতি প্রিয় প্রেয়সীর,
জাগিছে চিতে ত্বরা স্মৃতিভরা বেদনায়।

"কুঞ্জ মাধবীর—করবীর চারি ধার।
সেথায় তারি কাছে দুটি আছে তরু সার,—
দোদুল নব দলে সাধ ছলে অশোকের
আমারি সম সাধ বাম পদ তাড়নার।
বকুল সুকুমার সে প্রিয়ার শ্রীমুখের
অমিয় মোরি প্রায় পি'তে চায় অনিবার।*

মাঝেছে স্ফটিকের ফলকের রচনা,
সোনার বসিবার আছে দাঁড় যোজনা।
নিম্নে বাঁধা মণি যেন গণি প্রভা ওব
তরুণ বেণুসম অনুপম শোভনা।
শিখী সে দিবা শেষে বসে এসে সখা তোর—
নাচায় তারে প্রিয়া, বালা দিয়া বাজনা!

চিনিবি বাড়ী সে তো রাখি এত স্মরণে
শঙ্খ কমলেরো ছবি হেরো তোরণে!
আমারি এ বিরহে সখা ওহে আজ তার
অমন চারু কায়া মাথা ছায়া বরণে।
কভু কি সরসিজ ধরে নিজ সাজ আর
রবি সে যবে হায় ডুবে যায় গগনে।

কলভ* তনুপ্রায় লঘু কায় ধরিয়া
সেই সে ক্রিয়াচলে যাও চলে' ত্বরিয়া।
শোভন সানু দেশে বসি শেষে সুখাসন,
ভবনে দিয়ো দিঠি মিটি মিটি করিয়া—
জোনাকি সারি সারি যেন তারি বিলসন,
চপলা চকমক দুটি চোখ ভরিয়া।

*কবিগণ বলেন স্ত্রীলোকের বাম পদাঘাতে অশোক এবং মুখামৃত স্পর্শে বকুল প্রস্ফুটিত হয়।

কলভ—করী শাবক

সেথা সুতনু শ্যামা কটি ক্ষামা সুদতী,
বিম্ব রাঙা দুটি ঠোঁটে ফুটি শ্রীমতী,
চকিত মৃগ পারা আঁখি তারা মেলিয়া
গভীর নাভি-ধার শ্রোণী-ভার সুগতি,
যুগল কুচ-ভরে কিছু পড়ে হেলিয়া,
যেন জগত মাঝে প্রথমা সে যুবতী—

জানিয়ো সে আমার যেন আর জীবিত।
কথা না বড় ভাষে ; পরবাসে সাথী ত
তাই সে তব সখী একা চখী—একাকার,
দীর্ঘ দিন ভোর প্রিয়া মোর ব্যথিত।
মূরতি বুঝি নেই আর সেই আগেকার,
নলিনী সম হায় হিম-ঘায় মথিত।

ফুলেছে আঁখি তার অনিবার ঝরিয়া,
গিয়েছে শ্বাস-তেজে ঠোঁট সে যে মরিয়া।
কপোল রাখে করে, তাহে পড়ে' এলো চুল
লয়েছে সে মুখানি আধো খানি হরিয়া,—
মেঘেতে মুখ ঢাকা দুখ মাখা সুবিপুল
আছে সে চাঁদ হেন বেশ যেন ধরিয়া।

দেখিবি গিয়া তারে পূজাচারে রত সে ;
নহে ত ছবি মম ভাবি' মনো-মত সে—
বিরহে কৃশ কায়—আঁকে তায় বরণে !
পিঁজরে কুজে শারী পুছে তারি শত সে—
"রসিকে, পড়ে কিরে সে স্বামীর স্মরণে ?
তোরে না হৃদি ভরে স্নেহ করে কত সে।"

কোলে মলিন বাসে রাখি' বা সে বীণারে,—
বাসনা গান করে নাম ধরে আমারে,—
নয়ন সলিলে যে বীণা ভেজে ওগো তার !
আঁচলে মুছি' হায় পুনরায় তা সারে,
অমনি তবু কেন ভুলে যেন বার বার
যতনে নিজে গাঁথা কি যে গাথা আহা রে !

দেহলী* হতে ভুঁয়ে নহে থুয়ে ফুলরাশ,
গনিয়া একে একে বাকি দেখে কতমাস !
দিবস বিভাবরী কিবা করি অনুভব
ভুঞ্জে সহরিষে আমারে সে সহবাস !
প্রায়শ প্রিয়জনে বিয়োজনে হেন সব
সাধনা বিনোদের বাদের অভিলাষ !

রহে সে দিন মাঝে নানা কাজে মগনা,
দেয় না বিরত ত' তাই তত বেদনা।
না জানি নিশি ভাগে কত জাগে ব্যথা ওর—
নয়নে নাহি ঘুম রহে ভূম-শয়না !
আমারি সমাচারে তুষিবারে সখী তোর
নিশীথে জাল দেশে ভেটিবে সে ললনা !

মরম বেদনায় কম কায় অতি ক্ষীণ,
বিরহ শয়না সে এক পাশে কোণে লীন—
উদয়—গিরি-শেষ শশি-লেশ তুলনা !
হায় রে যেই রাতি সুখে মাতি' ক্ষণে লীন
করিত মম সনে সে কেমনে বল না,
যাপিবে আজি তারে আঁখি-ধারে সাথীহীন !

*দেহলী—চৌকাঠের উপরিস্থ বা নিম্নস্থ ফলক

চাঁদের সুধা হাসি পশে আসি' বাতায়ন,
লাগিত ভাল আগে তাই জাগে দুনয়ন !
অমনি সকাতরে সে কেনরে ফিরে' চায়—
নয়ন বারি ছুটি' আঁখি দুটি নিমগন !
সলজ কমলিনী—যেন গণি মেঘলায়—
নহেক ফুট' ফুট' নহে পুট নিমীলন !

গীতাবিন্দু

পূর্ব ইতিহাস

১৯১৩ সনে গীতাবিন্দু প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময় তার মুদ্রণ পরিচয় এই ভাবে ছাপা ছিল :

এই গ্রন্থের প্রথম ৫ ফর্মা কণিক প্রেসে, ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম ফর্মা পর্যন্ত সাথী প্রেসে মুদ্রিত। অবশিষ্ট অংশ ৭৬ বলরাম দে স্ট্রীট মেটকাফ প্রেসে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

৫ নং রামতনু বসু লেন হইতে
শ্রী নলিনীরঞ্জন রায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশকের নিবেদন

(১৯১৩)

দ্রুত প্রকাশের জন্য তিনটি প্রেসে ভাগ করে দেওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ছাপা হতে প্রায় এক বছর লেগেছিল। গীতাবিন্দু সে সময়ের পাঠক মহলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষ হয়ে যায় ; পরে আর নানা কারণে পুনর্মুদ্রণ ঘটেনি। দীর্ঘ ৫৫ বছর পরে ১৯৬৮ সনে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেটি পূর্বানুরূপ মূল সহ ছাপা হয়েছিল। বর্তমানে সংস্কৃত অংশ বাদ দেওয়া হল।

১৯১৩ সনে প্রথম মুদ্রণ কালে সমসাময়িক পত্রিকাদির অভিমত ছিল এইরূপ :

ভারতী, সম্পাদনা স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রাবণ ১৩২১ সংখ্যায় বলা হয়—"এখানি গীতার বঙ্গানুবাদ। মূলের সহিত মিল বুঝাইবার জন্য গ্রন্থের বাম পৃষ্ঠায় সংস্কৃত মূল বঙ্গীয় অক্ষরে, এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠায় তাহারই বঙ্গানুবাদ পদ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।......পদ্যানুবাদে মূলের সৌন্দর্য ও তেজ উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। গীতাগ্রন্থের যে কয়েকখানি পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি তন্মধ্যে এখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।"

গৃহস্থ, সম্পাদনা বিনয় সরকার, বৈশাখ ১৩২৩ সংখ্যায় বলা হয়···"যে মাপকাটি দিয়াই বিচার করি না কেন, গোস্বামীমহাশয়ের অনুবাদকে perfect translation (সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ) বলিয়া মানিয়া লইতে আমাদের কোন দ্বিধা নাই। ইহা গীতার শ্লোকগুলির কেবল ভাবানুবাদ হয় নাই। ভাবের সহিত ভাষার সৌন্দর্য্য অবিকল রক্ষিত হইয়াছে। এমন কি, প্রত্যেক শ্লোকের, প্রত্যেক পাদের সহিত অনুবাদের প্রত্যেক শ্লোকের প্রত্যেক লাইনের মিল আছে। এরূপ ভাষা চাতুর্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

এডুকেশন গেজেট, সম্পাদনা কুমারদেব মুখোপাধ্যায়, (তারিখ পাওয়া যায় নি) বলেন, "গীতাবিন্দু একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।"

অমৃতবাজার পত্রিকা, সম্পাদনা মতিলাল ঘোষ, (তারিখ পাওয়া যায় নি) বলেন—"The book amply justifies itself by its special feature in being as close a translation of the text as possible,

confined to the same number of lines as in the original....The reader can see for himself that the original agrees line by line which is quite faithful. The publication is calculated to be of immense value to those who want to see the Geeta in Bengali intact and in all its glory beauty and dignity."

অনুবাদের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক গ্রন্থের অনুবাদেই প্রত্যেক ছত্রের অনুবাদ সেই ছত্রে সীমাবদ্ধ রাখা ভাষার উপর বিশেষ অধিকার প্রমাণ করে। তবে গীতার যে সব স্থলে শুধুই তত্ত্বকথা, সেই সব স্থলে অনুবাদে কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ কম। কিন্তু যে সব স্থানে তত্ত্ব বাদ দিয়ে সহজ কথা বা দার্শনিকতা অথবা কাব্যগুণ সম্পন্ন কথা আছে, সে সব স্থানে অনুবাদ এক আশ্চর্য সৌন্দর্য লাভ করেছে। অনুবাদের ভাষা ও ছন্দ সে সব ক্ষেত্রে তুলনাহীন বলা চলে। ছন্দের বিচিত্র তালে, ভাষার ঝঙ্কারে এবং অন্তর্নিহিত ভাবের মধুর গাম্ভীর্যে সে সব শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠেও তৃপ্তি হয় না। বিশেষভাবে একাদশ অধ্যায়ের (বিশ্বরূপ-দর্শন) সমগ্র অংশই অনুবাদের এক অতি আশ্চর্য নিদর্শন। এই অধ্যায়টি এর ছন্দোঝঙ্কার ও সঙ্গীতময় ধ্বনি-সম্পদের জন্য, উপরন্তু প্রতি ছত্রে দুটি করে মিল থাকায়, আবৃত্তির পক্ষে অতুলনীয়। উৎকৃষ্ট আবৃত্তিতে বিশ্বরূপদর্শনের মর্মকথাটি সহজে মনে আঁকা হয়ে যাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

নলিনীকান্ত সরকারের আলোচনা

পরবর্তী সংস্করণ বিষয়ে প্রখ্যাত ছন্দোবিশারদ, বহু সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনাকারী—বর্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমবাসী ভাষাপ্রেমিক কবি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার লিখছেন :

গীতাবিন্দু গ্রন্থখানি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কাব্যানুবাদ। সংস্কৃত ভাষায় এই ধর্মগ্রন্থের শত শত বঙ্গানুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা কবিতায় গীতার অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু গীতাবিন্দুর একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

গ্রন্থখানির পরিচয় দিবার পূর্বে লেখক বিহারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের একটুখানি পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে। বিহারীলাল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭১ সনে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩১-এ। এই কালের মধ্যে তিনি প্রদীপ, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি তদানীন্তন কালের সাময়িক সাহিত্যে বহু প্রবন্ধ, কবিতা লিখেছেন। মেঘদূত ও কুমারসম্ভব তাঁর সেই সময়কার রচিত গ্রন্থ। পরবর্তী দুখানা গ্রন্থেও তিনি অনুবাদ দক্ষতা ও কবি প্রতিভার অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কুমারসম্ভবের পাণ্ডুলিপি প্রয়োজন বোধে সংশোধনের জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠালে কবিগুরু একখানি পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন, 'ছন্দ ও ভাষার কারুনৈপুণ্যে পূর্ণ আপনার কুমারসম্ভবের অনুবাদে আমি হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না......।'

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কাব্যানুবাদেও 'ছন্দ ও ভাষার কারুনৈপুণ্য' অনন্যসাধারণ। গীতাবিন্দু গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় কবি বিহারীলালের অসাধারণ প্রতিভা ভাস্বর হয়ে আছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়—মূল সংস্কৃত শ্লোকের প্রত্যেকটি চরণের অনুবাদ তিনিও এক একটি চরণেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন শব্দ নির্বাচন, তেমনি প্রাঞ্জল ভাষা। ছন্দেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গ্রন্থকার। অনুষ্টুপ ও উপজাতি—এই দুটি ছন্দ গীতায় প্রাধান্য পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোকগুলিকে পয়ারে এবং উপজাতি ছন্দের শ্লোকগুলিকে ত্রিপদীতে রূপান্তরিত করেছেন। কবিতার মিলগুলি লক্ষ্য করবার মতো। ত্রিপদী ছন্দে তিনি দুটি মধ্যমিল এবং দুটি চরণে শেষ শব্দ দুটিতে অন্তমিলও দিয়েছেন। কোন কোন কবিতায় ত্রিপদীর তৃতীয় অংশে আরও একটি মধ্যমিলের যোজনা করে অধিকতর লালিত্যের সৃষ্টি করেছেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের অনুবাদের মিলগুলি লক্ষণীয় :

মহাগুরু নাহি বধি ভিখ মাগি খাই যদি
ভবমাঝে নিরবধি তবু রব তৃপ্ত—
হত করি গুরুজনে যদি বরি কামধনে
সে যে হবে এ ভুবনে রুধিরেতে লিপ্ত।

কোন কোন স্থলে গ্রন্থকার মূল সংস্কৃত ছন্দের মাত্রাসংখ্যা তাঁর অনুবাদ-কবিতার ছন্দে নিবদ্ধ রেখেছেন। বাসাংসি জীর্ণানি ইত্যাদি (২।২১ শ্লোকটি উপজাতি ছন্দে রচিত। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ বিভিন্ন চরণে যোজনা করে উপজাতি ছন্দের সৃষ্টি। বাসাংসি জীর্ণানি চরণটি ইন্দ্রবজ্রা। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে এগারোটি বর্ণে আঠারোটি মাত্রা থাকে। বাসাংসি পাঁচ মাত্রা, জীর্ণানি পাঁচ মাত্রা, এবং যথা বিহায় দৃশ্যতঃ সাত মাত্রা হলেও পাদান্ত বর্ণ গুরু হয় বলে বিহায় শব্দের য় দুই মাত্রা। বাংলা ভাষার ছন্দে লঘুগুরু বর্ণ বিচার নেই, তাই গ্রন্থকার তাঁর অনুবাদের পাঁচ পাঁচ ও সাত—এই সতেরো মাত্রার ছন্দ নির্বাচন করেছেন।—

বসনখানি জীর্ণ মানি যেমন তারে ফেলে
আরেক নব বসন পরে মানব অবহেলে,
তাহারি প্রায় দেহীর কায় জীর্ণ হলে পর
আবার সে যে গ্রহণ করে নূতন কলেবর। (২২৫)

এর পরের শ্লোকটির অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোকগুলি কবি বিহারীলাল পয়ার ছন্দে অনুবাদ করেছেন। এ ছন্দোনির্বাচনেও বিশেষ হেতু আছে। অনুষ্টুপ আট মাত্রার ছন্দ। দুটি চরণ একত্র থাকে বলে প্রতি চরণে ষোলো মাত্রা দাঁড়ায়। পয়ার চৌদ্দটি অক্ষরে চৌদ্দ মাত্রার ছন্দ হলেও চরণের শেষে যেন দুটি মাত্রা উহ্য থাকে। পড়বার সময়ে ঐ দুটি মাত্রার রেশটুকু বোঝা যায়। গ্রন্থকার সেই কারণেই অনুষ্টুপের স্থলে পয়ার ছন্দকে গ্রহণ করেছেন।......

একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ দর্শনের শ্লোকগুলির অনুবাদে গ্রন্থকার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র শ্লোকগুলিই পাঠকদের উপহার দেবার মতো।

সুললিত ভাষায় গীতার এরূপ সহজ, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর অনুবাদ আর আছে কিনা জানি না।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

(যুগান্তর, ১০।৮।৬৯)

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা জগতের ধর্মসাহিত্যে এক অপূর্ব বস্তু। অনেকেই সংস্কৃতে গীতার আবৃত্তি করিতে ভালবাসেন। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারাও শ্রদ্ধার সহিত স্ব-স্ব ভাষায় গীতার গুণানুবাদ পাঠ করেন। গীতায় এমন শ্লোক অনেক আছে, যাহা সর্ব্বদা লোকের মুখে মুখে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি ভাষায় প্রচারিত গীতার রচনাটিও সংযত অথচ সুমিষ্ট করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে উহাও সাধারণের নিত্য ব্যবহারে আসিতে পারে। বিশেষতঃ গীতাখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আদ্যন্ত পড়িয়া উঠিতে পারিলে উহার স্থূলমর্ম্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভব। তাহাও একটা মস্ত লাভ বলিতে হইবে। এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া গীতার বর্ত্তমান সংস্করণ প্রস্তুত হইল।

মূল গীতার সঙ্গে, প্রত্যেক শ্লোকের ছত্র সংখ্যার সামঞ্জস্য রাখিয়া, বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। একটি ছত্রও অতিরিক্ত প্রদত্ত হয় নাই। অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোকগুলি বাঙ্গালা প্রাচীন পয়ারে ও অন্যান্য ছন্দের ভাবাত্মক শ্লোক সমূহ বিবিধ আধুনিক ছন্দে অনুরূপভাবে অনূদিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ের 'বিশ্বরূপ' বর্ণনা ও 'বাসাংসি জীর্ণানি' ইত্যাদি সর্ব্ব পরিচিত শ্লোকগুলি যাহাতে সহজে কণ্ঠস্থ হইতে পারে, সেই রূপই প্রযত্ন করা হইয়াছে।......

মূলের সহিত মিলাইবার সুবিধা হইবে, এই বিবেচনায় বাম পৃষ্ঠায় মূল ও দক্ষিণ পৃষ্ঠায় তাহারই অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে দেওয়া গেল। মহামনস্বী পণ্ডিতগণের ভূরি ভূরি টীকা সত্ত্বেও যে গীতার দুরূহত্ব সর্ব্বত্র দূরীভূত হয় নাই, এই সামান্য পদ্যানুবাদে যে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, সে দুরাশা করি না। তথাপি পাঠক এবং পাঠিকাগণকে সমগ্র গীতার একটি মোটামুটি জ্ঞান দিতে পারিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

১৫ই আশ্বিন
১৩১৯—১৩২০

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী

আভাস

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ উপলক্ষে গীতার অভয়বাণী জগতে বিঘোষিত হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত সেই ভীষণ সময়ের ইতিহাস সকলেই অবগত আছেন ; কিন্তু কি ভাবে গীতার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার একটু আভাস দেওয়া আবশ্যক। কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন নাই। ভগবান ব্যাসদেব তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করিতে চাহিলেও, তিনি জ্ঞাতিবধসন্দর্শন ভয়ে উহা স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কেই দিব্যচক্ষু প্রদান করেন। এক্ষণে উভয়েই রাজভবনে আছেন ;— ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিতেছেন, আর সঞ্জয় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিতেছেন, ধৃতরাষ্ট্রকে তাহাই শুনাইতেছেন।

গীতাবিন্দু তৃতীয় মুদ্রণ পর্যন্ত বাঁ দিকে মূল সংস্কৃত, ও ডান দিকে বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। এবারে সংস্কৃত বাদ দেওয়া হল।

গীতাবিন্দু

প্রথম অধ্যায়

—অর্জ্জুন-বিষাদ—

ধৃতরাষ্ট্র (সঞ্জয়কে) কহিলেন—

সমবেত যুদ্ধতরে কুরুক্ষেত্র 'পরে
পুত্রেরা ও পাণ্ডবেরা বলহ কি করে? ১

সঞ্জয় কহিলেন—

পাণ্ডবের সাজা' সৈন্য রাজা দুর্য্যোধন
দেখিয়া আচার্য্যে গিয়া কহেন বচন—২
"হেরো গুরু, পাণ্ডবের মহা সৈন্যচয়
রক্ষে তব শিষ্য ধীর দ্রুপদ-তনয়। ৩
হেথা আছে মহা-ধন্বী ভীমার্জ্জুনবৎ
যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ মহারথ। ৪
ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ শূর,
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য সুচতুর, ৫
যুধামন্যু সুবিক্রান্ত, উত্তমৌজা বলী,
অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়,— রথীন্দ্র সকলি। ৬

"আমাদের পক্ষে যাঁরা, শুন দ্বিজবর,
শ্রেষ্ঠ সেনাপতি আছে, কহি সবিস্তর,— ৭

তুমি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, যুদ্ধজয়ব্রত,
অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সৌম্য, জয়দ্রথ ; ৮
মম হিতে প্রাণ দিতে আরো কত শূর
নানা-শস্ত্র-অস্ত্র-ধারী সমরে চতুর ৯
তবু যে মোদের-সেনা ভীষ্মের রক্ষিত
ভীম-পক্ষ-সমকক্ষ না হয় লক্ষিত। ১০
রহি' যত ব্যূহ-পথে যার যেথা ঠাঁই
ভীষ্মকেই রক্ষ আসি' তোমরা সবাই।" ১১
তবে ভীষ্ম পিতামহ হর্ষিয়া রাজায়
সিংহনাদ ছাড়ি' উচ্চে শঙ্খ যে বাজায়। ১২
অমনি মৃদঙ্গ, শাঁখ, শৃঙ্গ, ঢাক, ঢোলে
সহসা তুমুল শব্দ উঠিল কল্লোলে। ১৩
এদিকে শ্বেতাশ্বযুত উচ্চ রথে থাকি'
শ্রীহরি ও পার্থ শাঁখে বাদ্য করে হাঁকি'। ১৪
'পাঞ্চজন্য' হরি, পার্থ 'দেবদত্ত' ফুঁকে,
'পৌণ্ড্র' নামে মহাশঙ্খ গর্জে ভীম-মুখে, ১৫
'অনন্তবিজয়ে' বাদ্য ধর্ম্মরাজ ঘোষে,
'মণিপুষ্পে' সহদেব, নকুল 'সুঘোষে'। ১৬
কাশিরাজ মহাধন্বী শিখণ্ডী কব কি,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও অজেয় সাত্যকি, ১৭
দ্রুপদ, দ্রৌপদী-পুত্র—সবাই রাজন্,
অভিমন্যু সঙ্গে করে শঙ্খের বাজন। ১৮
সে নিনাদে কুরু-হৃদি শতধা বিদরে,
নভঃস্থল ধরাতল টলমল করে! ১৯
তবে ব্যবস্থিত হেরি' কৌরবেরি সেনা,
পাণ্ডব গাণ্ডীব তুলি' বাণ খুলিতে না—২০

হৃষীকেশে কহিলেন, অহে মহীরাজ,—
"রথ মোর রাখ হরি, দু'সেনার মাঝ। ২১
নিরখি যতেক যোদ্ধা উদ্যত সমরে,
কাহাদের সহ যুঝি, কহ সখা মোরে ? ২২
যুদ্ধে যারা সমবেত হেরি হেথা আমি
ক্রুরবুদ্ধি কৌরবেরি সবে হিতকামী।" ২৩
এহেন কহিলে কৃষ্ণে, শুনহ ভারত,*
সৈন্যগণ মাঝে তিনি রাখি' রম্য রথ, ২৪
ভীষ্ম-দ্রোণ-আদি নৃপে নির্দ্দেশিয়া সব
কহিলেন "হেরো পার্থ, বিচিত্র কৌরব।" ২৫
সেথা পার্থ দেখে, আছে পিতামহ, পিতা,
আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র; মিতা,
শ্বশুর, সুহৃদজনে দু'সেনা জড়িতা। ২৬
সে সব বান্ধব হেরি, কুন্তীর নন্দন
কৃপা-ভরে সকাতরে কহেন বচন—২৭
"হেরি' এ স্বজন, কৃষ্ণ, করিতে সমর,
শিথিল হতেছে অঙ্গ, মুখ শুষ্ক মোর। ২৮
কাঁপিছে শরীর মম, রোম-হর্ষ ফুরে,
গাণ্ডীব খসিছে হাতে, গাত্র যায় পুড়ে'। ২৯
না পারি রহিতে আর ঘুরিতেছে মন,
অশুভ লক্ষণ কত করি নিরীক্ষণ। ৩০
নাহি শ্রেয়ঃ বন্ধুজনে করি' রণে হত ;
না চাহি বিজয়, কৃষ্ণ, রাজ্য সুখ যত। ৩১

*ধৃতরাষ্ট্র এবং অর্জ্জুন উভয়কেই "ভারত" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে ; কারণ ইঁহারা দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বংশ।

কি হবে শ্রীহরি রাজ্যে ? কি ভোগে, জীবিতে ?
রাজ্য ভোগ সুখ চাহি যাহাদের হিতে, ৩২
ধনে প্রাণে মায়া ত্যেজে' এসেছে যে তারা।
আচার্য্য, পিতা ও পুত্র, পিতার পিতারা, ৩৩
মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, স্বজন—
বধিব না মরিলেও হে মধুসূদন। ৩৪
ত্রিভুবনো যদি পাই,—মেদিনী ত ছার,
কুরুকুল বধি' হরি, কি সুখ আমার ? ৩৫
আততায়ী ? তবু পাপ জ্ঞাতি বধি' সব।
নাহি কাজ করি' ধ্বংস সবংশ কৌরব, -
স্বজন-নিধনে সুখী হব কি, মাধব ? ৩৬

এরা না দেখুক, লোভে অভিভূত মন,—
কুল-ক্ষয়ে মিত্র-দ্রোহে পাতক-কেমন। ৩৭
মোরা কেন, এ হ'তে না নিবর্ত্তন করি,
কুল-নাশে দোষ যত জানি যে শ্রীহরি ? ৩৮

কুলক্ষয়ে নাশ পায় কুলধর্ম্মচয়,
ধর্ম্ম গেলে কুলে যত অধর্ম্ম-উদয়, ৩৯
অধর্ম্ম-উদয়ে, কৃষ্ণ, কুলস্ত্রী দূষিত,
স্ত্রীদোষে সঙ্কর-বর্ণে দেশ অধ্যুষিত, ৪০
সঙ্করে নরক আনে কুলঘ্ন কুলের,
পিতার পতন, লোপ পিণ্ড ও জলের, ৪১
সঙ্কর-জনক যত কুলঘ্নের দোষে
জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম নষ্ট শাশ্বত সে। ৪২
কুলধর্ম্ম-বিহীন জনার, জনার্দ্দন,
নরকে নিয়ত বাস, করিনু শ্রবণ। ৪৩

অহো, কি মহৎ পাপ বসেছি করিতে—
রাজ্যসুখ-লোভে আসি জ্ঞাতি সংহারিতে? ৪৪
যদি শস্ত্রহীন জানি' শস্ত্রপাণি সবে
এ সমরে বধে মোরে, সেই ভাল হবে।" ৪৫
এত বলি' পার্থ রণে রথ-কোণে বসে,
বিসর্জ্জিয়া ধনুঃশর শোকার্ত্ত মানসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

— সাংখ্য-যোগ —

সঞ্জয়—

তখন করুণাবিষ্ট সজল-নয়ন
বিষণ্ণ অর্জ্জুনে কৃষ্ণ কহিলা বচন— ১
"কোথা হতে উপজিল এ মোহ তোমার
অধর্ম্ম, অনার্য্যোচিত, অকীর্ত্তি-আগার ? ২
শোকার্ত্ত হয়ো না পার্থ, অযুক্ত সে তব,
ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা ছাড়ি' উঠ পরন্তপ !" ৩

অর্জ্জুন—

ভীষ্ম দ্রোণ পূজ্য মম। কেমনে, শ্রীহরি,
শরাঘাতে দোঁহা সাথে প্রতিরণ করি ?
মহাগুরু নাহি বধি' ভিখ্ মাগি' খাই যদি
ভব-মাঝে নিরবধি, তবু রব তৃপ্ত—
হত করি' গুরুজনে যদি বরি কামধনে,
সে যে হবে এ ভুবনে রুধিরেতে লিপ্ত ! ৫
বুঝি না কো এ উভয় কিসে হাঁগো শ্রেয় হয়—
মোরা যদি লভি জয়, কিবা হই খর্ব্ব ?
যাদের নিধন করি' চাহি না জীবন ধরি,
রয়েছে সমুখ' পরি তারাই যে সর্ব্ব ! ৬
এ বিপদে অয়ি হরি, অভিভূত হয়ে' পড়ি,
তোমায় জিগাঁস করি সমাকুল চিত্তে,—

আজি হয় ভালো যাহা বুঝাইয়া বলো তাহা
শরণে আগত আহা এই তব শিষ্যে। ৭
কিছু নাহি পাই দিশে, এ শোক যাইবে কি:সে।
দেহ মন বিশোষি' সে লবে মোর সত্য,
যদিও পৃথিবী-মাঝ হই একা অধিরাজ,
অথবা ত্রিদিবে আজ লভি আধিপত্য। ৮

এত বলি' হৃষীকেশে পার্থ পরন্তপ
"যুদ্ধ না করিব" কহি' রহিলা নীরব। ৯
বিষণ্ণ অর্জ্জুনে হরি সহাস্যে তখন,—
দুধারে সজ্জিত সেনা,—কহেন বচন;—১০
"সত্য কথা! কিন্তু কেন অশোচ্যে শোচনা?
মৃতে কি জীবিতে নাহি জ্ঞানীর বেদনা। ১১
তুমি, আমি, এ রাজারা না ছিনু কখন,
না রবে পরেও সবে, নহে ত এমন। ১২
কৌমার যৌবন জরা যেমন দেহীর
তেমনি দেহান্ত, তাহে ভ্রান্ত নহে ধীর। ১৩
কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়-যোগে মিথ্যা শীতাতপ
সুখদুঃখ আসে যায়,—সহ্য কর সব। ১৪
ইথে যে পুরুষবর, ব্যথিত না হবে'
দুঃখ-সুখে শান্ত মুখে মোক্ষ সেই লভে। ১৫
নাহি সত্তা অনিত্যের, না নিত্যের হানি—
দুয়েরি দেখেছে তথ্য যত তত্ত্বজ্ঞানী। ১৬
অবিনাশী নিত্যে জেনো' ব্যাপ্ত এ সংসার,
বিনাশয়ে সে অব্যয়ে হেন সাধ্য কার? ১৭

অন্ত আছে এ দেহেরি, আত্মার তা নাই,
সে যে নিত্য, অপ্রমেয় !—যুঝ পার্থ তাই। ১৮
যে ইহারে জানে হন্তা, যে মানে হত বা,
দোঁহে অজ্ঞ,—নহে হন্তা, হত এ অথবা। ১৯

"জনম নাহি, মরণ নাহি কখনো আপনার
হয়নি আজি, রয় নি বাঁচি, হবে না ফিরে আর।
অজ সে জন নিরঞ্জন পুরাণ শাশ্বত—
দেহেরে যদি ফেলেরে বধি' নহে সে তবু হত। ২০

"অক্ষয় অব্যয় অজ নিত্য এরে দেখে,
কে কারে করায় বধ, কারে বা বধে কে ? ২১

"বসন খানি জীর্ণ মানি' যেমন তারে ফেলে'
আরেক নব বসন পরে মানব অবহেলে,
তাহারি প্রায় দেহীর কায় জীর্ণ হ'লে পর
আবার সে যে গ্রহণ করে নূতন কলেবর। ২২

"নাহি কাটে অস্ত্রে ইহা, না দহে উকায়,
না ভিজে সলিলে, নাহি সমীরে শুকায়। ২৩
অভাজ্য, অদাহ্য এযে, অশোষ্য, অচল,
নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অনাদি, অমল, ২৪
অব্যক্ত, অচিন্ত্য, এরে অবিকার্য্য কহে—
হেন বুঝি' শোক তব সমুচিত নহে। ২৫

"যদি বলো—আত্মা সদা জন্মে আর মরে,
শোকার্ত্ত হয়ো না পার্থ, তবু তার তরে। ২৬
জন্মিলে মরিতে হবে, হবে জন্ম ম'লে,—
তবে অনিবার্য্যে তব কেন মর্ম্ম জ্বলে ? ২৭
আদিতে অব্যক্ত জীব, অব্যক্ত নিধনে,
মাঝে ব্যক্ত কিছু দিন ;—কি কাজ ক্রন্দনে। ২৮

"চমৎকার লাগে সে বড় কাহারো দরশনে,
চমৎকার কেমন তেঁহ, অপর কেহ ভণে,
চমৎকার কেহ বা আর শুনিছে তারে, তবু
শুনেও পিছু স্বরূপ কিছু বুঝিতে নারে কভু।

"দেহী নিত্য অবধ্য যে সবাকার দেহে,—
তবে কারো লাগি তুমি কেন কাঁদিবে হে? ৩০
স্বধর্ম্মে চাহিয়া পার্থ, ভয় না করিয়ো,
ধর্ম্ম-যুদ্ধ চেয়ে' শ্রেয় জানে না ক্ষত্রিয়। ৩১
আপনি উদিল যুদ্ধ—মুক্ত স্বর্গদ্বার,
ভাগ্যবান্ ক্ষত্রেরি এ ক্ষেত্র সুবিধার। ৩২
তুমি যদি এই ধর্ম্ম যুদ্ধ নাহি কর,
স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লোপে পাপ হবে বড়। ৩৩
অখ্যাতিও চির তরে। দিবে নরে ধিক্—
সমর্থে অকীর্ত্তি সে যে মৃত্যুর অধিক। ৩৪
'ভয়ে রণে ভঙ্গ দিলে,' কহিবে মহতে,
যারা মানিয়াছে, গ্লানি পাবে সবা' হ'তে। ৩৫
অকথ্য কতনা কথা রটাইবে অরি,
নিন্দিবে ক্ষমতা তব—দুঃখে যাবে মরি'। ৩৬
হত হয়ে' লভ স্বর্গ, জিনি' ভুঞ্জ ধরা—
তবে উঠ, কুন্তীসুত, স্থিরি' যুদ্ধ করা। ৩৭
সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়,
তুল্য ভাবি' যুদ্ধে লাগো,—নহে পাপ হয়। ৩৮

"জ্ঞান-যোগ কহিনু এ। কর্ম-যোগ শুন,
যাহাতে খুলিবে, পার্থ, কর্ম্ম-বন্ধ পুনঃ— ৩৯
কর্ম্মের বিনাশ নাই; নাই প্রত্যবায়;
অল্পেই মহান্ ভয়ে লোকে ত্রাণ পায়। ৪০

স্থির বুদ্ধি একা ইথে, কিন্তু হে কৌন্তেয়,
বহুধারা অন্তহারা চল চিন্তা যে ও। ৪১
"এই যে পুষ্পিতা বাণী বলে ভ্রান্তগণ—
'বেদ ভিন্ন কিছু নাই', - হে কুন্তী-নন্দন, ৪২
'জন্ম-কর্ম্মফল দিবে যজ্ঞ কর যত' -
কামাত্মারা স্বর্গলোভী ভোগসুখে রত। ৪৩
ভোগসুখীদের সেই কথায় ভুলিলে
স্থিরবুদ্ধি কদাপি না সমাধিতে মিলে। ৪৪
"কামনার্থ বেদ। পার্থ, হও কামাতীত,
নির্দ্বন্দ্ব, নির্যোগক্ষেম*, আত্মিক, সাত্ত্বিক। ৪৫
কিবা কাজ বাপী কূপে? বন্যা-রূপে বারি।
কবে লাগে সর্ব্ব বেদ ব্রহ্ম-বিজ্ঞাতারি? ৪৬
"কর্ম্মে তব অধিকার, নহে ফলে কভু -
না চাহ কর্ম্মের ফল, কর্ম্ম কর তবু। ৪৭
যোগস্থ নিষ্কাম কর্ম্ম কয় ধনঞ্জয়,
ফলাফলে সাম্য হলে' তারে 'যোগ' কয়। ৪৮
এই 'সাম্য' হ'তে কাম্য কর্ম্ম কত দূরে।
সাম্যেরি আশ্রয় লহ—ফল চাহে মূঢ়। ৪৯
যোগস্থ যে ভবে ত্যজে সুকৃত দুষ্কৃত—
যোগকর্ম্মে লাগো, যোগ কর্ম্মে কৌশলি ত। ৫০
যোগযুক্ত জ্ঞানী ছাড়ি' কর্ম্মফল যত
জন্মবন্ধে হয়ে মুক্ত পায় বিষ্ণুপদ। ৫১
যবে মন মোহ বন পারে পঁহুছিবে,
শুনেছ যা', শুনিবে যা', কিছু না রুচিবে। ৫২
শ্রুতি হতে ফিরি' মতি সুদৃঢ় নিশ্চল
সমাধিস্থ হলে' যোগ লভিবে কেবল। ৫৩

*যোগ—উপার্জ্জন, ক্ষেম—রক্ষণ। দুই বিষয়েই চিন্তা-রহিত হও।

অর্জ্জুন—

স্থিরচিত্ত সমাধিস্থ কারে কৃষ্ণ, বলে ?
কি ভাষে, কিরূপ বা সে, কিরূপে সে চলে ? ৫৪

শ্রীভগবান্—

ছাড়ি' যত মনোগত কামনা সে যদি
আপনাতে সদা মাতে, সেই ত স্থিরধী। ৫৫
দুখে নাহি কাঁদে মন, সুখে সাধ নেই,
নাহি রাগ ভয় ক্রোধ, সুধী মুনি সেই। ৫৬
সবাতে মমতাহীন, লভি' শুভাশুভ
না সুখী না দুঃখী যে, সে স্থিরবুদ্ধি ধ্রুব। ৫৭
কূর্ম্মের অঙ্গের পারা ইন্দ্রিয়সংহতি
সংহরে যে বিশ্ব হতে—সেই স্থিরমতি। ৫৮
যদিও ইন্দ্রিয়চয় বিশ্ব হতে ফেরে,
তবু 'সঙ্গ' নাহি যায়, যায় ব্রহ্ম হেরে'। ৫৯
যতন করুন যত বিবেকী পুরুষ,
দুরন্ত ইন্দ্রিয় তবু হরে তাঁর হুঁশ। ৬০
সমস্ত সংযত. শুধু যোগস্থ মৎপর
বসিবে ইন্দ্রিয় যাঁর সেই যতিবর। ৬১
বিষয়ের ধ্যান হ'তে 'আসঙ্গ' উপজে,
'সঙ্গে' কাম, 'কাম' হ'তে ক্রোধের জন্ম যে, ৬২
'ক্রোধ' হ'তে মোহ, 'মোহে' স্মৃতিভ্রম করে,
স্মৃতিভ্রমে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে মরে। ৬৩
রাগ-দ্বেষে মুক্ত যে, সে ইন্দ্রিয়েরি যোগে
পরম প্রসাদ পায় বিষয়সম্ভোগে। ৬৪
প্রসাদে যতেক দুঃখ ঘুচে যায় তার—
অচিরেই বসে বুদ্ধি প্রসন্ন-চেতার। ৬৫

অসিদ্ধের বুদ্ধি নাই, না আছে ভাবনা,
অচিন্তনে শান্তি কোথা, অশান্তে সান্ত্বনা ? ৬৬
ইন্দ্রিয়ের পিছু গেলে বুদ্ধি সে ডুবায়—
তরঙ্গে তরীরে যথা মগ্ন করে বায়। ৬৭
হে পার্থ, ইন্দ্রিয় যাঁর নিত্য নিগৃহীত
সমগ্র বিষয়ে, তাঁরি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬৮
সবার যা নিশি, যোগী তখন জাগিয়া,
সবে জাগে, যোগী থাকে নিদ্রাতে লাগিয়া। ৬৯
পূর্ণ-নীব দৃঢ় স্থির সমুদ্রে যেমন
সলিল-রাশি আপনি আসি' পশিছে অনুখন,
তেমমি সারা কামনা-ধারা প্রবেশে যাঁহে নিজে
তিনিই পান শান্তি, নহে ভোগ-আকাঙ্ক্ষী যে। ৭০
পরিহরি' সর্ব্বকাম নিস্পৃহ যে চরে,
নির্ম্মম নিরহঙ্কার, শান্তি তারি তরে। ৭১
এই, পার্থ, ব্রহ্মনিষ্ঠা ;—মোহে না যা পেলে,
অন্তিমেও যাহে রহি' মহামুক্তি মেলে। ৭২

তৃতীয় অধ্যায়

—কর্ম্মযোগ—

অর্জ্জুন—

তব মতে কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান যদি বড়—
তবে মোরে কর্ম্ম ঘোরে কেন যোগ কর ? ১
এ সন্দিগ্ধ বাক্যে, হরি, মুগ্ধ মোর চিত'—
যাহে শ্রেয় লভি হেন বলহ নিশ্চিত। ২

শ্রীভগবান্ —

পূর্ব্বেই বলেছি—দুই নিষ্ঠা আছে ভবে,
জ্ঞানীরা তা জ্ঞানে, যোগী কর্ম্মে তাহা লভে। ৩
কর্ম্ম না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্ম্য না পায়,
কর্ম্মের ত্যাগেও নাহি সিদ্ধির উপায়। ৪
কে রহিবে ছাড়ি' ভবে কর্ম্ম অনুষ্ঠান ?
স্বভাব গুণেই সবা সদা কর্ম্মবান্। ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয় রুধিয়া যে ইন্দ্রিয়বিষয়
মনে মনে স্মরে, তারে মিথ্যাচারী কয়। ৬
শ্রেষ্ঠ সেই— মানসেই ইন্দ্রিয় রুধি' যে
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কর্ম্ম করে, অনাসক্ত নিজে। ৭
নিত্যই করিবে কর্ম্ম— সে অকর্ম্ম বাড়া ;
শরীর-যাত্রাও নাহি চলে কর্ম্ম ছাড়া। ৮
যজ্ঞ বিনা কর্ম্ম কি, না কেবল বন্ধন,—
অসক্ত যজিবে কিন্তু, হে কুন্তী-নন্দন। ৯
যজ্ঞ সহ প্রজা সৃজি' কন প্রজাপতি—
"যজ্ঞেই বাড়িবি তোরা, পাইবি যা মতি। ১০

দেবগণে তোষ' ইথে, তুষুন তাঁরাও—
পাবে শ্রেয়, যদি হেন এ ওরে বাড়াও। ১১
যাগপুষ্ট দেবে ইষ্ট দিবেন কত না,—
দেবে না নিবেদি' ভুঞ্জে, তস্কর সে জনা।" ১২
যজ্ঞ-শেষ-ভক্ষকের সর্ব্ব পাপ ঘোচে—
পাপ মাত্র পেটে, পার্থ, যায় স্বার্থ-ভোজে। ১৩
অন্ন হ'তে হয় জীব, অন্ন বৃষ্টি-পাতে,
বৃষ্টি হয় যজ্ঞ হ'তে, যজ্ঞ কর্ম্ম-জাতে, ১৪
কর্ম্ম হয় বেদে, বেদ পরম অক্ষরে—
সর্ব্ব-গত ব্রহ্ম তাই যজ্ঞে বাস করে। ১৫
এ জগৎচক্রে যে না করিবে বর্ত্তন,
পার্থ, তার ব্যর্থ পাপ জীবন কর্ত্তন। ১৬
যিনি আত্মরতি, যিনি আত্ম-তিরপিত,
আত্ম-তুষ্ট যিনি, তাঁরি কর্ম্ম বিরহিত। ১৭
কর্ম্মে তাঁর নাহি কাজ, অকর্ম্মেও নাহি,—
ভব-মাঝে কার কাছে কিবা তাঁর চাহি? ১৮
অনাসক্ত হয়ে' তবে করহ করম—
নিষ্কাম কর্ম্মই লভে পরম চরম। ১৯
কর্ম্মেই লভিলা সিদ্ধি রাজর্ষি জনক—
তুমিও করহ কর্ম্ম চাহি' সর্ব্বলোক। ২০
যা যা করে শ্রেষ্ঠে, তাই সাধারণে করে,
তাঁরা যা মানেন লোকে তাই অনুসরে। ২১
ত্রিভুবনে সে কি কাজ, করিবে যা' হরি?
পাই নি কি? পাব না কি? তবু কাজ করি। ২২
যদি আমি বিনিদ্র না কর্ম্ম করি কোথা
আমারি পথে যে লোক চলিবে সর্ব্বথা। ২৩

উৎসন্ন দিব এ লোক কর্ম্ম না করিলে,
সমাজে সঙ্কর হবে প্রজারা পড়িলে। ২৪

ফললোভে শুধু ভবে মূর্খে কাজ করে—
অনাসক্ত জ্ঞানী খাটে লোকরক্ষা তরে। ২৫

নাহি করি' বিচলিত আসক্ত অজ্ঞানে,
লাগিয়া লাগাবে কাজে তাদেরে বিদ্বানে। ২৬

প্রকৃতির গুণে যত কর্ম্ম সমাপন,—
অহঙ্কারে আত্মা ভাবে কর্ত্তাই আপন। ২৭

গুণ-কর্ম্ম-ভেদ তত্ত্ব অবগত যাঁরা,
গুণমর্ম্মে পশি কর্ম্মে অনাসক্ত তাঁরা। ২৮

প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ লাগে গুণ-কাজে—
অজ্ঞ জনে সর্ব্ব-জ্ঞানী বিচালিবে না যে। ২৯

আমাতে সমস্ত কাজ ন্যস্ত কর বুঝি'—
নিস্পৃহ নির্ম্মম লহ বিনাশোকে যুঝি। ৩০

যে মোর এ যোগ নিত্য শ্রদ্ধায় অদ্বেষে
অনুষ্ঠিবে, কর্ম্ম হ'তে মুক্তি লভিবে সে। ৩১

ঈর্ষায় যে না চলিবে মম মতে হেন,
সর্ব্বজ্ঞানে মূঢ় তার নষ্টমতি জেনো। ৩২

জ্ঞানীও চলেন স্বীয় প্রকৃতির সনে ;
'প্রকৃতিই পায় জীব'—কি করে দমনে ? ৩৩

ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভোগে রাগ-দ্বেষ ধাঁধা—
হয়ো না তাদের বশ শ্রেয়ে তারা বাধা। ৩৪

পর-ধর্ম্ম কর সুষ্ঠু তবু শ্রেষ্ঠ নয়—
স্বধর্ম্মে মরণো ভাল, পর-ধর্ম্মে ভয়। ৩৫

অর্জ্জুন—

তবে, হরি, পুরুষেরা কিসে পাপে টলে ?
অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপে বাঁধা যেন বলে ? ৩৬

শ্রীভগবান্—

কাম সে যে, ক্রোধ সে যে, জাত রজোগুণে,
মহা খোর বৈরী ঘোর—রাখ' জেনে' শুনে'। ৩৭
ধুমে যথা বহ্নি ঢাকে, মুকুর মলায়,
জরায়ু জড়ায় গর্ভ – কামে জ্ঞান ছায়। ৩৮
জ্ঞানীর সে চিরশত্রু কাম দুষ্পূরণ
অগ্নি সম দগ্ধি' করে বুদ্ধি আবরণ। ৩৯
ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সবাতে সে রহে—
জ্ঞান টুটি' সবে যুটি' শেষে আত্মা মোহে। ৪০
তাই পার্থ, ইন্দ্রিয়ার্থ আগে অবরুধি'
জ্ঞান বিজ্ঞানের হন্তা কাম ত্যজ, সুধী। ৪১
ইন্দ্রিয় দেহের বড়, তার বড় মন,
মন হতে বুদ্ধি বড়, কি বড় সে জন—৪২
পরমাত্মা হেন বুঝি, স্তম্ভিয়া শরীর,
কামরূপ দুরাসদ বৈরী বধ', বীর। ৪৩

———

চতুর্থ অধ্যায়

—জ্ঞানবিভাগ যোগ—

শ্রীভগবান্—

সূর্য্যকে কহিনু আমি এ যোগ অক্ষয়,
সূর্য্যও মনুরে, মনু ইক্ষ্বাকুরে কয়। ১
পরে পরে শিক্ষা করে রাজর্ষিরা সব—
কালবশে বিনষ্ট সে, শুন পরন্তপ। ২
আজি তোমা কহি সেই যোগ পুরাতন,
তুমি মম ভক্ত সখা, কথাও উত্তম। ৩

অর্জ্জুন—

তুমি জন্ম লহ শেষে, সূর্য্যই প্রথমে,
এ যোগ বলেছ পূর্ব্বে ! বুঝিব কেমনে ? ৪

শ্রীভগবান্—

বহু জন্ম গত মম, কত গেছে তব,
অবগত সব আমি, নহ পরন্তপ। ৫
অজ ও অব্যয় আমি সর্ব্বভূত-প্রভু—
স্বপ্রকৃতি যোগে জন্মি স্ব-মায়াতে তবু। ৬
যখনি ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্ম উচ্ছ্রায়,
তখনি অর্জ্জুন, আমি সৃজি আপনায়। ৭
করিতে দুষ্কৃতে নাশ, তরিতে সাধুকে,
ধর্ম্মের স্থাপনে আমি, জন্মি যুগে যুগে। ৮
জন্ম কর্ম্ম দিব্য মম—যে বা জানে সার,
সেই মোরে লভে, নাহি পুনর্জ্জন্ম তার। ৯

রাগ ভয় ক্রোধ ছাড়ি' আমারি আশ্রয়ে
অনেকেই জ্ঞানে পূত গেছে মুক্ত হয়ে'। ১০
যে মোরে যেমনি ভজে, তুষি তারে তথা—
মানব আমারি পথে আসিবে সর্ব্বথা। ১১
কাজে সিদ্ধি খুঁজে' যারা পূজে দেব ভবে,
ত্বরায় ধরায় তারা কাম্য ফল লভে। ১২
গুণ-কর্ম্ম-ভেদে আমি চারি বর্ণ সৃজে'
অধিকারী রহি, তবু নহি কর্ত্তা নিজে। ১৩
কর্ম্মে নাহি মজি, নাহি কর্ম্ম-ফলে আশ—
এ যে জানে তারে নাহি বাঁধে কর্ম্মপাশ। ১৪
এমনি করেছে কর্ম্ম কত মোক্ষকামী—
কর কর্ম্ম তুমি তবে যথা পূর্ব্বগামী। ১৫
কর্ম্ম সে কি, অকর্ম্ম কি জ্ঞানীও না জানে-
তাই কহি কর্ম্ম যাহা অমঙ্গল ত্রাণে। ১৬
কর্ম্ম কি বুঝিতে হবে, বি-কর্ম্ম কি সেও,
অকর্ম্মই বা কি,—কর্ম্মগতি যে দুর্জ্ঞেয়। ১৭
কর্ম্মে যে অকর্ম্ম দেখে, অকর্ম্মেতে কাজ,
সেই সর্ব্বকর্ম্ম, যোগী, জ্ঞানী লোক-মাঝ। ১৮
যার সারা কর্ম্ম কাম-সংকল্প-বর্জ্জিত,
জ্ঞানানলে দগ্ধ বলে বিদগ্ধ তারি ত। ১৯
বিনা ফলে তৃপ্ত গণি', নিত্য অনির্ভরে
কর্ম্মে যে প্রবৃত্ত, সেই কর্ম্ম নাহি করে। ২০
নিষ্কাম, যতাত্মা, ত্যজি সর্ব্ব পুরস্কার,
কায়-কর্ম্ম করিলেও অধর্ম্ম কি তার? ২১
যা পায় তাতেই তুষ্ট, দ্বন্দ্ব-বৈর হীন,
সম সিদ্ধি অসিদ্ধিতে, নহে কর্ম্মাধীন। ২২

অনাসক্ত মুক্ত, যাঁর জ্ঞানে চিত্ত রয়,
যথাচারে যত তাঁর কর্ম্ম পায় লয় ; ২৩
ব্রহ্ম পাত্র, বহ্নি, ঘৃত, ব্রহ্মে হোম যাঁর,
ব্রহ্ম কর্ম্ম সর্ব্ব ভাবি ব্রহ্মে গতি তাঁর। ২৪

কোন যোগী দেব-কর্ম্ম, সম্যক্ আচরে,
ব্রহ্মানলে কর্ম্ম ঢালে আহুতি অপরে, ২৫
ইন্দ্রিয়-আহুতি কারো ব্রতানলে হয়,
ইন্দ্রিয়-অনলে কারো আহুতি বিষয় ; ২৬
আত্মধ্যান-যোগানলে—জ্ঞানে জ্বলে যাহা,
সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণকর্ম্ম কেহ ঢালে আহা। ২৭
দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ আর
বেদ-পাঠ-জ্ঞান-যজ্ঞ যোগীন্দ্র জনার। ২৮
অপানে আহুতি' প্রাণ, প্রাণেতে অপান ;
প্রাণাপান রুধি' কেহ করে প্রাণায়াম, ২৯
কেহ প্রাণে প্রাণাহুতি দেয় যতহারী।
যাজ্ঞিকের যত পাপ যজ্ঞে যায় ছাড়ি। ৩০
যজ্ঞ-শেষে সুধা পিয়ে' পরব্রহ্ম পায় ;—
অযজ্ঞের ইহ নাহি, পরত্র কোথায় ? ৩১
হেন যজ্ঞ বহু আছে ব্রহ্ম* মুখে জাগি'—
কর্ম্মজ সকলি জানি' হও মোক্ষভাগী। ৩২
দ্রব্যময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞান-যজ্ঞ বড়—
নিখিলে যতেক কর্ম্ম জ্ঞান-মাঝে জড়'। ৩৩
নতি সেবা প্রশ্নে জ্ঞান লভ পরন্তপ,—
সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীরাই শিক্ষা দিবে তব। ৩৪

*বেদ

জ্ঞান লভি', ওহে পার্থ মোহে না পড়িবে,
আমাতেই সর্ব্ব জীব দর্শন করিবে। ৩৫
সারা পাপী বাড়া পাপী হও তুমি যদি,
জ্ঞান-প্লবে পার হবে ভবের জলধি। ৩৬
জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ ইন্ধনের মত
জ্ঞানাগ্নিতে সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মে পরিণত। ৩৭
জ্ঞান সম শুচিতম কিছু নাহি ভবে,
যোগীরা আপনি কালে আত্মজ্ঞান লভে। ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভে জ্ঞান হবে জিতেন্দ্রিয়,
জ্ঞান-লাভে শান্তি পাবে পরম আত্মীয় ৩৯
অজ্ঞ যেই, শ্রদ্ধা নেই, সন্দেহে সে মরে,
ইহ পর যায় চুকে' সুখে নাহি তরে। ৪০
ব্রহ্মে কর্ম্ম দিয়া জ্ঞানে ছেদিয়া সংশয়,
সাধুরা না কর্ম্মে বাঁধা পড়ে, ধনঞ্জয়। ৪১
মোহজ এ দ্বিধা হৃদে জ্ঞান-খড়্গে টুট',
কর্ম্মযোগে লাগো তবে, ওগো পার্থ, উঠ'। ৪২

পঞ্চম অধ্যায়

—কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ—

অর্জ্জুন—

ত্যাগ আর যোগ, কৃষ্ণ কহিলে উভয়,—
দুয়ের যা ভাল, মোরে বল' তা' নিশ্চয়। ১

শ্রীভগবান্ —

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মযোগ,—দুই মোক্ষ-ভূমি,
তার মাঝে কর্ম্মযোগ জেনো শ্রেষ্ঠ তুমি। ২
ত্যাগী নিত্য রাখি' চিত্ত না দ্বেষে, না আশে,
বিনা দ্বন্দ্বে ভব-বন্ধে মুক্ত অনায়াসে। ৩
ত্যাগে যোগে ভিন্ন কহে শিশু। কিন্তু জ্ঞানী
যুগ্ম ফল পায় একে পূর্ণ অনুষ্ঠানি'। ৪
যে মুক্তি মিলায় জ্ঞানে, কর্ম্মেও তা লেখে,—
ত্যাগে যোগে তুল্য যেই দেখে, সেই দেখে। ৫
যোগ ছাড়া ত্যাগ, পার্থ, দুঃখের কারণ—
কর্ম্মযোগী অচিরেই ব্রহ্মভোগী হন। ৬
পূতাত্মা, জিতাত্মা যোগী, জিতেন্দ্রিয় যে,
ভূতাত্মা যাহার আত্মা কর্ম্মে সে না মজে। ৭
ব্রহ্মবিৎ কর্ম্মী ভাবে,—কিছু করে না সে,
দেখে শোনে, ছোঁয়, শোঁকে, খায়, যায়, শ্বাসে, ৮
কহে, ত্যজে, গ্রহে, ও যে ঘুমায়, তাকায়,
সে হয় ইন্দ্রিয়চয় 'বিষয়ে' থাকায়। ৯
কর্ম্মীতে,—যে সঙ্গ* ত্যজে' ব্রহ্মে সঁপে ফল,—
লিপ্ত নহে পাপ, যথা পদ্ম-পাতে জল। ১০

*সঙ্গ-আসক্তি।

কায় মন বুদ্ধি আর শুদ্ধ যে ইন্দ্রিয়ে
কর্ম্মী খাটে, 'সঙ্গ' কাটে, শুদ্ধির লাগিয়ে। ১১
কর্ম্মফল-ত্যাগী যোগী শান্তি পায় পরা—
অযুক্ত যে ফলাসক্ত কামে বাঁধা পড়া'। ১২
সারা কর্ম্ম ছাড়া' মর্ম্ম বুকে রাখে বশী,
নবদ্বার দেহ-পুরে সুখে থাকে বসি'। ১৩
কর্ত্তৃত্ব কি কর্ম্ম প্রভু জীবের না সৃজে,
না করেন ফলভাগী ; করে প্রকৃতি যে। ১৪
না লন কাহারো বিভু সুকৃত দুষ্কৃত ;
মুগ্ধ লোক,—জ্ঞানালোক অজ্ঞানে আবৃত। ১৫
জ্ঞানে আত্ম-অজ্ঞানতা যে করেছে নাশ,
সূর্য্যসম ব্রহ্মজ্ঞান তাহে স্বপ্রকাশ। ১৬
ব্রহ্মে বুদ্ধি আত্মা নিষ্ঠা রাখি' যে তৎপর,
সেই মুক্ত,—জ্ঞানে ধৌত কলুষ নিকর। ১৭
বিদ্বান্ বিনয়ী বিপ্রে, ষণ্ডে, ও শুণ্ডীতে,
কুক্কুরে, চণ্ডালে তুল্য হেরেন পণ্ডিতে। ১৮
জীবনে সে ভবজয়ী সাম্যে মতি যার,
ব্রহ্ম যে সর্ব্বত্র! তাই ব্রহ্মে ঠাঁই তার। ১৯
হৃষ্ট নহে ইষ্ট পেয়ে, না ক্ষুব্ধ, অপ্রিয়ে
স্থিরধী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মে না মুগ্ধ রহিয়ে। ২০
বাহিরে নাহি রে সঙ্গ, সুখী সে অন্তরে,—
ব্রহ্মে দৃঢ় বসি', চির সুখ ভোগ করে। ২১
বিষয় পরশে সুখ বিষাদ-কারণ—
ক্ষণিক সে গণি' তাহে জ্ঞানী রত নন। ২২
এ দেহ-ত্যাগের আগে কামক্রোধ-ঝুঁকি
যে পারে সহিতে ভবে, সে যোগী সে সুখী। ২৩

আত্মাতেই যাঁর লক্ষ্য, সুখ ও আরাম,
ব্রহ্মে লীন সে যোগীন্ মহামুক্তি পান। ২৪
মহা মোক্ষ লভে ঋষি বিনাশি' দুরিত,
দ্বিধা কাটি', চিত্ত আঁটি', সাধে সর্ব্ব হিত। ২৫
কাম ক্রোধে মুক্ত যতী, চিত্ত যার বশে,
ইহ পরে যায় তরে' জানিয়া তত্ত্ব সে। ২৬
বাহ্যজ্ঞান টুটি', আঁখি ভুরুদুটি মাঝে ;
প্রাণাপান সুসমান,—নাসাপুটে রাজে ; ২৭
রুধিয়া ইন্দ্রিয় মন মুনি মোক্ষপর,
কাম ক্রোধ ভয় জিনি' মুক্ত নিরন্তর। ২৮
সর্ব্বলোকপ্রভু আমি, প্রভু যজ্ঞে তপে,
নিখিলের সখা আমি—দেখি' শান্তি লভে। ২৯

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

—অভ্যাস যোগ—

শ্রীভগবান্—

না চাহি' যে কর্ম্মফল করে করণীয়,
ত্যাগী সে যোগী সে,—নহে নিরগ্নি নিষ্ক্রিয়*
যারে ত্যাগ বলে, পার্থ, জেন' যোগ তাই—
সে কি যোগী, ফলে আশা যেবা ত্যজে নাই ?
যে মুনি উঠিবে যোগে কর্ম্ম সে পোহায়,
যোগে আরোহিলে তার ত্যাগই সহায়। ৩
যিনি পার্থ, ইন্দ্রিয়ার্থ-কর্ম্মে কারো নন,
ভোগে ছাড়ি' যোগে তাঁরি হয় আরোহণ। ৪
আত্ম-বলে তোল' আত্মা, না যায় সে পড়ি—
আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই সে অরি। ৫
যে আত্মা আপনা' জিনে সেই বন্ধুতুল,
আত্মারে না জিনি' আত্মা বর্ত্তে প্রতিকুল। ৬
জিতাত্মার আত্মাই সে বিরাজে সমানে—
শীতাতপে, দুঃখ সুখে, মান অপমানে। ৭
জ্ঞানে তৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত যোগিজন—
তাঁর কাছে তুল্য ঢিলা শিলা ও কাঞ্চন। ৮
সখা মিত্র বন্ধু অরি মধ্যস্থ দুর্জ্জনে
সাধু ত্যাগী দ্বেষ্যে* ভেদ শ্রেষ্ঠে নাহি গণে। ৯

*নিরগ্নি—অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি যে না করে।
নিষ্ক্রিয়—পুষ্করিণী খননাদি লোকহিতকর কার্য্য যে না করে।
*দ্বেষ্য—বিরাগভাজন। যথা,—মূর্খের পণ্ডিত দ্বেষ্য, নির্ধনের ধনী।

যোগী নিত্য সাধে চিত্ত একান্তে রহিয়া,
একা ছাড়ি' আশা-গেহ বাসা দেহ-হিয়া ; ১০
শুচি দেশে রচিবে সে অচল আসন
নাতি উচ্চ' ; পাতি' কুশ অজিন বসন,— ১১
সেথায় একাগ্রমনে বিবেক বুদ্ধিতে
বসিয়া সাধিবে যোগ আপনা' শুদ্ধিতে। ১২
শরীর মস্তক গ্রীবা সরল করিয়া,
বিক্ষিপ্ত না করি দৃষ্টি নাসাগ্রে ধরিয়া, ১৩
প্রশান্ত অ-ভয়াক্রান্ত ব্রহ্মচারিবর
সমাধিস্থ করি' চিত্ত রাখে মোর পর। ১৪
সাধি' হেন যোগ নিত্য সংযত মানসে,
মোক্ষভূমি শান্তি চুমি' আমাতে নিবসে। ১৫
যে অতি ভোজনশীল, অতি অনাহারী,
অতি নিদ্রা যায়, জাগে,—যোগ কি তাহারি ? ১৬
যাহার আহার নিদ্রা চেষ্টা চেতনাদি
পরিমিত,—তাহারি ত সুখের সমাধি। ১৭
বশীভূত চিত্ত যার আত্মগত রয়,
সারা কর্ম্মে স্পৃহা মুক্ত তারে 'যুক্ত' কয়। ১৮
নির্ব্বাত দীপের মত যোগীর অন্তর
আত্মযোগ অনুষ্ঠানে নিকম্প নিথর। ১৯
যেথায় নিরত চিত্ত বদ্ধ সাধনায়,
যেথা আত্মা হেরি' আত্মা মত্ত আপনায়, ২০
অতীন্দ্রিয় সুখ যেথা গ্রাহ্য শুধু জ্ঞানে,
তত্ত্ব জানি' আত্মা নাহি বিচলে যেখানে, ২১
যাহা লভি' অন্য লাভ না ঠেকে অধিক,
দুঃখ ঘোরে যাহা ধরে' থাকা যায় ঠিক—২২

তারি নাম যোগ,—তাহে দুঃখ না পরশে—
সাধহ তা সব্যসাচী চিত্তের হরষে, ২৩
সংকল্পজনিত কাম সর্ব্ব পরিহরি'
অন্তরে ইন্দ্রিয় যত সুসংযত করি। ২৪
ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে ধারণার বশে,
কিঞ্চিৎ চিন্তাও আহা না ওঠে মানসে। ২৫
হেথা সেথা ধায় মন অস্থির চঞ্চল—
সবলে আনিবে তারে স্বস্তির অঞ্চল। ২৬
শান্তিমনা যোগিজনা নির্ম্মল নিষ্পাপ,
ব্রহ্মত্ব লভিয়া করে শ্রেষ্ঠ সুখলাভ। ২৭
সমাধিতে মন দিতে পাতক পলায়,
ব্রহ্ম-পরশন সুখ যোগীর গলায়। ২৮
আত্মাতেই সর্ব্বভূত, আত্মা সর্ব্বভূতে
দর্শন করেন যোগী সমান চক্ষুতে। ২৯
যে মোরে সর্ব্বত্র হেরে, আমাতে সবারে,—
আমি কি অদৃশ্য তার, সেও কি আঁধারে? ৩০
সারা ঘটে রাজি বটে,—অভেদে ভজিয়া
সবা' মাঝে যোগী আছে আমাতে মজিয়া। ৩১
নিজের মতন, সখে, নিরখে যে সম
সুখ দুঃখ সবাকার, যোগী সে পরম। ৩২

অর্জ্জুন

কহিলে যে সাম্য-যোগ, হে মধুসূদন।
নিরখিব চির কি তা' চিত্তের সদন? ৩৩
চঞ্চল যে মন কৃষ্ণ, দুরন্ত দুর্ব্বার,
বায়ু-সম তারে বাধ্য করে সাধ্য কার। ৩৪

শ্রীভগবান্‌—

সত্যই চপল চিত্ত প্রবল অমন,—
অভ্যাসে সন্ন্যাসে কিন্তু তাহার দমন। ৩৫
যোগ সে দুষ্প্রাপ্য বটে অযত্ত-আত্মায়,—
যতী কিন্তু করি' যত্ন যোগ-রত্ন পায়। ৩৬

আগে যে ধরিয়া যোগ করিয়া ভকতি
পরে ভ্রষ্ট হয়, কৃষ্ণ, তাহার কি গতি? ৩৭
দু'দিক হারায়ে' সে কি ছিন্ন মেঘ সম
ব্রহ্ম-পথে নষ্ট হবে, কহ নরোত্তম। ৩৮
এ মোর সংশয় ঘোর নাশ', হরি, তবে,—
তোমা বিনা দ্বিধা আর কে ছেদিবে ভবে। ৩৯

শ্রীভগবান্‌—

যোগ-ভ্রষ্ট কভু নষ্ট নহে ইহ-পরে;
নাহিক দুর্গতি কারো, কল্যাণ যে করে। ৪০
ক্ষুণ্ণ যোগে পুণ্য-লোকে দীর্ঘকালবাসী
পবিত্র ধনীর গৃহে পুন' জন্মে আসি'। ৪১
কিংবা ধীর যোগিবংশে জন্ম হয় তার,—
যোগি-কুলে জন্ম আরো দুর্লভ ব্যাপার। ৪২
সেথায় সে বুদ্ধি-যোগ লভি' আগেকার
সিদ্ধি তরে যত্ন করে অধিক আবার। ৪৩
পূর্ব্বের অভ্যাস-বলে সতত সংযমী
যোগ জিজ্ঞাসিয়া যায় বেদ অতিক্রমি'। ৪৪

সযতনে যত যোগী গত-পাপ যবে
বহু জন্মে সিদ্ধ হ'য়ে মহামুক্তি লভে। ৪৫

তপ, জ্ঞান, কর্ম্ম যারা মানে ধর্ম্ম ভূমি,
যোগী সে সবারি বড়,—যোগী হও তুমি। ৪৬

সারা যোগী সেরা সে যে সঁপি' প্রাণমন
শ্রদ্ধা-ভরে সদা মোরে করে আরাধন। ৪৭

সপ্তম অধ্যায়

— জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ —

শ্রীভগবান—

মোর লাগি' যোগ জাগি' আমারই আশ্রয়ে
মোরে, পার্থ পূর্ণরূপে জান' অসংশয়ে। ১
জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা কহি সমুদয়—
সে জানিলে এ নিখিলে অজ্ঞাত কি রয়? ২
মানব সহস্রে কেবা জ্ঞানে যত্নবান?
যত্ন-যোগে সিদ্ধও কে পায় তত্ত্ব-জ্ঞান? ৩
ভূমি বারি, বহ্নি, বায়ু, নভ', মন, আর
বুদ্ধি, অহঙ্কার - অষ্ট প্রকৃতি আমার,—৪
সকলি নিকৃষ্ট; কিন্তু যে প্রকৃতি পরা
জীবরূপা সে যে, —তাহে সারা বিশ্ব ধরা। ৫
তাহে সর্ব্বভূত করে জনম ধারণ,
আমিই জগৎ সৃষ্টি প্রলয় কারণ। ৬
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাহি গণি,
আমাতে সকলি গাঁথা,- সূত্রে যথা মণি। ৭
জলে আমি রস, বিভা শশি-দিবাকরে,
বেদে মন্ত্র, নভে শব্দ, পুরুষত্ব নরে; ৮
পুণ্য গন্ধ ভূমে আমি, তাপ হুতাশনে
জীবন এ ভব-জীবে, তপ যোগি-জনে। ৯
সর্ব্বভূতে সনাতন বীজ জেনো মোরে।
তেজস্বীর তেজ আমি, বুদ্ধি সুধী-বরে। ১০

বাসনা-বর্জ্জিত বল আমি বল-যুতে,
ধর্ম্ম-অনুগত কাম আমি সর্ব্বভূতে। ১১
সত্ত্ব রজ' তমোগুণ আমারি জনিত—
তারাই আমার, আমি তাদের নহি ত। ১২
গুণত্রয়ে মুগ্ধ হয়ে' সারা বিশ্ব-লোক
নাহি জানে কোথা আমি পরম আলোক। ১৩
দৈবী এই গুণময়ী মায়া সতুস্তরা —
আমায় আশ্রিলে তায় সুখে যায় তরা'। ১৪
না পায় আমায় পাপী মূঢ় দুরজন—
মায়ায় মোহিত তারা দৈত্যের মতন। ১৫
চারিজনে পুণ্য মনে পার্থ, মোরে পূজে,
আর্ত্ত, জ্ঞানী, জিজ্ঞাসু, ও অর্থ যেবা খুঁজে। ১৬
তাহে শ্রেষ্ঠ নিত্যনিষ্ঠ মহাভক্ত জ্ঞানী —
সেই মম প্রিয়তম, তারো প্রিয় আমি। ১৭
জ্ঞানীই সতত তুল্য পরমাত্মা-সাথে,
নিষ্ঠামতি, - শ্রেষ্ঠা গতি তিষ্ঠায় আমাতে। ১৮
অনেক জন্মের পরে জ্ঞানী মোরে লভে—
বাসুদেবে বিশ্ব ভেবে' দুর্লভ সে ভবে। ১৯
কামে যারা জ্ঞান-হারা, অন্য দেবে নমে,
স্বকীয় প্রকৃতি বশে, স্বকীয় নিয়মে। ২০
ভক্তি-ভরে বাঞ্ছা করে যে যারে অর্চ্চিতে,
গাঢ় শ্রদ্ধা করি দান আমি তারি চিতে। ২১
সেই শ্রদ্ধা-ভরে তারা করে আরাধনা—
লভে শেষে আমা হ'তে বাঞ্ছিত কামনা। ২২
সে ফল ফুরা'য়ে ফেলে অল্পমতি নরে, —
দেবে সেবি' দেব মেলে, মোরে সেবি' মোরে। ২৩

অব্যক্ত আমারে ব্যক্ত মানে মূঢ় জন—
পরম অব্যয় রূপ না জানে কেমন। ২৪
না ফুটি সবার চোখে, যোগমায়া-ঘেরা',
অজ ও অক্ষয় আমি—না বুঝে মূর্খেরা। ২৫
জানি আমি রয়েছে যা হয়েছে যা, হবে,—
মোরে কেহ; হে কৌন্তেয়, নাহি জানে ভবে। ২৬
রাগ-দ্বেষ-সমুত্থিত দ্বন্দ্বাবেশ আসি'
জাত-মাত্র ফেলে, পার্থ, সর্ব্বভূতে গ্রাসি'। ২৭
যাহার কলুষ ক্ষুণ্ণ সেই পুণ্য নরে;
দ্বন্দ্ব-মোহে মুক্ত রহে, ভজে দৃঢ় মোরে। ২৮
জরা মৃত্যু-মোক্ষে মোরে যে করে আশ্রয়,
সে জানে অধ্যাত্ম, ব্রহ্ম, কর্ম্ম সমুদয়। ২৯
সাধিভূত, সাধিদৈব, সাধিযজ্ঞ মোরে,
জানিয়া, সে মরণেও মোরে না বিস্মরে। ৩০

(২৪) নির্ব্বোধেরা আমার পরমস্বরূপ না জানায়, আমাকে কর্ম্মজন্য দেহধারী সামান্য দেবতামাত্র মনে করে।

অষ্টম অধ্যায়

—ব্রহ্ম যোগ—

অর্জ্জুন—

'ব্রহ্ম' সে কি? 'অধ্যাত্ম' কি? 'কর্ম্ম' কি, মুরারে
'অধিভূত' কারে বলে?—'অধিদৈব' কারে? ১
'অধিযজ্ঞ' সে কে?—সে কেমনে বসে দেহে?
অন্তিমে যতীরা তোমা কেমনে জানে হে? ২

শ্রীভগবান—

অক্ষয় পরম ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম প্রকৃতি,
জীব জন্মে বাড়ে যাহে,—সেই কর্ম্ম স্মৃতি। ৩
অধিভূত মর দেহ, পুরুষ দৈবত,
আমিই ত অধিযজ্ঞ সেই দেহ-গত। ৪
অন্তিমে যে স্মরি' মোরে পরিহরে দেহ,
সে জন বৈকুণ্ঠে যায় নাহিক সন্দেহ। ৫
যে যা' স্মরি' পরিহরি যায় কলেবর,
সেই সে প্রকৃতি পায় মরণের পর। ৬
তাই পার্থ, মোরে স্মর, যুদ্ধ কর আর,
মন বুদ্ধি সঁপি' মোরে, লভ ব্রহ্ম সার। ৭
অভ্যাস-উপায়-যোগে একান্ত চিন্তিলে,
পরমার্থ দিব্য, পার্থ, যথার্থই মিলে। ৮
কবি পুরাতন, বিশ্বশাসনকারী,
অণু হ'তে অণুসূক্ষ্ম যে তনু ধরে,
অনন্ত ভূপ, অচিন্ত্যরূপধারী
সূর্য্যের সম অজ্ঞান-তম' হরে,—৯

মরণ সময়ে দৃঢ়মনা হ'য়ে তাঁয়,
ভক্তির সনে যোগবন্ধনে যারা
ভুরু-মাঝখানে সমাবেশি' প্রাণ-বায়
একান্ত স্মরে,—পেয়ে যায় ওঁরে তারা। ১০
বেদজ্ঞে কয়, যিনি অক্ষয় পদ ;
যাঁহাতে বিলীন আসক্তিহীন যতী –
যে ধন আশায় সাধে সমুদায় ব্রত,
তাঁরে তোমা এবে কহি সংক্ষেপে অতি। ১১
নব-দ্বার চিত্ত আর নিরুদ্ধ করিয়া,
যোগ-ধৈর্য্যে প্রাণ-বায়ু ভ্রূমধ্যে ধরিয়া, ১২
ঝঙ্কারি ওঙ্কার ধ্বনি, মনে স্মরি' মোরে,
যে ত্যজে দেহ, সে মহামোক্ষ লাভ করে। ১৩
অনন্যমানসে সদা স্মরে যে আমারে,
সে পায় আমায় নিত্য চিত্ত-সমাহারে। ১৪
মোরে পেয়ে সিদ্ধ হ'য়ে, শোকদুঃখালয়
অনিত্য জনম পুন' মহাত্মা না লয়। ১৫
আব্রহ্ম-ভুবন হ'তে ফিরে সর্ব্ব, শুন',
মোরে পেয়ে' হে কৌন্তেয়, নাহি জন্ম পুন'। ১৬
ব্রহ্মার, সহস্র যুগে একদিন হয়,
সহস্র যুগান্তে নিশি—জানিয়ো নিশ্চয়। ১৭
অব্যক্ত হইতে বিশ্ব ব্যক্ত দিবাগমে,
নিশায় মিশায় পুন' অব্যক্ত কারণে। ১৮
জীব যত এই মত হ'য়ে হ'য়ে মরে—
নিশি-যোগে মিশি' যায়, দিবসে বিহরে। ১৯
পরম অব্যক্ত এক নিত্যভাব রয়,—
সব নষ্ট হ'লেও সে কভু নষ্ট নয়। ২০

অব্যক্ত অক্ষর মোর গতি সে পরম,—
তা' হ'তে না নিবর্ত্তে, সে নিত্য ধাম মম। ২১
পুরুষ পরম সে যে ভক্তে দেয় ধরা',
ভবে ব্যাপ্ত তিনি, তাঁহে সর্ব্বভূত ভরা। ২২
কোন কালে ফিরে যোগী, ফিরে না কখন,
তাহাই অর্জ্জুন, শুন, কহিব এখন—২৩
অগ্নি, জ্যোতি, দিবা শুক্ল, উত্তর-আয়নে
মহাযাত্রা করি' যোগী পায় নিত্যধনে।২৪
ধূম্র, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণ-অয়নে—
চন্দ্রলোকে ভুঞ্জি' লোক নিবর্ত্তে ভুবনে। ২৫
শুক্ল, কৃষ্ণ গতি এটি ভবে চিরন্তন,
একে নাহি ফিরে, অন্যে পুন' আবর্ত্তন। ২৬
এত জানি' যোগি-জন মুগ্ধ হন কবে ?
সর্ব্ব কালে পার্থ তুমি যোগী হও তবে। ২৭
বেদ-ত্রয়ে, যজ্ঞ-চয়ে, তপস্যা বা দানে,
যে নির্ম্মল পুণ্যফল পণ্ডিতে বাখানে,—
অতিক্রম' সকলি যমী, তত্ত্ব জ্ঞানে যবে
চিরস্থায়ী চরম ঠাঁই পরম পদ লভে। ২৮

— — —

নবম অধ্যায়

—রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ—

শ্রীভগবান্ —

শুন হে অসূয়াশূন্য, কহিব এক্ষণে
সবিজ্ঞান গুহ্যজ্ঞান অশুভ-মোক্ষণে। ১
এ বিদ্যা রাজারো গুহ্য, আরো পূজ্য, শ্রেয়,
প্রত্যক্ষ-ফলদ, ধর্ম্ম্য, সুখে অনুষ্ঠেয়। ২
এ ধর্ম্মে, অর্জ্জুন, যারা শ্রদ্ধা নাহি করে,
আমারে না পেয়ে' তারা মৃত্যুপথে চরে। ৩
অব্যক্ত-মূরতি আমি সারা বিশ্বে রহি;
আমাতে সকলি, আমি কাহাতেও নহি;— ৪
তারাও নহেক'! দেখ যোগৈশ্বর্য্য মোর,
আমি ধরি, ভরি বিশ্ব, নিজে অনির্ভর। ৫
নভে যথা চরে সদা পবন মহান,
সর্ব্ব ভূত করে তথা ব্রহ্মে অবস্থান। ৬
কল্পান্তে নিখিল জীব বিলীন মায়ায়,
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃজি পুনরায়। ৭
মায়াস্তে অধিষ্ঠি' করি সৃষ্টি বারে বারে,
স্বভাবে অবশ জীব—সৃজি সে সবারে। ৮
না বাঁধে আমারে হেন কর্ম্ম, ধনঞ্জয়,—
উদাসীন আত্মা মম অনাসক্ত রয়। ৯
প্রকৃতি আমারি বশে প্রসবে সংসার,
আমা হ'তে বিশ্ব তাই দৃশ্য বারংবার। ১০

তুচ্ছ করে মূর্খ মোরে নর-দেহ-জ্ঞানে —
আমি সত্ত্ব-মহেশ্বর তত্ত্ব নাহি জানে। ১১
বৃথা আশা, বৃথা কর্ম্ম, বৃথা জ্ঞানে তাকে
রাক্ষসী মোহিনী মায়া মুগ্ধ করি' রাখে। ১২
কিন্তু মোরে মহাত্মারা দৈবী-মায়াধীন
ভূতাদি অব্যয় জ্ঞানে অর্চ্চে নিশিদিন। ১৩
সতত কীর্ত্তন-নমঃ-সংযম-সাধনা—
ভক্তি ভরে কত মোরে করে আরাধনা। ১৪
জ্ঞান-যজ্ঞে কেহ করে অর্চ্চনা আমারে,
অভেদে, বিভেদে, কেহ সহস্র আকারে। ১৫
আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, সুধা,
মন্ত্র আমি, ঘৃত আমি, হোমাগ্নি - বহুধা। ১৬
পিতা, মাতা, পিতামহ, ধাতা সবাকার,
আমি বেদ্য, বেদত্রয়, পবিত্র ওঙ্কার ; ১৭
রক্ষী আমি, সাক্ষী, স্বামী, সুহৃৎ, শরণ,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, নিধি, বীজ অ-মরণ ; ১৮
আমি সূর্য্য,—আকর্ষিয়া বর্ষি বারি পুন'
মৃত্যু ও অমৃত আমি, সদা সৎ গুণ। ১৯
ত্রিবেদাচারী সোমের বারি-সেবনে পূত হয়,
যজ্ঞ যজি' আমারে ভজি' স্বর্গ মাগি' লয়।
লভিয়া ওরা পুণ্যভরা অমরেন্দ্র লোক
ভুঞ্জে সুখে ত্রিদিব-বুকে দিব্য দেব-ভোগ। ২০
বিশাল হোক সে সুরলোক,—ভোগের ভরে সারা,
সুকৃত শেষে মর্ত্ত্যে এসে প্রবেশ করে তারা ;
বেদানুমত বিধান যত সাধিয়া সমুদায়
ভোগাভিলাষী ভিড়িছে আসি', ফিরিছে পুনরায়। ২১

অনন্যে ত্যজে' আমারে যে পূর্ণ প্রেমে রহি'
পূজে নিত্য, আমি তারি যোগক্ষেম বহি। ২২
শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভরে যারা ভজে অন্য দেবে,
বিধি ছাড়া, তবু তারা আমারেই সেবে। ২৩
আমিই যতেক যজ্ঞে ভোক্তা আর প্রভু—
স্বর্গ-ভ্রষ্ট হয় তারা না জানি' এ কভু। ২৪
দেবব্রতে পায় দেব, পিতৃ পিতৃব্রতে,—
ভূত ভক্তে ভূত, মোরে আমারি ভকতে। ২৫
পত্র পুষ্প ফল জল যা যিনি শ্রদ্ধায়
উপহার দেন মোরে, ভুঞ্জি সমুদায়। ২৬
যা' কর, যা' খাও, দাও, যা' কর হবন,
যা' তপ'—কৌন্তেয়, মোরে কর' সমর্পণ। ২৭
শুভাশুভ কর্ম্ম-ফলে তা হ'লে তরিবে,
বিমুক্তসন্ন্যাসী তুমি আমারে ধরিবে। ২৮
বিশ্ব ভোর শিষ্য মোর, নাই দ্বেষ্য প্রিয়,
মদ্ভক্ত আমাতে মজে, তাঁহাতে আমিও। ২৯
একান্ত যে মোরে ভজে পাপিষ্ঠ পামর—
সাধুই সে— নিষ্ঠা তার কেমন সুন্দর। ৩০
অচিরে ধার্ম্মিক হয়, চিরশান্তি লভে,
পার্থ, মোর ভক্ত কভু নষ্ট নাহি হবে। ৩১
কত না পামর, পার্থ, আমারে ধরিয়া,
স্ত্রী, বৈশ্য, অথবা শূদ্র, যেতেছে তরিয়া, ৩২
কি কথা ব্রাহ্মণ পুণ্য ভক্ত রাজর্ষির ?
অনিত্য এ মর্ত্ত্যে আসি' মোরে অর্চ্চ, ধীর। ৩৩
মোরে চিন্ত' ভজ' যজ' কর নমস্কার,—
এমনি বাঁধিয়া চিত্ত লভহ আমার। ৩৪

দশম অধ্যায়

—বিভূতি যোগ—

শ্রীভগবান্—

পুন পার্থ, শুন মম পরম বচন
অবহিতে,—তব হিতে কহিব এখন। ১
না জানে আমার জন্ম দেব ঋষিচয়ে—
আমি যে সবারি অগ্রে সমগ্র বিষয়ে। ২
অনাদি ঈশ্বর অজ আমারে যে বুঝে,
জগতে যতেক তার পাপ মোহ ঘুচে। ৩
জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষমা শুদ্ধি সত্য দম শম,
সুখ দুঃখ ভবভয় অভয় ও তমঃ, ৪
প্রেম সাম্য তুষ্টি তপ খ্যাতি নিন্দা দান—
জীবের যতেক ভাব আমারি বিধান। ৫
ঋষি সপ্ত, পূর্ব্বে চারি, চৌদ্দ মনু, শুন'
আমারি মনোজ; দিলা বিশ্বে জন্ম পুন'। ৬
এ বিভূতি যোগ মম যে জানে নিশ্চয়,
সে যে দিব্য জ্ঞান লভে, নাহিক সংশয়। ৭
আমা হ'তে সব জাত, ভবে প্রবৃত্ত যে,
এত মানি যত জ্ঞানী ভাবে মোরে ভজে। ৮
সঁপিয়া পরাণ হিয়া মোরে, পার্থ তাঁরা
কীর্ত্তন করিয়া নিত্য হন আত্মহারা। ৯
আমি সে সততযুক্ত প্রীত ভক্ত সবে
প্রদানি যে বুদ্ধি, তাহে মোরে তারা লভে। ১০

কৃপা করি' তাহাদের অজ্ঞানের কালি
হরি আমি অন্তর্য্যামী, জ্ঞান-দীপ জ্বালি'। ১১

অর্জ্জুন—

পরব্রহ্ম, আদ্যদেব, দিব্য বিভু নাম,
পুরুষ শাশ্বত অজ, তুমি পুণ্যধাম। ১২
কহেন ঋষিরা ; কন নারদ মুনি যে,
অসিত দেবল, ব্যাস ; বলিতেছে নিজে। ১৩
সত্য মানি, যা বাখানি' কহিলে কেশব,
না জানে তোমার তত্ত্ব দেবতা দানব। ১৪
আপনি আপনা জান', পুরুষ পাবন,
দেবেশ, ভূতেশ, বিভু, হে ভূত-ভাবন। ১৫
অশেষে কহ সে দিব্য ঐশ্বর্য্য তোমার,
যাহে তুমি আছ ব্যাপি' এ বিশ্ব ব্যাপার। ১৬
কেমনে জানিব যোগী তোমা চিন্তা করি' ?
কি কি ভাবে ভগবানে ভাবিব শ্রীহরি ? ১৭
বিস্তারি' তোমার যোগ-বিভূতির ভাষ
পুন কহ'—সুধা পিয়ে না মিটে পিয়াস। ১৮

শ্রীভগবান্—

আহা তবে কহি শুন বিভূতি আমার
প্রধানত' গোটা কত। অন্ত নাহি তার—১৯
আমি আত্মা, ধনঞ্জয়, জীবের অন্তরে,
আমি আদ্য, আমি মধ্য, আমিই অন্ত রে। ২০
আদিত্যে আমিই বিষ্ণু, রবি প্রতিভায়,
মরীচি মরুতে, চন্দ্র তারকা-সভায়। ২১
বেদে সাম, ইন্দ্র নাম দেবতা মাঝার,
ইন্দ্রিয় নিচয়ে মন, চৈতন্য সবার। ২২

রুদ্রেতে শঙ্কর, যক্ষরক্ষে ধনপতি,
বসু মধ্যে বহ্নি, মেরু শিখরি-সংহতি। ২৩
পুরোহিতে বৃহস্পতি পুরোধা প্রবর,
সেনানীতে কার্ত্তিকেয়, সরসে সাগর। ২৪
মহর্ষিতে ভৃগু আখ্যা, বাক্যে একাক্ষর,*
যজ্ঞে আমি জপযজ্ঞ, নগে অদ্রিবর। ২৫
তরুতে অশ্বত্থ, দেব-ঋষিতে নারদ,
সিদ্ধে আমি কপিল, গন্ধর্ব্বে চিত্ররথ। ২৬
অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা আমি অমৃতমথিত,
গজে ঐরাবত, নরে নৃপতি কথিত। ২৭
অস্ত্রে বাজ, কামধেনু ধেনুর মাঝারে,
জনকে কন্দর্প, সর্প বাসুকি আকারে। ২৮
নাগে আমি অনন্ত, বরুণ জলচরে,
পিতৃতে অর্য্যমা, যম সংযমি-নিকরে। ২৯
প্রহ্লাদ দৈত্যের কুলে, কাল সংগ্রাহকে,
পশুমাঝে মৃগরাজ, গরুড় বিহগে। ৩০
পবন সে বেগবানে, রাম শস্ত্রভৃতে,
মীনেতে মকর, গঙ্গা নদী-পদবীতে। ৩১
আদি অন্ত মধ্য আমি সকল সৃষ্টির,
বিদ্যায় অধ্যাত্মবিদ্যা বাদ বিবাদীর। ৩২
অক্ষরে অকার আমি, দ্বন্দ্ব সমাহারে,
আমিই অক্ষয় কাল, বিধাতা সংসারে। ৩৩
মহামৃত্যু বিশ্বে আমি, ভবিষ্যে সুষমা,
শ্রীতে কীর্ত্তি, গীঃ, ধৃতি, স্মৃতি, মেধা, ক্ষমা। ৩৪

*একাক্ষর—ওঁ, প্রণব।

সামেতে বৃহৎসাম, ছন্দে বেদমাতা,
মাসে মার্গশীর্ষ আমি, ঋতু পুষ্পগাঁথা। ৩৫
খলে ছল, তেজোবল তেজস্বীর প্রাণে,
বিজয় প্রযত্ন আমি, সত্ত্ব সত্ত্ববানে। ৩৬
বৃষ্ণিকুলে কৃষ্ণ আমি অর্জ্জুন পাণ্ডবে,
কবিতে উশনা কবি, ব্যাস মুনি সবে। ৩৭
দমনকারীর দণ্ড, নীতি জিগীষুতে,
মৌন আমি গুহ্য কাজে, জ্ঞান প্রজ্ঞাযুতে। ৩৮
সারা ভূতে আরো বীজ যত কিছু রয়,
চরাচরে কভু তারা আমা ছাড়া নয়। ৩৯
পরন্তপ, অনন্ত যে ঐশ্বর্য্য আমার,—
তোমারে সংক্ষেপে তাই কহিলাম সার। ৪০
যা কিছু বিভূতি-সত্ত্ব-শ্রী-মহত্ত্ব-যুত,
আমারি আংশিক তেজে সকলি উদ্ভুত। ৪১
অথবা অধিক জানি' কি কাজ তোমার?
একাংশেই ব্যাপি আমি নিখিল সংসার। ৪২

একাদশ অধ্যায়

—বিশ্বরূপ দর্শন—

অর্জ্জুন –

কৃপা করি' অয়ি হরি, আমারে যে কহ
পরম অধ্যাত্ম কথা, ঘুচিল এ মোহ। ১
জীবের জনম মৃত্যু, মাহাত্ম্য তোমার,
তব মুখে, কমলাক্ষ, শুনিনু অপার। ২
সত্যই করিলে হরি, যে রূপ কীর্ত্তন
বড় সাধ হেরি তাহা, পুরুষ রতন। ৩
ভাব' যদি যোগ্য আমি, তবে যোগেশ্বর,
দেখাও আমারে তব আত্মা অনশ্বর। ৪

শ্রীভগবান্

হেরো পার্থ, মূর্ত্তি মম সহস্র ধরণ,
কি বিচিত্র, কত দিব্য আকৃতি বরণ। ৫
হেরো রুদ্র, বসু, অশ্বী, আদিত্য, পবন
কত কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য-দর্শন। ৬
এক্-ই দেহে দেখিবে যা' বিশ্ব চরাচরে,
আরো যা দেখিতে সাধ দেখ' আঁখি ভরে। ৭
নারিবে লখিতে কিন্তু স্বকীয় নয়নে,
দিব্য আঁখি দিব তোমা বিভূতি দর্শনে। ৮

সঞ্জয়

এত বলি' তবে, রাজা, যোগেশ্বর হরি
অর্জ্জুনে দেখান ঐশী রূপের লহরী। ৯

কত বক্ত্র, কত নেত্র, চাহনি অদ্ভুত,
কত দিব্য আভরণ, উদ্যত আয়ুধ। ১০
দিব্য মাল্য, দিব্য বাস, দিব্য গন্ধ গায়,
ঝলকে অনন্ত মুখ জ্বলন্ত প্রভায়। ১১
গগনে সহস্র ভানু একত্র উদিলে,
যদি তাঁর প্রতিভার তুলা কভু মিলে। ১২
বহু খণ্ডে বিখণ্ডিত প্রকাণ্ড জগৎ
হরির শরীরে পার্থ হেরে যুগপৎ। ১৩
তখন বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্ট ধনঞ্জয়
হরিরে প্রণমি' শিরে কৃতাঞ্জলি কয়, — ১৪

"নিরখি শ্রীহরি —দেবতারা ভরি' আছে তব দেহখানি,
বিশ্ব মাঝার আছে যত আর অশেষ প্রকার প্রাণী।
আছে ভগবান্ ব্রহ্মা মহান্ বসিয়া পদ্মাসনে ;
ঋষির সঙ্ঘ ; আছে ভুজঙ্গ দিব্য সঙ্গোপনে। ১৫
"বাহু অগণন, উদর বদন নেত্র কত না জানি,
দেখি যে তোমার দিগন্ত পার অনন্ত রূপ খানি।
নাহিক অন্ত, কোথা হা হন্ত, আদ্য মধ্য তব —
না হয় গোচর, জগদীশ্বর, মূরতি বিশ্ব-ভব। ১৬
"কিরীট মস্তে, ধরিছ হস্তে গদা ও সুদর্শন,
প্রতিভা-পুঞ্জে দিশি কি ভুঞ্জে বহ্নির বরিষণ ?
নিরখিতে চাহি, কোন'মতে নাহি পারি তোমা নিরখিতে
সূর্য্যের পারা দীপ্তির ধারা ঠিকরিছ সারা ভিতে। ১৭
"তুমি অক্ষর, পরমেশ্বর, সবে চায় তব দেখা,
তুমি আমাদের সারা জগতের শুধু আশ্রয় একা।
তুমি অক্ষত, আছ শাশ্বত ধর্ম্ম সুরক্ষণে,
তুমি সনাতন পুরুষ-রতন, হেন লয় মোর মনে। ১৮

"আদি মাঝ শেষ, নাহি কিছু লেশ, অনন্ত বীর্য্য হে।
অসংখ্য কর, শশি-দিবাকর আঁখি শুধু চেয়ে' রহে।
দেখি পূত মুখ—সেথা হুতভুক্ দ্রুত ধক্‌ধকে, হরি,
আপনার তেজে তুমি জগতে যে তুলিছ তপ্ত করি'। ১৯
"ঊর্দ্ধে, ত্রিদিব, নিম্নে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ মাঝে,
সমস্ত ঢাকি রয়েছ একাকী, কোন দিক বাকি আছে ?
নিরখি' তোমার এ চমৎকার উগ্র মূরতি খানি
বিশ্ব ভুবন ব্যথিত কেমন হতেছে চক্রপাণি। ২০
"ঐ দেবগণ শঙ্কিত মন তোমারি শরণে ছুটে,
কেহ পুনরায় 'রক্ষ আমায়' কন অঞ্জলি পুটে।
মহর্ষি সহ সিদ্ধ-নিবহ 'স্বস্তি' বলিয়া সবে
স্তবন করিয়া গগন ভরিয়া ফেলিছে মহান্ রবে। ২১
"রুদ্র, সিদ্ধ বসু, আদিত্য, যতেক দেবতা আছে,
বিশ্বে মরুত, অশ্বিনীসুত, পিতারা যে যথা বাজে,
যক্ষ সর্ব্ব, কি গন্ধর্ব্ব, দৈত্য সাধ্য আর,
নিরখে তোমায় বিস্মিত প্রায় দৃশ্য চমৎকার। ২২
রূপ-মহত্ত্ব, বহুল বক্ত্র, কত না নেত্র তব,
ওহে মহাবাহু, উরু পদ বাহু, কত সে কেমনে কব ?
বহু বহুতর তোমার উদর, করাল দন্ত কত
করি' দরশন বিশ্ব ভুবন ব্যথিত আমারি মত। ২৩।
"গগনে লিপ্ত মুরতি দীপ্ত, রঞ্জিত বহু ধারা,
বিবৃত বদন, বিশাল লোচন—জ্বলিছে উগ্র তারা।
তোমারে নেহারি' চিত্ত আমারি ব্যথায় উঠিছে ভরি,
ধৈর্য্য না পাই, শান্তিও নাই—কোথায় দাঁড়াই হরি। ২৪
"দশন-করাল ভীষণ ভয়াল মুখমণ্ডল যত
করি বিলোকন জ্বলিছে কেমন কাল-অনলের মত।

কোথা কোন্ দিক কিছু নাহি ঠিক, পরাণ কেমন করে।
জগন্নিবাস দেবদেব আজ প্রসন্ন হ'ন মোরে। ২৫
"ঐ পাই টের ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সমুদায়,
ঐ যে অপর নৃপতি-নিকর—সকলেরি দেখা যায়।
ভীষ্ম ও দ্রোণ,— হে কৃষ্ণ শোন,—সূতের পুত্র আর,
মোদের প্রধান যোধের বিতান সে সঙ্গে আগুসার। ২৬
"আস্য-বিবরে আসি' সত্বরে প্রবেশ করিছে তারা,
তব অনন্ত করাল দন্ত হেরি' আতঙ্কে সারা।
কেহ আসি' লাগে দশনের ফাঁকে, বাহিরিতে নাহি পারে,
কাহারো সাঙ্গ উত্তমাঙ্গ—চূর্ণিত একেবারে। ২৭
"যেমতি নদীর অম্বু অধীর প্রবল প্রবাহ বুকে,
কুলু কলকল ছুটিছে কেবল সমুদ্র অভিমুখে,—
যেন তারি প্রায়, ঐ দেখা যায়, সারা পৃথিবীর বীর
পড়িতেছে ঢুকে' জ্বলন্ত মুখে, একান্ত অস্থির। ২৮
"যথা প্রদীপ্ত হুতাশে ক্ষিপ্ত পতঙ্গ শত শত
ছুটি আসি' পড়ে মৃত্যুর তরে, পাখা ওড়ে পতপত,
তাহারি মতন লভিতে মরণ পশিছে বিশ্বলোক
তোমারি বদন বিবরে, - কেমন বিষম পতন ঝোঁক। ২৯
"অনল শ্বসনা লেলিহা রসনা মেলিয়া সকল দিশে,
তোমার বদন বিশ্বের জন নিঃশেষে গরাসিছে।
নিখিল জগৎ তোমার মহৎ তেজে যে উঠিল ভরি',
উগ্র ঝলক সমগ্র লোক দগ্ধি' ছুটিল, হরি। ৩০
"ধরি' এ বিষম মূরতি ভীষণ কে তুমি, বাখানি' কও।
করি প্রণিপাত, মরি সুরনাথ, মোরে প্রসন্ন হও।
বড় সাধ যায় অদ্য তোমায় জানি হে আদ্য ভব,—
না জানি কারণ কেন যে এমন জাগে প্রবৃত্তি তব"। ৩১

শ্রীভগবান্—

বিশ্ব বিশাল গ্রাসি আমি কাল স্বয়ং ভয়ঙ্কর—
নিখিল-বিনাশ-সাধনে আয়াস করিনু অনন্তর।
তুমি নাহি মারো, তথাপি কাহারো নিস্তার নাহি আজি,
রয়েছে যদিও প্রতিপক্ষীয় যতেক যোদ্ধা সাজি'। ৩২

তুমি উঠি' তবে খ্যাতি লুটি লবে, সমরে সমুত্থত ;
অরাতি পুঞ্জ জিনিয়া ভুঞ্জ' রাজ্য সমুন্নত।
আমিই সবাকে বধিয়াছি আগে, কেহই রহে নি বাঁচি'—
নিমিত্তার্থ কেবল মাত্র হও হে সব্যসাচী। ৩৩

ভীষ্ম ও দ্রোণ, অথবা কর্ণ, জয়দ্রথই বল',
আরো যে অন্য প্রবীণ সৈন্য রণে একত্র হ'ল—
বধিনু সবারে। হত-সংহারে অত কি ব্যথিত হয় ?
ধরাও আহব, তবা পরাভব মানিবে বৈবীচয়। ৩৪

সঞ্জয়—

শ্রীমধুসূদন এই মত কন যখন বচনচয়,
অঞ্জলি পুটে,—কম্পিয়া উঠে' তখন ধনঞ্জয়
কৃষ্ণের পায় পড়িয়া লুটায কবিয়া নমস্কার—
গদ্‌গদ ভাষে শঙ্কায় ত্রাসে কহিলা পুনর্ব্বার ; ৩৫

অর্জ্জুন—

"জানি হৃষীকেশ, শুনি' এ অশেষ গুণকীর্ত্তন তব
কত না হরষে ভকতি বরষে যতেক বিশ্ব ভব।
রক্ষের কুল শঙ্কা-ব্যাকুল দিগন্তে ধাবমান,—
সিদ্ধ সমূহ করে আসি নমঃ, অনন্ত-লাভবান্। ৩৬

"কেনই বা তোমা না করিবে নমঃ ? তুমি যে মহাত্মন্
ব্রহ্মারো বড়। তুমিই না গড়' প্রথমে কমলাসন ?

নাহি তব শেষ কোথাও, দেবেশ, জগন্নিবাস তুমি,
তুমি অক্ষয়, সদসৎপর, সবার বিলাস ভূমি। ৩৭

"তুমিই আদ্য সুব আরাধ্য, পুরুষ সে পুরাতন,
তুমি প্রকাণ্ড এ ভব-ভাণ্ড ধরিছ অনুক্ষণ ;
তুমিই সর্ব্ব, জ্ঞাতা জ্ঞাতব্য, চরম পরম ধাম,
তোমা হ'তে যত বিশ্ব বিতত, – কোথা তব-পরিণাম। ৩৮

"পবন, বরুণ, যম নিদারুণ, শশাঙ্ক হুতবহ
তুমি প্রজাপতি, জগতের গতি, সবিতা, প্রপিতামহ।
নমো নমো নমঃ, তব পদে মম নম' সহস্রবার—
লহ পুনরায় দিতেছি তোমায় নিযুত নমস্কার। ৩৯

"নম' প্রমুখাৎ, নম' পশ্চাৎ পৃথুল পৃষ্ঠ তব ;
নমস্ তোমার সমস্ত ধার, হে হরি সর্ব্ব ধব।
ধরহ বিষম বলবিক্রম অশেষ অপরিমাণ ;
সর্ব্বত ঠাঁই ব্যাপি' আছ, তাই 'সর্ব্ব' তোমারি নাম। ৪০

"সখা মনে করি' কতই যে হরি, করিনু সম্বোধন—
কভু 'বান্ধব', কভু বা 'যাদব', কখনো 'কৃষ্ণধন'।
না জানি' তোমার মহিমা অপার কহিনু যতেক ভাষি',
সে মোর কেবল ভ্রমের যে ফল, অথবা যে ভালবাসি। ৪১

"পরিহাস ছলে তোমারে যা' বলে' করিনু তিরস্কার
ভ্রমণে, শয়নে, সমুপবেশনে, অথবা অশনে আর,
একেলাই রহ, কি সবার সহ, কিছুই মানি নি হরি,
সে অসঙ্গত আজিকার মত ক্ষম মোরে কৃপা করি'। ৪২

"প্রপিতা হয়েই রক্ষিছ এই ত্রিভুবন চরাচর,
তুমি যে পরম প্রপূজ্যতম গরীয়ান্ গুরুবর।
তব সম ঠিক, কিবা সমধিক নাহিক অপর কেহ---
ত্রিলোক মাঝার প্রভাব তোমার অতুল অপ্রমেয়। ৪৩

"তাই আজ হরি, দুটি পায় পড়ি। ধরায় অঙ্গ লুটি'
তুষি তব। ক্ষম' জগদীশ, মম যতেক ভঙ্গ ত্রুটি।
পিতায় যেমতি পুত্রের প্রতি, মিতায় মিত্র পরে,
স্বামী যথা ক্ষমা করে প্রিয়তমা, তেমনি ক্ষমহ মোরে। ৪৪

"আজি অপরূপ হেরি' তব রূপ বড় আমি হরষিত,—
ভয়ে ডরে তবু হয়ে' পড়ে প্রভু ব্যথিত যে মোর চিত্ত'।
আগের মূরতি মোরে সম্প্রতি দেখাও নয়ন ভরি'
প্রসন্ন হয়ে', দেবেন্দ্র ওহে জগন্নিবাস হরি। ৪৫

"কিরীট-শোভন, গদা-লাঞ্ছন, হস্তে সুদর্শন—
বাসনা আবার নিরখি তোমার মূরতি সে বিমোহন।
চির চারি ভুজে ফিরহ প্রভু যে, তারি মত আহা বেড়ে
ধর সম্প্রতি, বিশ্ব মূরতি, সহস্র বাহু ছেড়ে'।" ৪৬

শ্রীভগবান্—

আমি প্রসন্ন। তোমারি জন্য, অর্জ্জুন, আজ জেনো
দেখাইনু মম মূরতি পরম, মায়ার প্রভাবে হেন।
বিশ্ব স্বরূপ অনন্তরূপ, আদি সে, ভাতিছে তেজে—
তোমা ব্যতিরেকে আর কেহ একে দেখেনি পূর্ব্বেতে যে। ৪৭

কি বেদ পঠনে, কি যাগ যজনে, কি দান ধেয়ান করি
কি ক্রিয়া-কলাপে, কি কঠোর ভাবে তপস্যা সমাচরি',
এ মোর মূরতি দরশে শকতি ধরিবে, ধরণী মাঝে
তোমা ছাড়া আর, কুন্তীকুমার, হেন কোন্ বীর আছে? ৪৮

কিসের বেদন? চিত্ত এমন বিমোহিত বল কেন?
নিরখি' এ মোর মূরতি অঘোর, মূঢ়তা কি হ'ল হেন?
নাহি ভয় ডর, না হও কাতর, প্রীত অন্তর মানি'
নেহারো আবার—এই যে আমার মধুর মূরতি খানি। ৪৯

সঞ্জয়—

আশু পাণ্ডবে বাসুদেব তবে ভাবিয়া এ প্রকার,
সেই সে আপন মূরতি মোহন দেখান পুনর্ব্বার।
আশ্বাস দান করিলা মহান্ ভয়ে ভীত অর্জ্জুনে—
গত-সন্দেহ প্রশান্তদেহ হ'য়ে পুন নিজ গুণে। ৫০

অর্জ্জুন—

তব সৌম্য নরমূর্ত্তি হেরি' জনার্দ্দন,
সুখচিত্ত প্রকৃতিস্থ হইনু এখন। ৫১

শ্রীভগবান্—

যে মহা মূরতি মম নিলে তুমি হেরে'
দেবতার চির বাঞ্ছা নিরখিতে এরে। ৫২
বেদে তপে দানে যজ্ঞে করুক যতন—
এ রূপ না হেরে কেহ তোমার মতন। ৫৩
হে পার্থ, কেবল মাত্র ভক্তিতে আমারে
জানিতে দেখিতে তত্ত্বে প্রবেশিতে পারে। ৫৪
মম কর্ম্মকারী ভক্ত, ছাড়ি' রঙ্গ ভবে,
সর্ব্ব ভূতে নির্ব্বিরোধ, মোর সঙ্গ লভে। ৫৫

———

দ্বাদশ অধ্যায়

—ভক্তিযোগ—

অর্জ্জুন—

হেন নিত্য কোন' ভক্ত করে তব সেবা,
অপরে অব্যক্তে ভজে,—শ্রেষ্ঠ কব কেবা ? ১

শ্রীভগবান্—

আমাতে নিবিষ্টচিত্ত নিত্যনিষ্ঠ যারা
শ্রদ্ধা-সনে উপাসনে, যোগিশ্রেষ্ঠ তারা। ২
কিংবা যারা ভজে ব্রহ্ম অব্যক্ত, অক্ষর,
অচিন্ত্য, কূটস্থ, ধ্রুব, ব্যাপ্ত চরাচর—৩
তারাও ইন্দ্রিয়, ধর্ষি', সমদর্শী হয়ে',
আমারেই লভে—সর্ব্ব শুভে রত রয়ে'। ৪
বহু কায়-ক্লেশে পায় নির্ব্বিকারে তারা—
অব্যক্ত গতির লাগি' সর্ব্ব দেহী সারা। ৫
কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্ম করি আমাতে অর্পণ
ভক্তিযোগে মোরে যারা করে আরাধন, ৬
তাদেরি কাণ্ডারী আমি মৃত্যু ভবাব্ধিতে,
উদ্ধারি, গাণ্ডীবধারী, দেখিতে দেখিতে। ৭
আমাতেই শুদ্ধ তব মতিবুদ্ধি দেহ,—
অন্তে তবে ঊর্দ্ধে রবে নাহিক সন্দেহ। ৮
যদি চিত্ত আমা' পরে রাখিতে না স'বে—
অভ্যাসে লভিতে মোরে অভিলাষী হবে। ৯
অভ্যাসেও ব্যর্থ হ'লে সাধ কর্ম্ম মম—
মোর তরে কর্ম্ম করে' লভ সিদ্ধি শম। ১০

ইথেও অশক্ত যদি, আমারি সদনে—
সর্ব্ব কর্ম্মফলার্পণ করিবে যতনে ! ১১
অভ্যাসের সেরা 'জ্ঞান', ভক্তি বড় তার,
লভ্য ছাড়া' সর্ব্ব বাড়া,—শান্তির আধার। ১২
নির্ব্বিরোধ, সর্ব্বভূতে সদয়, সক্ষম'
নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, দুঃখ-সুখে সম, ১৩
সন্তুষ্ট, সতত যুক্ত, সংযত, সুদৃঢ়,
তদ্‌গত-চিত্ত যে ভক্ত— সেই মম প্রিয়। ১৪
কারেও না পীড়া দেয়, আপনি অপীড়',
হর্ষ ক্ষোভ ভয়ে মুক্ত—সেও ভক্ত প্রিয়। ১৫
নিরপেক্ষ, শুদ্ধ, দক্ষ, অদুঃখী, উদাসী,
ফলে লোভ ত্যাগী ভক্ত আমি ভালবাসি। ১৬
না হাসে, না ভাসে আঁখি, নির্দ্বন্দ্ব নিস্পৃহ,
পাপ পুণ্য সাফ শূন্য—সেই মম প্রিয়। ১৭
তুল্য যে শত্রু ও মিত্রে, মান অপমানে,
বিতৃষ্ণ', শীতোষ্ণ সুখ-দুখ নাহি মানে। ১৮
সম নিন্দা স্তবে, মৌনী, অল্পে তৃপ্ত চির,
অবসতি, ধ্রুবমতি—সেই ভক্ত প্রিয়। ১৯
এই ধর্ম্মামৃত যাঁরা করেন সেবন,
পার্থ, মম প্রিয়তম সেই ভক্তগণ। ২০

— — —

ত্রয়োদশ অধ্যায়

—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ—

অর্জ্জুন—

প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, হরি ?
জ্ঞান, জ্ঞেয় জানিতেও মনো-বাঞ্ছা করি। ১

শ্রীভগবান্—

এই দেহ, হে কৌন্তেয়, ক্ষেত্রনামধারী,
যে জানে ইহারে, কহে ক্ষেত্রজ্ঞ তাহারি। ২
ক্ষেত্রজ্ঞ মোরেই জেনো সারা ক্ষেত্রগামী—
ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ মানি আমি। ৩
সে ক্ষেত্র যেমন যাহা, যা' হ'তে তা' হয়,
ক্ষেত্রজ্ঞ যাহারে বলে,—শুন সমুদয়। ৪
ঋষিরা কত না ছন্দে, কত না প্রকারে,
ব্রহ্মসূত্র-যুক্ত পদে বর্ণিলা ইহারে। ৫
পঞ্চভূত, প্রকৃতি ও বুদ্ধি, অহঙ্কার,
দশেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ আর, ৬
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধৈর্য্য, তাড়া, সাড়া,
এতেক ক্ষেত্রের সার, কহিলাম সারা। ৭
অ-মান, অ-দম্ভহিংসা, ক্ষমা, সরলতা,
গুরু-সেবা, সুসংযম, শুচিতা, স্থিরতা, ৮
বিষয়-বাসনা-ত্যাগ, অহঙ্কার ছাড়া',
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ নাড়া', ৯
অসক্তি, অনমুরক্তি গৃহ-পুত্র-স্ত্রীতে,
নিত্যসমচিত্তভাব হিতে বা অহিতে, ১০

আমাতে কেবলি মাতে অচলা ভকতি,
বিজন-ভজন, জন-সমাজে অরতি, ১১
সদা আত্মজ্ঞান, তত্ত্বে জানা বিশ্বধারা—
ইহাকেই 'জ্ঞান' বলে, 'অজ্ঞান' এ ছাড়া। ১২
'জ্ঞেয়' কি কহিব ? সে যে অমিয় মহৎ—
অনাদি পরম ব্রহ্ম, না সৎ-অসৎ। ১৩
সর্ব্বত্র চরণ কর শিরঃ মুখ আঁখি
সর্ব্বত্র শ্রবণ তাঁর ; র'ন সর্ব্ব ঢাকি'। ১৪
প্রকাশে ইন্দ্রিয়-গুণ, নাহিক ইন্দ্রিয় ;
অভোক্তা, সবার ভর্ত্তা, নির্গুণ, গুণী ও। ১৫
চরাচর, সবাকার অন্তরে বাহিরে ;
সূক্ষ্ম একে লক্ষিবে কে ?—দূরে কাছে ফিরে। ১৬
জীবে নহে কভু ভিন্ন, তবু ভিন্ন ভায় ;
ভূত-ভর্ত্তা ; নিজে গ্রাসে, সৃজে পুনরায়। ১৭
জ্যোতিষ্কের জ্যোতি সে যে তমসের পার ;
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য—হৃদয়ে সবার। ১৮
ক্ষেত্র আর জ্ঞান, জ্ঞেয়, কহিনু সংক্ষেপে—
ভকতে সকলি জানি' মোরে মানি' নেবে। ১৯
প্রকৃতি পুরুষ—ভবে দোঁহেই অনাদি—
প্রকৃতি প্রসবে তবে দেহ ও গুণাদি। ২০
কার্য্য ও কারণ সবি প্রকৃতির যোগে,
পুরুষ কেবল শুধু সুখ দুঃখ ভোগে। ২১
পুরুষ-সঞ্জাত গুণ পুরুষ ভুঞ্জিবে—
গুণ-সঙ্গে পুন' জন্মে ভাল মন্দ জীবে। ২২
তিনি দ্রষ্টা, যোক্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর,
এ দেহে পরম আত্মা, পুরুষ-প্রবর। ২৩

যে জানে ত্রিগুণ সনে পুরুষ প্রকৃতি,
রহিয়া যে-কোন' পথে পায় সে নিষ্কৃতি। ২৪
ধ্যানে আত্মা হেবে কেহ দেহের মাঝার,
জ্ঞানে কেহ হেবে, কেহ কর্ম্মযোগে আব। ২৫
কেহ বা না জানি' আত্মা, শুনি, নিত্য নমে,—
সেও ভক্ত শ্রুতিপর ; মৃত্যু অতিক্রমে। ২৬
জগতে যতেক জীব– স্থাবর জঙ্গম,
হৈল কি নহিলে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সঙ্গম ? ২৭
যে বুঝিবে—সর্ব্ব জীবে জগদীশ সম,
বিশ্বনাশে অনশ্বর,– জ্ঞানী সে পবম। ২৮
যে জানে সমানে বিভু নিবসে জগতী,
অবিদ্যা নাশে না তায়, লভে দিব্য গতি। ২৯
যে হেরে, হ'তেছে কর্ম্ম প্রকৃতি পবশে,
আত্মা কভু কর্ত্তা নহে,—সেই ত দবশে। ৩০
ভিন্ন জীবে যে দেখিবে একি প্রকৃতিতে,—
তা'তেই পরম ব্রহ্ম পাবিবে দেখিতে। ৩১
অনাদি নির্গুণ এই আত্মা অবিনাশী—
দেহে বর্ত্তে, তবু পার্থ, অ-কর্ত্তা উদাসী। ৩২
যথা সূক্ষ্ম মহাকাশ কাহাতে না লাগে,
তেমনি নির্লিপ্ত আত্মা সারা ক্ষেত্রে জাগে। ৩৩
একমাত্র রবি যথা প্রকাশে ভুবন—
আত্মাও নিখিল দেহ বিকাশে তেমন। ৩৪
ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্রেরি ভেদ হেরি' জ্ঞান-চোখে,
প্রপঞ্চ-প্রকৃতি-মুক্ত যায় ব্রহ্মলোকে। ৩৫

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

—গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ—

শ্রীভগবান্—

পুন' কহি শুন' পার্থ, সর্ব্বতত্ত্ব-সার,
যাহা জানি' মুনিগণ হ'ন মৃত্যু পার। ১
এ জ্ঞান আশ্রয়ে মম সঙ্গ লাভ করে'
সৃষ্টিতে না জন্মে কেহ, প্রলয়ে না মরে। ২
মম জায়া মহাব্রহ্মে* গর্ভাধান করি,
তাই এ ব্রহ্মাণ্ড উঠে সর্ব্বভূতে ভরি। ৩
নিখিল যোনিতে, পার্থ, যত মূর্ত্তি জাত,
প্রকৃতি সবারি মাতা, আমি বর্ত্তি তাত। ৪
সত্ত্ব রজ' তমোগুণ প্রকৃতি-নন্দন,
অব্যয় দেহীরে দেহে করিছে বন্ধন। ৫
তাহে 'সত্ত্ব' অপ্রমত্ত ভাস্বর নির্ম্মল,
পরায় জ্ঞানের আর সুখের শৃঙ্খল। ৬
'রজ' জেনো রাগরঙ্গে তৃষ্ণা সঙ্গে ফিরে,
কর্ম্মডোরে নিত্য করে বন্ধন দেহীরে। ৭
'তম' বোঝ' অজ্ঞানজ, দেহীর মোহন—
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা তাহার বন্ধন। ৮
সত্ত্বই মজায় সুখে, রজ' কর্ম্মে বাঁধে,
তম' সে আবরি জ্ঞান ফেলায় প্রমাদে। ৯
তমো রজ' জিনি' পার্থ, জনমে সত্ত্ব যে,
রজ' সত্ত্ব-তমো জিনি', তম' সত্ত্ব-রজে। ১০

*ব্রহ্মা—প্রকৃতি।

এ দেহের নবদ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ
উপজে তখনি, যবে সত্ত্বের বিকাশ। ১১
লোভ, বাঞ্ছা' কর্ম্মারম্ভ, অশান্তি, ভাবনা,—
রজোগুণ বাড়িলে সবারি সম্ভাবনা। ১২
অজ্ঞান, প্রমাদ, মোহ, অপ্রবৃত্তি আর,
তমোর বৃদ্ধিতে পার্থ, জনম সবার। ১৩
যদি কেহ ত্যজে দেহ সত্ত্বের সময়,
সে পায় উত্তম লোক নিত্যালোকময়। ১৪
রজে মরি' কর্ম্মভোগে নরলোকে জনি,
তমোর প্রাবল্যে ম'লে পায় পশু-যোনি। ১৫
সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুখ সুনির্ম্মল,
রজে দুঃখ, তমোগুণে অজ্ঞান কেবল। ১৬
সত্ত্ব হ'তে জন্মে জ্ঞান, লোভ জন্মে রজে,
তমো হ'তে ভ্রান্তি, মোহ, অজ্ঞান উপজে। ১৭
সাত্ত্বিকের উর্দ্ধে গতি, মধ্যে রাজসের,
নরকে জঘন্যবৃত্তি যত তামসের। ১৮
'গুণ' বিনে কর্ত্তা নাহি জ্ঞানী অনুভবে—
তারো শ্রেষ্ঠ আত্মা জানি' মোর তত্ত্ব লভে। ১৯
দেহজ এ গুণত্রয় দেহী যে যাপিয়ে'
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ-মোক্ষ-সুধা পিয়ে। ২০

কে পারে কেমনে, হরি, ত্রিগুণে তরিতে ?
কিরূপ আচারে থাকি' পারে তা করিতে ? ২১

শ্রীভগবান্—

হে পার্থ, যাঁহার মোহ, প্রবৃত্তি, প্রকাশ,
হ'লেও বিদ্বেষ নাহি, গেলেও না আশ ; ২২

গুণে নন বিচলিত, যেন উদাসীন,
প্রবৃত্ত গুণের সনে আসক্তিবিহীন, ২৩
সম দুঃখ সুখে, লোষ্ট্র মণি ও কাঞ্চনে,
হিতাহিতে তুল্য যিনি নিন্দন বন্দনে, ২৪
তুল্য মান অপমানে, শত্রু মিত্রে যিনি,
সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগী গুণাতীত তিনি। ২৫
একমনে ভক্তি সনে সেবিলেও মোরে,
সর্ব্বগুণাতীত হ'য়ে ব্রহ্মলাভ করে। ২৬
আমিই ব্রহ্মের নিষ্ঠা অব্যয় অমর,
শাশ্বত ধর্ম্মের আর সুখের আকর। ২৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

—পুরুষোত্তম-যোগ—

শ্রীভগবান্

ঊর্দ্ধে মূল নিম্নে শাখা-বেদ-পত্র-ময়
সংসার-অশ্বত্থ জানি' বেদজ্ঞানী হয়। ১

উপরে নীচে বিস্তারিছে গাছের শাখাচয়,
'ত্রিগুণে' বাড়ে অহর্নিশ 'বিষয়' কিশলয়;
ঊর্দ্ধ হ'তে নিম্ন পথে যতেক ঝরা নামে—
কর্ম্মফল কেবল তারা ধরায় ধরাধামে। ২

তরুর কিবা স্বরূপ ভবে দেহই হেরে নাই,
কোথায় সুরু, কোথায় সারা, কোথায় তারি ঠাঁই।
ওতপ্রোত শিকড় যত আঁকড়ি আছে মাটি—
কঠোরতম নির্ম্মমতা-কুঠারে তারে কাটি', ৩

এতেক বলি' সে ধন তবে খুঁজিতে হবে মূলে-
"যাহারে পেয়ে' আর না ভবে ফিরিতে হবে ভুলে,
পুরুষমণি সে, তাঁর খনি হেথায় লভিলাম;—
যাঁ হ'তে ভব-বাসনা সবি বহিছে অবিরাম।" ৪

মোহ কি মান নাহিক যার, আসঙ্গ যে জিনে,
নিত্য যার আত্মবোধ, রঙ্গ রাগ বিনে,
দুঃখ সুখ দুয়ে যে বহি' মুক্ত অবিরত
অমূঢ় ভবে,—সে জন লভে পরম হরিপদ। ৫

তাঁরে না প্রকাশে সূর্য্য চন্দ্র হুতাশনে;
সে পরম ধাম লভি' না ফিরি ভুবনে। ৬
এ বিশ্বে আমারি অংশ জীব সনাতন,
প্রকৃতি-প্রপঞ্চ মন করে আকর্ষণ। ৭

জনমে মরণে সে যে সব সঙ্গে ল'য়ে
চলি' যায়, যথা বায় ফুলগন্ধ বয়ে'। ৮
শ্রবণে নয়নে স্পর্শে আঘ্রাণে রসনে
মনে বসি', ক্ষণে জীব বিষয় সেবনে। ৯
যায় জীব, বিষয় বা ভুঞ্জে দেহে থাকি',
মূঢ়ে নাহি দেখে,—দেখে যাঁর জ্ঞান আঁখি। ১০
সযতনে দেখে যোগী দেহে জীব রহে,
যত্নেও হেরিতে তারে মূঢ়ে শক্ত নহে। ১১
সূর্য্যের যে তেজে ভা'য় অখিল সংসার,
শশী বহ্নি উঠে জ্বলি'—সকলি আমার। ১২
রজোগুণে জীবগণে ধরি ভূমে পশি,
ওষধি-পোষণে আমি রণময় শশী। ১৩
আমিই অনলরূপে প্রাণীর শরীরে,
প্রাণাপান সনে ভক্ষ্য সুপক্ক করিরে। ১৪

সবারি আমি হৃদয় মাঝে পশিয়া রহি ফুটি,
আমারি হ'তে স্মৃতি ও জ্ঞান উপজে, যায় টুটি ;
সকল বেদে আমারি কথা প্রচারি চারিভিত,
বেদান্ত সে আমারি কৃত, আমিই বেদবিৎ। ১৫

উভয় পুরুষ ভবে—ক্ষর ও অক্ষর,
তাহে ক্ষর সর্ব্বভূত, অব্যক্ত অপর। ১৬
আরেক পুরুষ আছে পরমাত্মা নাম—
ঈশ্বর সে নিত্য পশি' পালে বিশ্বধাম। ১৭
ক্ষর ও অক্ষর হ'তে আমি শ্রেষ্ঠ ব'লে
আমারে 'পুরুষোত্তম' বিশ্বে বেদে বলে। ১৮
আমিই পুরুষোত্তম জানে অমূঢ় যে,
যে জন সর্ব্বজ্ঞ, মোরে সর্ব্বভাবে ভজে। ১৯
এই গুহ্যতম তত্ত্ব কহিনু বাখানি—
ইথে লোকে হয় পার্থ, চরিতার্থ, জ্ঞানী। ২০

——

ষোড়শ অধ্যায়

—দৈবাসুর-সম্পদ্‌বিভাগ-যোগ—

শ্রীভগবান্‌—

অভয়, চিত্তের শুদ্ধি, নিষ্ঠা জ্ঞানযুতা,
দান, দম, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায়, ঋজুতা, ১
অচাপল্য, অলোভ, অহিংসা, অ-পৈশুন*
হ্রী, মৃদুতা, সত্য, শান্তি, ত্যাগ, দয়াগুণ, ২
তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অমান—
এ দৈবী সম্পদ-সাধে সাধুই জন্মান। ৩
দম্ভ, দর্প, কাঠিন্য, অজ্ঞান, মান, ক্রোধে
আবৃত সে জন্ম যার আসুরী সম্পদে। ৪
দৈবগুণে মুক্তি, আর আসুরে বন্ধন,—
কি দুঃখ ?—জন্মেছ, পার্থ, লভি' দৈব ধন। ৫
দ্বিধা ভূতসৃষ্টি ভবে—দৈব ও আসুর,
'দৈব' আগে কৈনু, এবে কৈব গো 'আসুর' ৬
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-তত্ত্ব আসুরে না জানে,
আচার, শুচিতা, সত্য, কিছুই না মানে, ৭
বলে—"বিশ্ব অনীশ্বর অসত্য অসার,
রিপুবশে স্ত্রীপুরুষে সৃষ্ট সে,—কি আর ?" ৮
এই দৃষ্টি ল'য়ে, দুষ্ট নিকৃষ্ট-আত্মারা,
অশুভ কর্ম্মের ঘোরে বিশ্ব করে সারা ; ৯

*অপৈশুন—পরনিন্দা বর্জ্জন।

ধরিয়া দুষ্পূর কাম, দম্ভ, মান, মদ—
লোভে মোহে ক্ষুদ্র দেবে সেবে পাপব্রত। ১০

আমৃত্যু অপরিমেয় চিন্তার আশ্রিত ;
কামেই চরম সুখ জেনেছে নিশ্চিত। ১১

শত আশা-পাশে বাঁধা, কামক্রোধাধীন,
জন বঞ্চি' ধন সঞ্চি' ফিরে নিশিদিন। ১২

"এ আশা সফল আজি, ও আশা ফলিবে,
এই ধন আছে মোর, এ ধন মিলিবে। ১৩

এই বৈরী বধিয়াছি, বধিব অপর ;
আমি বলী, সুখী, ভোগী, সিদ্ধ ও ঈশ্বর। ১৪

ধনাঢ্য কুলীন আমি ; কে মম সমান ;
যজিব, মজিব, দিব ;"—উপজে অজ্ঞান। ১৫

কত না মনের ভুলে মোহজালে পড়ি'
জঘন্য নরকে শেষে যায় গড়াগড়ি। ১৬

আপনি পূজিত, দৃপ্ত ধনে মদে মানে,
নামে মাত্র সারে যজ্ঞ দম্ভে অবিধানে। ১৭

বল দর্প কাম আর ক্রোধ অহঙ্কারে
আত্ম-পর দেহে তারা বিদ্বেষে আমারে। ১৮

সেই দ্বেষ্টা ক্রূরমতি নরাধম সবে,
আসুরী যোনিতে আমি নিক্ষেপি' এ ভবে। ১৯

জন্মে জন্মে মূঢ়েরা আসুর যোনি পায়,
আমারে না পেয়ে ক্রমে অধঃপাতে যায়। ২০

নরকের তিন দ্বার আত্মার নাশন—
'কাম' 'ক্রোধ' 'লোভ' তবে করিবে বর্জ্জন। ২১

তমো'র এ তিন দ্বারে যাঁহার মুকতি,
স্বকল্যাণ সাধি' তিনি পান দিব্য গতি। ২২

যে মানব শাস্ত্র ছাড়ি' কামচারী হবে,
সুখসিদ্ধি দিব্যগতি কদাপি না লভে। ২৩

কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ—
জানিয়া শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান। ২৪

সপ্তদশ অধ্যায়

—শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগ—

অর্জ্জুন—

শাস্ত্রবিধি ত্যজি' যারা যজে শ্রদ্ধা সম,
কৃষ্ণ, সে নিষ্ঠা কি সত্ত্ব? না রজ'? না তম'? ১

শ্রীভগবান্—

জীবের ত্রিবিধ শ্রদ্ধা স্বভাবত হয়—
সাত্ত্বিকী, রাক্ষসী, আর তামসী নিশ্চয়। ২
স্বভাব সদৃশী শ্রদ্ধা। জীব শ্রদ্ধাময়;
যে যেমন শ্রদ্ধা করে, তারে তাহা কয়। ৩
সাত্ত্বিকে দেবতা ভজে, রক্ষ' রাজসিকে,
ভূত প্রেতে ভজে মেতে যত তামসিকে। ৪
অশাস্ত্র-বিহিত ঘোর তপ যারা করে,
দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ, বল-ভরে,—৫
দেহস্থ সমস্ত ভূত ক্লেশগ্রস্ত হয়,
অন্তরে আমিও,—তারা আসুর নিশ্চয়। ৬

ত্রিবিধ আহার আছে প্রিয় সবাকার;
যজ্ঞ, তপ, দান ত্রিধা;—শুন ভেদ তার। ৭
আয়ু, সত্ত্ব, বল, স্বাস্থ্য, সুখ, প্রীতি বাড়ে,
রস্য, স্নিগ্ধ, স্থায়ী, হৃদ্য সাত্ত্বিক আহারে। ৮
কটু, অম্ল, লোণা, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দাহী,
রুক্ষই রাজস ভক্ষ্য শোক-দুঃখ-দায়ী। ৯
চির পক্ব, নীরস, ও পূতি পর্য্যুষিত,
উচ্ছিষ্ট অশুদ্ধ খাদ্য তামস বাঞ্ছিত। ১০

সবিধি, কর্ত্তব্য জ্ঞানে, ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়ি',
আচরে যে যজ্ঞ, নাম "সাত্ত্বিক" তাহারি। ১১
ফলের সন্ধানে কিম্বা দম্ভের প্রকাশে
যে যজ্ঞ, জানিবে পার্থ, "রাজস" নামা সে। ১২
অন্নহীন, অদক্ষিণ, বিধান ব্যতীত,
শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ যাহা, "তামস" কথিত। ১৩
দেব-দ্বিজ-গুরু-পূজা, শুচিতা, আর্জ্জব,
ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসাই "শারীরিক" তপ ; ১৪
সত্য প্রিয়, হিত-বাক্য, বেদ অধ্যয়ন,
এতেক "বাঙ্ময়" তপ বলে বিজ্ঞ জন। ১৫
প্রসাদ, সাধুতা, মৌন, আত্মবিনিগ্রহ,
সুচিন্তাই "চিত্ততপ",– পার্থ, চিনি' লহ। ১৬
আবার, এ তপ যদি শ্রদ্ধার সহিত,
ফলাকাঙ্ক্ষা বিনে সাধে, তাহাই 'সাত্ত্বিক'। ১৭
সেবা মান্য পূজা তরে আচরে কেবল,
যে তপ 'রাজস' তাহা—ক্ষণিক, চঞ্চল। ১৮
দুরূহ আগ্রহে, পীড়া প্রদানি আপনে,
অরি-বধে চরি তপ,—'তামস' তা ভণে। ১৯
দাতব্যে যে দান, বিনা প্রতি-উপকারে,
স্থানে কালে পাত্রে, বলে 'সাত্ত্বিক' তাহারে। ২০
যে দান প্রত্যুপকার স্বর্গাদি উদ্দেশে—
'রাজসিক' নাম তার—আচরিত ক্লেশে। ২১
অস্থানে অপাত্রে দান, কাল জ্ঞান নাই,
সেবাশূন্য হেলাপূর্ণ—'তামসিক' তাই। ২২
ওম্ তৎ সৎ নাম ব্রহ্মের যা' জাগে,
বেদ যজ্ঞ ব্রাহ্মণে তা বিহিতই আগে। ২৩

দেখ না ওঙ্কারধ্বনি বিধিমতে দিয়া,
বেদজ্ঞ সাধিছে যজ্ঞ দান তপ ক্রিয়া। ২৪
"তৎ" শব্দ কহি,' ত্যজি' ফলের সন্ধান,
মোক্ষকামী সাধে যত যজ্ঞ তপ দান। ২৫
সত্তায় ও সাধুতায় "সৎ" শব্দ দিবে।
"সৎ" শব্দ মাঙ্গলিক কর্ম্মেও শব্দিবে। ২৬
"সৎ" শব্দ যোগ্য যথা যজ্ঞে তপে দানে—
সর্ব্ব কর্ম্ম শুদ্ধ তথা সর্ব্বতোবিধানে। ২৭
হেলায় যা' হোম দান তপস্যা আচরে—
অসৎ সকলি, পার্থ, ব্যর্থ ইহ পরে। ২৮

———

অষ্টাদশ অধ্যায়

—মোক্ষযোগ --

অর্জ্জুন—

"সন্ন্যাস" জানিতে এবে বাঞ্ছা, হৃষীকেশ
"ত্যাগের" তত্ত্বও মোরে কহ সবিশেষ। ১

শ্রীভগবান্—

কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ "সন্ন্যাস" লক্ষণ,
কর্ম্মফল-ত্যাগে কহে "ত্যাগ" বিচক্ষণ। ২
কেহ বলে, "দোষ-হেন কার্য্য ছাড়ি' দেহ",
"যজ্ঞ তপ দান নহে ত্যাজ্য" কহে কেহ। ৩
কিরূপ সে "ত্যাগ" পার্থ, করহ শ্রবণ—
ত্রিবিধ ত্যাগের কথা করিব কীর্ত্তন। ৪

যজ্ঞ দান তপ কার্য্য, কভু ত্যাজ্য নয়—
যজ্ঞ দান তপে জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়। ৫
ফলের কামনা কিন্তু ছাড়ি', এ সকলি
যদি নিত্য সাধ' পার্থ, তবে ভাল বলি। ৬
নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ সুসঙ্গত নহে,—
মোহের সে ত্যাগ লোকে তামসিক কহে। ৭
কাজে দুঃখ প্রায় দেখি', কায়-দণ্ড-ভয়ে
যে ত্যাগ, রাজস তাহা, যায় পণ্ড হয়ে'। ৮
কেবল ফলের ত্যাগ কর্ত্তব্য পালনে—
সেই ত সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে সর্ব্বজনে। ৯
অকুশলে নাহি দ্বেষ, কুশলে বিদায়,
সাত্ত্বিক ত্যাগীর মেধা না টলে দ্বিধায়। ১০

দেহীরা সকল কর্ম্ম ছাড়িতে না পারে ;—
যে ত্যজে কর্ম্মের ফল ত্যাগী বলি তারে। ১১
ভাল, মন্দ, মিশ্র ফল ত্রিধা বিদ্যমান,
অত্যাগী পরত্রে পায়, সন্ন্যাসী না পান। ১২
পঞ্চ এ শুন হে পার্থ, সিদ্ধির কারণ—
সর্ব্ব কাজে, বেদান্তে যা আছে নিরূপণ। ১৩
দেহ, দৈব, অহঙ্কার, বিবিধ ইন্দ্রিয়,
চেষ্টা নানা,—সিদ্ধি হেতু পঞ্চধা জানিয়ো। ১৪
কায়মনোবাক্যে লোক যা কিছু নির্ব্বাহে
ন্যায় বা অন্যায় হো'ক—পঞ্চ হেতু তাহে। ১৫
তাই যেবা দেখে শুধু কর্ত্তৃত্ব আত্মার,
মূর্খ সে নিকৃষ্টমতি, দৃষ্টি নাহি তার। ১৬
"আমি কর্ত্তা" ভাবে না যে, কর্ম্মে লিপ্ত নয়,
বধি' সে বধে না লোক, না বধ্য সে হয়। ১৭
জ্ঞাতা, জ্ঞেয় জ্ঞান,—ত্রিধা কর্ম্মের বোধন,
কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ সে কর্ম্মের সাধন। ১৮
জ্ঞান কর্ম্ম কর্ত্তাও ত্রিগুণ ভেদে পুন,
সাংখ্যমতে কহে ত্রিধা - তাও পার্থ, শুন,— ১৯
যে জ্ঞানে সর্ব্বত্র এক অব্যয়েরে পাই,
বিভিন্নে অভিন্ন ভাব, "সাত্ত্বিক" তাহাই। ২০
সর্ব্ব ভূতে ভিন্ন ভাব সঞ্জাত যে জ্ঞানে,
জানিয়ো সে জ্ঞান পার্থ, "রাজস" বাখানে। ২১
এক মাত্র প্রতিমাতে অতি মাতে বৃথা,
অসত্য অত্যল্প জ্ঞান, তুচ্ছ "তামস"-ই তা। ২২
নাহি যাহে সঙ্গ-লেশ, রাগ-দ্বেষ নাই,
ফল-ত্যাগ যেই কর্ম্মে "সাত্ত্বিক" তাহাই। ২৩

ফললোভে, বহুক্লেশে, মহা অহঙ্কারে,
কর্ম্ম হ'লে, শাস্ত্রে বলে "রাজস" তাহারে। ২৪
ভাবী ফল, আত্মবল, ব্যয় না ভাবিয়া
হিংসাভরে মোহে করে "তামসিক" ক্রিয়া। ২৫
সধৈর্য্য, উদ্যোগী, নাহি সঙ্গ অহঙ্কার,
"সাত্ত্বিক" কর্ত্তাই সিদ্ধাসিদ্ধে নির্ব্বিকার। ২৬
ফলে লাগি, অনুরাগী, অশুচি লোলুপ,
সুখী-দুঃখী, হিংস্র কর্ত্তা "রাজস" স্বরূপ। ২৭
অযুক্ত, প্রাকৃত, ধূর্ত্ত, নিস্তব্ধ, অলস,
বিষাদিত, দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই "তামস"। ২৮
বুদ্ধি ধৃতি গুণভেদে ত্রিবিধ যা হয়,
সবি কহি সবিশেষ শুন ধনঞ্জয়।— ২৯
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্যাকার্য্য, ভয়াভয়,
বন্ধ-মুক্তি যে বুদ্ধিতে—"সাত্ত্বিকী" তা কয়। ৩০
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্য কি কহে কাহারে,
যে বুদ্ধি বোঝে না, বলে "রাজসী" তাহারে। ৩১
অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভাণে, অজ্ঞানে আবৃতা,
"তামসী" নামনী বুদ্ধি বিশ্ব-বিপরীতা। ৩২
যে ধৃতিতে ধরে হৃদে প্রাণাদি কেবলি,
ত্যজিয়া বিষয় বাহ্য—"সাত্ত্বিকী" সে বলি। ৩৩
যাহাতে ধর্ম্মার্থকাম ধরে, পার্থ! কষি,'
অনুরাগে ফল মাগে, ধৃতি সে "রাজসী"। ৩৪
স্বপ্ন, ভয়, শোক, মদ, বিষাদ, যাহাই
না ছাড়ে দুর্মেধা ধৃতি, "তামসী" তাহাই। ৩৫
ত্রিবিধ সুখের কথা শুনহ এখন,—
অভ্যাসে আসক্তি যেথা, দুঃখের দমন, ৩৬

প্রথমে যা বিষবৎ শেষে যা অমৃত,
সে সুখ "সাত্ত্বিক" সুখ, প্রসাদ-জনিত। ৩৭
বিষয়-বাসনা সুখ সুধা-সম আগে,
"রাজস" সে সুখ শেষে বিষোপম লাগে। ৩৮
মোহে মিছে আগে পিছে যাহে আত্মা বশ,
ঘুমে ভ্রমে জাড্যে জাত সুখ সে "তামস"। ৩৯
না আছে ধরায়, কিবা স্বর্গে দেবমাঝে,
হেন প্রাণী, প্রাকৃত এ ত্রিগুণ ছাড়া যে। ৪০
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবাকার
স্বভাবগুণেই কর্ম্ম বিভিন্ন প্রকার। ৪১
শম, দম, তপ, শৌচ ক্ষমা, সরলতা,
জ্ঞানার্জ্জন, আস্তিকতা "ব্রাহ্মণে" সর্ব্বথা। ৪২
শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, দাক্ষ্য, অটলতা রণে,
মন ও প্রভুত্ব কর্ম্ম স্বতঃ "ক্ষত্র" গণে। ৪৩
গোরক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি, "বৈশ্য" কর্ম্মত্রয়—
"শূদ্রে"র প্রকৃত কার্য্য পরিচর্য্যাময়। ৪৪
নিজ নিজ গুণোচিত কর্ম্মের সাধনে
যথা সবে মুক্তি লভে শুনহ এক্ষণে ;—৪৫
জীবের প্রবৃত্তিদাতা ব্যাপ্ত চরাচরে,
স্ব ধর্ম্মে সেবিয়া তাঁয় সিদ্ধি পায় নরে। ৪৬
স্বধর্ম্ম মন্দও ভাল, পরধর্ম্ম হ'তে,
স্বাভাবিক কর্ম্মে পাপ নাহিক জগতে। ৪৭
মন্দ বলি' স্বীয় কর্ম্ম হেয় নহে। হায়,
সর্ব্ব কর্ম্ম দোষে ঢাকা, ধূমে অগ্নি প্রায়। ৪৮
অসক্ত যে আত্মজয়ী, স্পৃহা নাহি বাসে,
'নৈষ্কর্ম্ম্য' পরমা সিদ্ধি পায় সে সন্ন্যাসে। ৪৯

সিদ্ধিলাভে যেই ভাবে ব্রহ্ম লভে তেঁহ,
সংক্ষেপে সে জ্ঞাননিষ্ঠা কহিব, কৌন্তেয়। ৫০
শুদ্ধবুদ্ধি, ধৈর্য্যশীল,—চিত্তকে নিবারি',
শব্দাদি বিষয় ভোগ, রাগদ্বেষ ছাড়ি', ৫১
একাকী, সংযতবাক্, অল্পাহারী হ'য়ে,
ধ্যানযোগে অনুষ্ঠানে, বৈরাগ্য আশ্রয়ে, ৫২
বল, গর্ব্ব, কাম, ক্রোধ, দর্প, পরিগ্রহ
ত্যজি, যে নির্ম্মম, শান্ত,—মিশে, ব্রহ্ম সহ। ৫৩
ব্রহ্মাপন্ন সুপ্রসন্ন ; মুক্ত শোকে লোভে,
সর্ব্বভূতে সমভাব, মম ভক্তি লভে। ৫৪
ভক্তিযোগে মোর তত্ত্ব জানি' সমুদয়,
পরিণামে হরিধামে পশিবে, নিশ্চয়। ৫৫
আমারি আশ্রয়ে লোকে করি কর্ম্ম যত,
আমারি কৃপায় পায় চির ব্রহ্মপদ। ৫৬
মনে মনে সারা কর্ম্ম সঁপিয়া, মৎপর,
বুদ্ধিযোগে হও পার্থ স্বকর্ম্মে তৎপর। ৫৭
তা হ'লে সকল দুঃখে পাবে পরিত্রাণ,
অহঙ্কারে নাহি শুন, হারাবে পরাণ। ৫৮
অহঙ্কারে, "যুঝিব না" বুঝি' থাক যদি,—
বৃথা চেষ্টা। প্রকৃতিই দিবে তব মতি। ৫৯
স্বীয় কর্ম্মে বাঁধা তুমি রয়েছ স্বভাবে,
মোহে না আপনি করো, প্রকৃতি করাবে। ৬০
সর্ব্বজীবহৃদে হরি করি' অধিষ্ঠান,
মায়া-মন্ত্রে কায়া-যন্ত্রে তুলিয়া ঘুরান। ৬১
তাঁহারি শরণ লহ, হে পার্থ, সর্ব্বথা—
কৃপা করি, লবে হরি নিত্যধাম যথা। ৬২

বড় গুহ্য তত্ত্ব আজি কহিনু তোমারে,
করো যাহা অভিরুচি, উচিত বিচারে। ৬৩
সর্ব্বগূঢ়তম জ্ঞান, কল্যাণ পরম,
আমি পুন কহি শুন, পার্থ প্রিয়তম। ৬৪
মোরে চিন্ত', ভজ', যজ', করো নমস্কার—
সত্য মোরে পাবে, প্রিয়। ধর অঙ্গীকার। ৬৫
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি' লহ আমারি শরণ—
সর্ব্ব পাপে মুক্তি পাবে। কর' না শোচন। ৬৬
এ তত্ত্ব অভক্তিনিষ্ঠে কভু নাহি দিবে,
কিংবা সেবাহীনে, যেবা আমারে নিন্দিবে। ৬৭
যে জন এ গূঢ় তত্ত্ব ভক্ত মাঝে কয়।
ভক্তি ভরে,—সেই মোরে লভিবে নিশ্চয়। ৬৮
তারে ছাড়ি' প্রিয়কারী নাহি মম ভবে—
কেবা মম প্রিয়তম তারি সম হবে? ৬৯
মোদের এ ধর্ম্মকথা সত্য অধ্যয়নে
জ্ঞানযজ্ঞে লভে নর যজ্ঞেশ্বর ধনে। ৭০
শ্রদ্ধাতে যে, ঈর্ষা ত্যেজে' করিবে শ্রবণ,
মুক্তকেশে পশিবে সে বৈকুণ্ঠ-ভবন। ৭১
একচিত্তে শুনিলে ত তত্ত্বকথা যত,—
তমো মোহ তব, পার্থ, সব কাটিল ত? ৭২

অর্জ্জুন—

মোহ টুটে, জ্ঞান ফুটে তব অনুগ্রহে,
দ্বিধা গেল, স্বস্তি এল। পালিব বাক্য এ। ৭৩

সঞ্জয়—

মহাত্মা পার্থে ও কৃষ্ণে এ লোমহর্ষণ
অদ্ভুত সংবাদ আমি শুনিনু রাজন্। ৭৪

ব্যাসের কৃপায় নৃপ, এ তত্ত্ব শুনি যে,
কহিলা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যোগেশ্বর নিজে। ৭৫
অদ্ভুত এ পুণ্য-কথা অর্জ্জুন হরির,—
স্মরি আর ভরি উঠে রোমাঞ্চে শরীর। ৭৬
আহা কি হরির রূপ হেরিনু রাজন্—
স্মরি আর ভরি উঠে হরিষেতে মন। ৭৭
যেথায় যোগেশ কৃষ্ণ, ধন্বী ধনঞ্জয়,
সে পক্ষে, বিজয়লক্ষ্মী, বুঝিনু নিশ্চয়। ৭৮

পন্দনামা

প্রথম প্রকাশ ১৯২৫। নাম পৃষ্ঠায় এইরূপ লেখা ছিল

পন্দনামা বা গীতিপত্র
শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী সম্পাদিত
প্রকাশক
শ্রীপবিমল গোস্বামী এম-এ
১১৮/১ বাবু ডাঙা রোড সালকিয়া
১৩৩২

মূল গ্রন্থের মলাটের ডিজাইন অনুবাদকের। কেন্দ্রে শেখ সাদির একখানি ছবি ও ভিতরের প্রথম পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। বই ছাপা হয়েছিল মোহাম্মদী প্রেসে। প্রতি পৃষ্ঠার বাঁ ধারে মূল ফারসী ছাপা ছিল। ১৯২৪ সনের কোনো দিন এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করি, সেদিন আমার প্রবেশকালে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের প্রস্থান ঘটল মনে আছে। তিনি কবিকে তাঁর কোনো বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিয়ে, যাবার সময় বলছিলেন, যথা ইচ্ছা কাটাকুটি করে দেবেন। তারিখটি মনে নেই।

ছাপা একখানি মাত্র বই আমার কাছে আছে। এর দামছিল সাত আনা। ছাপা পুস্তক থেকে বাংলা অংশ শ্রীমতী নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এসসি নকল করে দিয়ে আমার পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফারসী ভাষা বিহারীলাল শিখেছিলেন স্বেচ্ছায়। পন্দনামার অনুবাদ তার প্রমাণ স্বরূপ একটি এক্সারসাইজ মাত্র।

তিনি উক্ত ভাষায় একখানি প্রথম পাঠ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। পেন্সিলে লেখা তার একটি অংশ ব্লক করা হয়েছিল। ব্লক প্রস্তুত কারক তার উপর ট্রেসিং পেপার রেখে কালো কালিতে নকল করে নিয়ে তা থেকে ব্লক করেছিলেন। সুতরাং কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকা সম্ভব। সৈয়দ মুজতবা আলী দেখে বলেছিলেন কোথায় একটি শূন্য (০) অতিরিক্ত হয়ে গেছে নকলের সময়। মিলিয়ে নেওয়া অবশ্য আমার সাধ্য ছিল না।

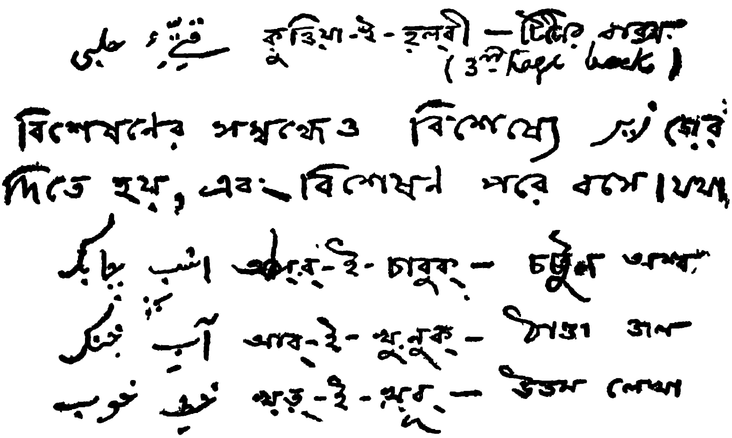

নিবেদন

প্রায় আটশত বৎসরের প্রাচীন, পারস্য-কবি শেখ সাদী রচিত পন্দ-নামা বা নীতি-পত্র একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সংস্কৃতে যে রূপ চাণক্যের শ্লোক, পারসীতে সেইরূপ সাদীর পন্দ-নামা সর্ব্ব সাধারণে কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন। চাণক্য-শ্লোকের বহুল বঙ্গানুবাদ আছে, কিন্তু বাংলায় সাদীর পন্দ-নামার তর্জ্জমা নাই বলিলেই চলে। নীতিপত্র প্রকাশের এই একমাত্র কৈফিয়ৎ।

এই গ্রন্থের জন্য নীতি-পত্র এই বাংলা নামটি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, ইতি।

পোতাজিয়া (পাবনা)
১৯২৪

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী

পন্দনামা

উৎসর্গ

যাঁর নাম অবিরাম মনে মানি' গুরু
পদ রচিবারে কবি করিলেন শুরু,
তাঁরি নুয়ে' সঁপিনু এ ঝরা-ফুলহার—
হেলা করি' লহ যদি, লালসা আমার
আর কিবা ?   বড় কৃপা কর ওহে দান,
সফল সকল আশা, সফল পরাণ।

সচ্চিদাতা দয়াময় ঈশ্বরের নামে

করুণাময়, করুণা মোয় করুন ওগো দান,
আমি যে-হালে কামনা-জালে জড়িত ভগবান।
নাহিক ধারি তোমায় ছাড়ি' পরিত্রাতা আর,
তুমিই ঢের পাতকি-দের ঘুচা'তে পাপভার।
রেখ' হে মোরে করুণা করে' ঠেকায়ে' হেয় পথ,
ত্রুটি ও তম' টুটিয়ো মম, -দেখায়ে' দিয়ো সৎ।

মোহাম্মাদের গুণ-কীর্ত্তন

(তাঁহাব প্রতি ঈশ্ববেব শান্তি ও বব বর্ষিত হউক)

রসনা মোর যত-না দিন বদনাধীন রবে,
মোহাম্মাদে গুণানুবাদে আমোদ যেন লভে।
খোদার তাঁহে দেদার স্নেহ, দূতের মহা দফা,
সমুজ্জ্বল নভস্তল তাকিয়া তাঁর তোফা।
বিশ্বজয়ী অশ্বারোহী, বোরাক্* ঘোড়া সাথ,
নীল-রোয়াকী অট্টালিকা উত্তরিলা নাথ।

*এই অশ্বে আরোহণ করিয়া মোহাম্মাদ স্বর্গ পরিদর্শন করেন।

মনের প্রতি

চল্লিশটি বছর প্রিয় প্রাণের তব ভোর
শৈশবের স্বভাব ফের্ ঘুচ্‌লো কই তোর ?
সমস্তই বিলা'স তুই বিলাসে অভিলাষে,
মুহূর্ত্তেক' কাটালি নেকো মহৎ-সহবাসে।
ক্ষণ-স্থায়ী বয়স, তাহে দিস্ না ঠেস যেন,
ভবের বাজি তফাতে আছি, ভাবিস্ নাকো হেন।

দয়ার মাহাত্ম্য

মন রে, শোন্, করুণাশন-আসন যেবা পাতে,
তাহারি বটে সুনাম রটে দানের দুনিয়াতে।
করুণা তব বিশ্বভব জুড়িয়া দিবে নাম,
করুণা সে যে সুখের শেজে রাখিবে অবিরাম।
করুণা ত্যেজে দুনিয়াতে যে ফলে না কোনো বীজ,
করুণা-বাড়া চলে না সারা বাজারে কোনো চীজ।
দয়ার ব্রত সুখের স্রোত বহায় মনোমাঝে,
পরোপকার প্রাণের সার শস্য উপমা যে।
দাতা যে ওরে, দে তাজা করে' দুনিয়াটার দিল,
ভরে' দে কসে' দানের যশে এ বিশ্ব নিখিল।
দয়ার প্রতি যেন রে মতি সুদৃঢ় সদা রয়—
কেন না, নিজে যে জীবে সৃজে তিনি যে দয়াময়।

বদান্যতা বর্ণনা

পরোপকার নীতির সার সাধিছে সাধু সবে,
মনুষ্য সে করুণাবশে সমুন্নতি লভে।

হিতেচ্ছা ও দয়ার জোরে জগজ্জয়ী হও,
দাতব্য ও দয়ার দেশে প্রধান বেশে রও।
বদান্যতা গুণ যে তাঁরি ধর্ম্মে যাঁরি মতি,
দানের কাজ তাঁহারি, শোন্, যাঁহারি সঙ্গতি।
দানেরে গণি পরশ-মণি পাপের তামা শুচে,
সদাব্রত ওষুধে যত ভবের ব্যাধি ঘুচে।
বদান্যতা অন্যথা না করিবে, পার যদি,—
তা হলে', খেড়ু*, গুণের গেঁড়ু ধরিবে নিরবধি।

*(প্রাদেশিক) খেলুড়ে।

কৃপণতার নিন্দা

আকাশ যদি অবিশ্রাম যকের কামে ঘোরে
লক্ষ্মী যদি বাঁদীটি বনি' যক্ষি সেবা করে,
যদিও তার করেতে রয় কারূঁর* ধন যত,
যদিও সিকি নিখিল হয় তাহারি অনুগত,—
কৃপণ নিজে কী এমনি যে, নামটি নেবে তার ?
যদিও ঘরে গোলামী করে ভাগ্য-দেবে তার
যকের ধনে চ'খের কোণে চেয়ো' না তবু চুকে,
কি ধন তার কি সংসার গেয়ো' না তবু মুখে।
যদি সে চলে জলে স্থলে ধর্ম্মে করি' ভয়,
নিদেশ আছে, ত্রিদিবে তার কে দিবে পরিচয় ?
বখীলা† হোক্ সুখীন্ লোক অখিল সম্পদে—
দুঃস্থ বেশে পস্তাবে সে দুঃখে পদে পদে।
দানীর দল ধনের ফল ভুঞ্জে দিবা রাতি,—
কৃপণ সুখে বঞ্চে দুখে স্বর্ণ-রূপা সাথী।

*কারূন পাবস্যের একজন নামজাদা ধনশালী কৃপণ। †কৃপণ।

বিনয় বর্ণনা

শোন্ রে মন ! বিনয় ধন করিস্ যদি লাভ,
ভবের সবে কর্‌বে তবে তুহার 'পরে ভাব ।
বিনয়-নতি বাড়াবে অতি তোমার পদ ভবে,—
চন্দ্র সে যে সূর্য্য-তেজে উজ্জ্বলতা লভে ।
বিনয়-বারি বন্ধুতারি সিঞ্চে তরুমূল,
বন্ধুতা যে মহীর মাঝে মহত্ব বিপুল ।
বিনয় বশে মনুষ্য সে উচ্চ হয় কত ।
বিনয় যার ভূষণ তার পদ সমুন্নত ।
নম্রতা যে তাহারি সাজে নরেতে যারে গণে,
মানবে নীচু না শোভে কিছু মহত্ব বিহনে ।
হৃদয়খানি করিছে জ্ঞানী বিনয়-নীতি মাখা,
ফলের ভরে ভূমির 'পরে নুইছে নিতি শাখা ।
বিনয়-গুণও বাড়াবে দুনো তোমার খ্যাতিটাই—
অমর ধামে তোমার নামে রচিয়া দিবে ঠাঁই ।
স্বর্গপুরে আছে যে দ্বার বিনয় তার চাবী,
মহত্ব ও পদের লহ ভূষণ এরে ভাবি' ।
যে জন ভবে জীবন লভে প্রভুত্বের তরে,
বিনয় যদি তাঁহায় লখি—আনন্দ কী, ওরে ।
বিনয়-নীতি যে জন নিতি পালিছে পৃথিবীতে,
সে উন্নত ভুঞ্জে পদ-মর্য্যাদা জীবিতে ।
বিনয়-শ্রীও তোমায় প্রিয় কর্‌বে এ জগতে,—
আপনা পারা যাপ' না সারা জনের মনোরথে ।
বিনয়-নতি মানব হতে নিয়ো না কভু কষি,—
বিপদে যাতে উঁচাবে গ্রীবা, ঘুচাবে কিবা অসি ।
উদার-চিতে বিনয়-নীতি দেখিতে কত বেড়ে,
ভিখারীরা যে বিনয়ী সাজে প্রকৃতিগত সে রে ।

অহঙ্কারের নিন্দা

খবরদার ! অহঙ্কার ক'র না, বাছা মোর,
একদা তার হস্তে পাছে ধ্বংস আসে তোর।
ঠাকুরে যদি ঠেকার করে, ঠেকে না শোভনীয়,
বিজ্ঞবরে বড়াই করে, বড়ই শোচনীয়।
অ-হ-ঙ্কা-র মূর্খতার নিত্য আচরণ—
যোগ্য থেকে' জাঁক সে জেঁকে ওঠে না কদাচন।
গর্ব্ব সে যে সর্ব্বনেশে ! হাজালে আজাজিলে*
নরক ঘোরে কয়েদ করে' কত না সাজা দিলে।
ভবের পরে হবে যে নবে দর্প স্বভাবতঃ—
ভাবতে নারি মাথাটা তারি গর্ব্ব ভরা কত।
জগতে যত যাতনা-ভার গর্ব্ব তার গোড়া
দুর্ম্মতির স্বভাব থাকে জবর জাঁকে জোড়া।
জাঁকের কথা সকলি জান' – কর তা' কেন নিত ?
দুরিত তুমি করিছ, পুন' করিছ দুষ্কৃত।

*শয়তানকে

বিদ্যার গুণ

বিদ্যা-বলে মানবে লভে যে সিদ্ধি জগতে,
নাহি তা' হবে মানে কি পদে, ধনে কি দৌলতে।
জ্ঞানের প্রতি তাতিয়ে মতি বাতির মত গলো,
বিদ্যা বিনে বিভুরে চিনে' রাখিবে কত, বল' !
বুদ্ধিমানে বিদ্যালাভে ছাত্রভাবে বুলে,
ভবের হাটে সদা যে কাটে বিদ্যা বহু মূলে।
যাহারি ভবে ভাগ্য হবে অনন্তের তরে,
সেই সে নর নিরন্তর জ্ঞানার্জ্জন করে।

জ্ঞানার্জ্জন ব্রতই তব উচিত ভেবো চিতে,—
চাহি কি তাহে জরুরী ধর' ধরণী ভরমিতে।
চল্‌রে হেঁটে, ধর্‌রে এঁটে জ্ঞানাঞ্চল খানি—
অচিরে তোরে পঁহুছি দিবে ত্রিদিবে বীণাপাণি?
জ্ঞানেরে ছেড়ে' খুঁজিস নেবে কোথায় ভবমেলা,
বাণীরে ছেড়ে মানিবে যে রে জীবনে অবহেলা।
দীন্* ছুনিয়া ছুটিবে নিয়া সিদ্ধি দেন বাণী—
রাজ্যে তব কাজ যে সবি ধার্য্যে জ্ঞান-রাণী।

মূর্খের সঙ্গ ত্যাগ

মন্‌রে, যদি হও গো সুধী, জ্ঞেয়ানে গুরু আর
কর' না তবে সঙ্গ তার বুদ্ধি নাহি যার।
মূর্খ হ'তে তীরের মত পড়িস্ ছুটে দূরে।
মিশিস্ নারে ক্ষীরের মাঝে চিনির মত চূরে'।
গর্ত্ত মাঝে সর্প যদি মস্ত তোর সখা—
বেশ তা' জেনো,— হয় না যেন দোস্ত তোর বোকা।
বুদ্ধিমানে যদিও তোরি প্রাণের অরি হয়,
সেও যে ভাল, বন্ধু তবু মূর্খ ভাল নয়।
ভবের মাঝে কেউ কি আছে অজ্ঞ-হেন হেয়?
অজ্ঞানেরে ছেড়ে যে কিছু জঘন্য নহেও।
খারাপ কাজ ছাড়া কি কিছু জড়ের করে ঝুঁকে?
অসৎ কথা বিনে কে কোথা শুনেছে তার মুখে?
অজ্ঞানের ভাগ্যে শেষে নরক সুবিষম—
নিষ্পাপে যে জীবন যাপে মূর্খ খুবি কম।

ন্যায়বিচার বর্ণনা

বিধি যে তোরে মনের মত সমস্ত ত দেছে—
কেন রে বল্ ন্যায়ের ফল ধরাবি নাকো শেষে ?
ন্যায়বিচার সুরাজতার ভূষণ-হেন শোভে ;
ন্যায়ের পরে চিত্ত তব নাহিক কেন রবে ?
রাজ্য তবে তোমার রবে সুদৃঢ় নিরবধি,—
সুহৃৎ সম সদ্‌বিচার সহায় তার যদি।
নুশীরবান্* কি ন্যায়বান্ রাজাই ছিলো আগে,—
এখনো তাঁর মধুর নাম মোদের মনে জাগে।
প্রজায় ধরা বোঝাই করো ন্যায় বিচার দিয়া,
ন্যায়ের যোগে মজায় ভরো জগ-জনার হিয়া।
ন্যায়ের বাড়া কামিল কেহ নাহিকো ইহ ভবে,
সাধুতা ছাড়া ভুবনে আর কি গুণ সার হবে ?
সুধাও কি হে, কি ধন ইথে লভিবে শেষাশেষি ?
ন্যায়াবতার শাহান্‌শাহ্† নাম। কি চাহ বেশী ?
রাজশ্রীর স্নেহের কিছু চিহ্নে আশা মেটে ?
ত্বনিয়া পরে দাপট-দোরে কপাট দেরে এঁটে।
প্রজার প্রতি সদয় মতি — নিয়ো না তাহা টানি ;
বিচার লাভে আসে যে তারি পূরাও আশা খানি।

*পারস্যের রাজা "ন্যায়বান্" নুরশীরবান ৫৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। †রাজাধিরাজ।

অত্যাচারের নিন্দা

ন্যায়-বিচার নাইরে আর ধরণী হেরে ধূ ধূ—
সুখের বাগ শারদ বায় শুকায়ে যায় শুধু।
অ-ত্যা-চার কদাচ তার অধীন নাহি হবি,
অস্তাচলে কি জানি চলে রাজত্বের রবি।

জগতীতলে যে যত তোলে দাপট দাবানল,
দীর্ঘশ্বাস ঘটায় দেশে লোকের সে কেবল।
অত্যাচারী হুতাস যদি উঠায় হৃদিতলে,
যন্ত্রণায় জলে স্থলে আগুন নিতি জ্বলে।
নিঃসহায় নিঃস্বে হায় না করি' ওঠ' জোর—
নাহিক ভাবি' আরেকটুকু কত-না ছোট গোর।
চেয়ো না চিতে উৎপীড়িতে দুঃখ দিতে মেলা,
লোকের বুকে যে ধোঁয়া ধুঁকে কর না তাহা হেলা।
হট্র* নর! দাপট নাহি করিস্ ওহে নরে—
কি জানি পাছে বিধির মহা প্রকোপ তোহে পড়ে।
দীন ও দুখী কাঙালে রুখি উঠিস্ নাকো কেহ—
দুরন্ত যে নরকে ব্রজে, নাহিক সন্দেহ।

*হুঠকারী, hasty.

সন্তোষ বর্ণনা

শুনহ মন! যদি গো চাহ তুষ্টি আহরিতে,
শান্তিদেশে পারিবে ওগো রাজত্ব করিতে।
দারিদ্র্যের দুঃখে ঢের যদিও জ্বালাতন—
তাহে কি আছে? জ্ঞানীর কাছে কিছুই নহে ধন।
দরিদ্রতা দুখীর কোথা করে না কম মান,
দারিদ্র্যই নবীর* ছিল গভীর সম্মান।
কনকে আর রজতে বটে ধনীরে বড় করে,
কিন্তু সুখশান্তি ধন দুখীর অন্তরে।
নহিস্ ধনী, তাই এমনি রহিবি রোদনিতে?
কাঙাল হ'তে খাজনা হাঁরে রাজা না পারে নিতে।

যে-ভাবে দিন যাপ' না কেন, তোষেরে জেন' সার-
শুভ ক্ষণে যে জন জনে,‡ কি সন্তোষ তার।
সন্তোষের কিরণে তোর মনকে কর্ আলো,
বাসিস্ যদি অদৃষ্টের নিশানি ঢের্ ভালো।

*ঈশ্বরের প্রেরিত দূত মহম্মদের। ‡জন্মে।

ধন-লোভের নিন্দা

খবরদার! ধনেচ্ছার জালে না জড়াইবে—
মাতায়ে' ধন-মদিরা-খোরা পাগল করাইবে।
ধনার্জ্জনে জীবন সদা কর' না তব ক্ষয়,
মাটির বাটি, মূল্যে খাঁটি মতির সম নয়।
যে জন ধন-তৃষ্ণা-জালে পড়িয়া গেছে ঘুরে';
জীবিত সার শস্য তার যেতেছে কোথা উড়ে'।
কারূন্* যত ধরিত ধন, ধরি তোরি সে যদি—
তোরি সে ধন ধরি' যা' ধরে উষিত বসুমতী,
রহিবি তুই আখেরে তবু খাকেরি মাঝে ঢাকা—
সহায়-হীন কাঙাল-হেন দরদে দিল্ মাখা।
কেনই তুমি সোনার প্রেমে গলিয়া সারা হও?
কেনই তুমি দুখের ভারা গাধার পারা বও?
কেনই তুমি দুঃখ অত ভুঞ্জ ধনে লাগি'—
সহসা যাবে তোমার যত ধন যে ক্ষণে ভাগি'।
এমনি দিলে তোমার দিল্ সোনার চেহারাতে?
তাহারি স্বাদে যে-অপবাদে ফিরিছ সাথে সাথে।
এমনি প্রেমে গলিলে তুমি সোনার মুখ দেখি'।
ফুরাল' আজ যতেক কাজ, ঘুরাল' মাথা, এ কি।

এমনি আজ টাকার পিছু শিকার গেছ বনে'—
তাই গো বুঝি শেষের দিন নাইকো কিছু মনে।
সে দুর্জ্জন হিয়ায় যেন না হয় সুখ-ভাগী—
বিসর্জ্জন দেয় যে দীন্* দুনিয়াটুকু লাগি।

*পারস্যের একজন নামজাদা ধনশালী কৃপণ। ।ধর্ম

ভক্তি ও সেবা বর্ণনা

ভাগ্য যবে কাহারো হবে ভৃত্য অনুগত,
চিত্ত তার নিত্য রবে ভক্তি-অনুমত।
ভক্তি ছেড়ে' শির যে ফেরে নয় সে সমুচিত,
ভক্তি হ'তে ভাগ্য বটে হয় যে সমুদিত।
ভক্তি বশে আনন্দ সে জুটিছে নিত্তি আসি',
সেবার আলো লুটিয়া হিয়া উঠিছে উদভাসি'।
দাস্য দিয়া বদ্ধ করি তুল্‌বি পরিকর—
শাশ্বত সে সুখের দ্বার খুল্‌বি তার পর।
যে জন জ্ঞানী শির সে টানি' লয় না সেবা হতে,
সেবার চেয়ে গুণ যে কেজো নাইকো এ জগতে।
সেবার জলে এবার ওজু* রাখবি তাজা হেন,
প্রাতেই যাতে বিনিষ্কৃতি, আতেশ* হ'তে যেন।
সত্য শিরে রাখ্‌বি খাড়া বিভুর আরাধন,
ভুঞ্জিবারে পার্‌বি তাই চিরস্থায়ী ধন।
ভক্তি হতে মনের পটে দীপ্তি ওঠে ফুটি,
বিশ্ব যথা সূর্য্য হতে রশ্মি লয় লুটি।
স্রষ্টা পরে নিত্য হ'রে নিষ্ঠা-পরায়ন,
বশ্যতারি বসিয়া দ্বারে রইবি সারাখন।
সত্যধনে ভক্তি সনে নিত্য সেব' যদি,

সম্পদের রাজ্য ফির' প্রধান নিরবধি।
উপোস নামা জামার গলে গুঁজ্‌বি গ্রীবা, ওরে
স্বর্গে বাড়ী ভাগ্যে তারি উপোস যে বা করে।
মনের দীপ তোমার জ্বালো ধর্ম্ম-আলো ধুঁকি,
এতেই রবে অনুক্ষণ ধনীর মত সুখী।
ধরম-ধড়া যে জন পরা' থাকে বে সারা ভবে,
শেষের দিনে কিসের ভয়ে সে জন সারা হবে ?

*পূজার পূর্ব্বে হস্তাদি মার্জ্জনরূপ ক্রিয়া। †হুতাশ, অগ্নি।

পাপাত্মার নিন্দা

মন রে, শোন—হয় যে জন মন্দ-পবাধীন,
পাপের পাকে যে জন থাকে বন্ধ নিশিদিন।
কর্ত্তারূপে বর্ত্তে উপ-দেবতা যার ঘাড়ে,
সে কোথা হ'তে একতা-পথে ফিরিতে আর পারে ?
মন রে পাছে পাপের কাছে হস্‌নি অবনত,
স্রষ্টা তাহে তুহারে দয়া-দৃষ্টি দিবে কত।
যে জন বোঝে, দুষ্কৃত সে করিছে পরিহার,—
সলিল-মাঝে শর্করা যে গলিছে অনিবার।
প্রকৃতি যার পূরিত সু-তে দুরিত নাহি করে,
পাছে সে মেঘে রৌদ্র সম মলিন হ'য়ে পড়ে।
যতেক লীলা-বিলাস আছে, যাস্‌নে কাছে তারি,
সহসা তোরে নরক ঘোরে নে যায় পাছে কাড়ি' ?
হৃদয় যদি দুরিত হ'তে না আসে ফিরিয়াই
নীচের চেয়ে নীচেয় যেয়ে' হবে যে তোরি ঠাঁই।
ভাসায়ে' ফেলে দিয়ো না হেলে প্রাণের তব ঘর
অসঙ্গত অসৎ যত কাজের স্রোতে খর।
অধর্ম্ম ও দুরিত হ'তে যদি গো রহ দূরে,
নন্দনের তফাতে তুমি না রবে সুর-পুরে।

প্রেম ও আসক্তি-মদিরার ব্যাখ্যা

দে-রে দে, সাকি* মদিরা-সে কী হুতাশময় বাস।
সত্ত্ববান্ মর্ত্ত্য করে মত্ততার আশ।
চুণির মত শোনিত মদ সোনার পেয়ালায়—
মজায় মন কেমন অতি, মাতায় মোতি প্রায়।
এস' গো এস', বাসনানল, প্রণয়ি দল পাশে,*
এস' গো এস' সুখের তুপ, প্রেমেন্দ্র সকাশে।
আনো সে সুরা, যাহারে গণি সঞ্জীবনী ধারা -
সুবাসে যার মানসে পায় দুঃখ হতে ছাড়া।
সুখী সে মন, যে একজন সুহৃদ্ তরে কাঁদে,
সুখী সে জন, পড়ে যে তার বন্ধুতার ফাঁদে।
সুখী সে বুক, সখার মুখ ধরেছে যার মনে,
সুখী সে হিয়া, বসে যে গিয়া সখার গৃহ-কোণে।
সুধার হেন বঁধু সে যেন; মতি সে মনোমদ,—
সুধা সে ছাঁকা, কেমন সাফা, মুখখানির মত।
এস' গো মদ-উন্মাদনা উদার-মনা পাশে,
এস' গো সুরা-সুরভি এস' সদাত্মা সকাশে।

†এই ছত্রগুলি ঈশ্বরের প্রতি উদ্দিষ্ট। *পানপাত্র-বাহক

বিশ্বাস বর্ণনা

চিত্ত ওরে, নিষ্ঠা'পরে শক্ত পায়ে দাঁড়া—
মুদ্রাটা যে চলে না কাজে পৃষ্ঠে ছাপ ছাড়া।
রশ্মি নাহি ফিরাও যদি নিষ্ঠা-পথ থেকে'—
বৈরি-বুকে বৈরি ঢুকে' সখার মত জেঁকে।
বিশ্বাসের টেরুটি হতে না টেনো-হৃদ'-মুখ—
সখার মুখ-সকাশে তবে হবে না অধোমুখ।

বিশ্বাসের বহির্দ্বারে নিষিদ্ধ পা' ফেলা—
ঝগড়াঝাঁটি কি পরিপাটি সুহৃদ্‌টির বেলা ?
দোষ সে বড়—সরিয়া পড় প্রিয়রে ছেড়ে যদি।
সঙ্গি-সনে ভঙ্গ দেওয়া বিশ্বাস-বিরোধী।
অ-বি-শ্বা-স অবলাদেরই বিশিষ্টতা জেনো,
শিখিয়োনাকো যোষিৎদের অশিষ্টতা হেন।

কৃতজ্ঞতার গুণ

সত্যময়ে চিত্ত যার কৃতজ্ঞতা ভরা',
প্রশংসার রসনা তার বন্ধ কেন করা ?
শিখা'স নে-রে মনেরে বিনে খোদার যশোগীতা,—
নিত্যই যে কীর্ত্তনীয় বিশ্ব-রচয়িতা।
কৃতজ্ঞতা-বশেই ধন-দৌলত্ সে বাড়ে,
কৃতজ্ঞতা বশেই পশে বিজয় তোর দ্বারে।
কৃতজ্ঞতা দেখ'াস্ যদি নিকাশ যত দিন—
কাজের বাগে হাজার ভাগেও হবে না তবু ক্ষীণ।
হ্যাঁগো এ বড় ভালই—কর কৃতজ্ঞতা গান ;
কৃতজ্ঞতা ভূষায় ভাল সাজে গো ইস্‌লাম।
কৃতজ্ঞতা হ'তে না যদি রসনা বাঁধো তব,
চিরন্তন যে দৌলত্ তাহাই তুমি লভ।

ধৈর্য্যের ব্যাখ্যা

ধৈর্য্য যদি তোমার রহে সহায়-ভূমি ভাবে
চিরস্থায়ী যে সম্পদ তাহাই তুমি পাবে।
ধৈর্য্য ফের প্রেরিতদের বড় বিশিষ্টতা—
ধর্ম্মাচারী এ দিক্ থেকে না যায় বেঁকে কোথা।

ধৈর্য্য, শোনো, খসায় মনো-আশার কসা দ্বার—
ধৈর্য্য বিনা তাহার কোনো নাহি যে চাবী আর।
ধৈর্য্য তোরে করিছে, ওরে মনের আশা দান—
জ্ঞানীর কাছে এ তোর আছে ধাঁধার সমাধান।*
ধৈর্য্য তব উচ্চ আশা-দুয়ারে চাবী প্রায়,
আশার তব রাজ্য ও যে নিতান্ত বাড়ায়।
সবুর যে রে সবার ভাল মানিবে প্রতি কাজে,—
কেন না এই কথার মাঝে অর্থ অতি আছে।
ধৈর্য্য তোরে দিতেছে, ও রে যতেক তব আশ—
তোরে যে দুখ কষ্ট হতে তরাইছে এ আজ।
ধৈর্য্য ধর, যদি গো তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণ;
সত্বরতা দেখায় শুধু অপদেবতাগণ।

*বুঝিলি না যে! জ্ঞানীর কাছে শুনিবি সমাধান।

সত্যের বর্ণনা

মন রে, যদি সত্য ধন বরণ করি' লবে,
লক্ষ্মী তবে নিত্য তব সুসঙ্গিনী হবে।
সত্য হ'তে কখনো জ্ঞানী শির না টানি' লয়,
সত্য বশে নরের নাম সমুন্নত রয়।
ন্যায়েরি অহো নিশাস্ গ্রহ করবি, যবে ভোর,—
অজ্ঞতার অন্ধকার হর্‌বি তবে তোর।
নিছক বিনে নিশাসি' কিছু নিবি নে, সাবধান।
সব্য কর বামের 'পর সর্ব্বথা প্রধান।
সাঁচার ছাড়া আচার সারা জগতে আঁটা ভার,
সাঁচ্চারি যে গোলাপ কুঁড়ি নাইকো কাঁটা তার।

মিথ্যা কথার নিন্দা

যখন লোকে অসত্যকে বরণ করে ভবে,
কোথায় পাবে মুক্তি তার শেষের দিন যবে?
যে-জন করে মিথ্যা-ভাব নিত্য আচরণ—
মনের আলো তাহার ভালো জ্বলে না কদাচন।
অসত্য সে মনুষ্যেরে লজ্জা করে দান,
অসত্য সে মনুষ্যের বিনাশে সন্মান।
প্রজ্ঞাবান্ লজ্জা পান মিথ্যাবাদী হেরে,
অমন নরে কেহ না করে সম্মাননা যে রে।
দেখিস্ যেন অলীক কভু বলিস্ নাক', ভাই—
মিথ্যাবাদী ঘৃণ্য অতি, খ্যাতিও তার নাই।
অসত্যেরে ছাড়িয়ে যে রে নাইকো কিছু হীন—
ইহারি থেকে, শোন্ রে বাছা, সুনাম পিছু ক্ষীণ।

পরব্রহ্মের কর্ম্ম-কলাপ

নে-গো নে বুঝে' এ গম্বুজে স্বর্ণ-কাঁতি ঝলা'।
ছাদটি ওই স্তম্ভ বই ধন্য গাঁথি তোলা'।
ঘূর্ণমান্ আস্মানের ঝালোর-খানা হেরো—
তাহাতে কত দিতেছে বাতি আলোর হানা, হেরো।
কেহ বা হেথা বাখাল, কেহ নৃপাল হেন আছে,
কেহ বা চাহে বিচার, কেহ সিংহাসন যাচে।
কেহ বা হেথা পরম সুখী, কেহ বা দুখে লাগা,
কেহ বা কত সমুন্নত, কেহ বা দুর্ভাগা।
কেহ বা কর-প্রদাতা, কেহ সিংহাসন-পতি,
কেহ বা হেথা উচ্চ-মনা, কেহ বা নীচ অতি·

কেহ বা বসে মাদুরে, কেহ বসিছে রাজাসনে,
কেহ বা ছেঁড়া কাপড়ে, কেহ সু-পট্ট-বসনে।
কেহ না পায় অন্ন, কেহ সম্পন্ন কত।
কেহ বা আশা-বিহীন, কেহ মহা সমুন্নত।
কেহ বা সহে দুঃখ, কেহ টাকায় গড়াগড়ি,
কেহ বা বাঁচে দু'দিন, কেহ চিরটা কাল ভরি।
কেহ বা হেথা সুস্থ, কেহ কাহিল-দেহ ফের—
কেহ বা হেথা প্রাচীন, কেহ নবীন বয়সের।
কেহ বা আছে পুণ্য মাঝে, কেহ বা পাপে লাগা,
কেহ বা ধ্যায় খোদার দয়া, কেহ বা ভায় দাগা।
কেহ বা সাধু পরম, শুধু ধরম সমাচরে,
কেহ বা ডুবে দুরিত আর দুষ্কৃত সাগরে।
কেহ বা সৎ-প্রকৃতি, কেহ গোঁয়ার স্বভাবের,
কেহ বা হেথা সুধীর, কেহ কলহ-প্রিয় ফের।
কেহ বা আছে পরম সুখে, কেহ বা দুখে রয়,
কেহ বা ঘোর কষ্টে, কেহ ভাগ্যবান হয়।
কেহ বা শুধু কামের ভূমে আমীর-সম রাজে—
কেহ বা আছে জড়িত হয়ে' বিপদ্ জাল মাঝে।
কেহ বা চির সুখের চারু গোলাপ-ফুলবনে,
কেহ বা শোক দুঃখ আর যন্ত্রণার সনে।
কাহারো ধন বাহিরে যায়, নাহিবে তায় দিশে,
কেহ অন্ন-কষ্টে আছে— গোষ্ঠী বাঁচে কিসে।
কেহ বা যেন কুসুম-রাশি, খুশীতে হাসি-মুখ ;
কাহারো চিত, সুদুঃখিত, যাতনা-জোড়া বুক।
কেহ বা হেথা সেবার ছাঁদে কোমর বাঁধে তারি,
কেহ বা আনি' জীবন খানি দুরিতে দেয় ডারি।

কারো বা কাটে দিবসরাতি পুণ্যপুঁথি-হাতে,
কেহ বা তাড়িখানার কোণে ঘুমে মত্ততাতে।
কেহ বা নিজে গোঁজের মত পূজার দোরে পোঁতে,
কেহ বা চলে সূত্র-গলে অনাস্থার পথে।
কেহ বা হেথা সফল, সুধী, জ্ঞান সমন্বিত,
কেহ বা অতি ভাগ্যহীন অজ্ঞ ও ঘৃণিত।
কেহ বা বীর, চটুল আর বিপুল বলবান্,
কেহ বা ভীরু, অলস আর ত্রাসিত তার প্রাণ।
কেহ বা লেখে—লোকটি জ্ঞানে দীপ্তমতি কি যে,
কেহ বা চোর লুকিয়ে মনে ;—লিখিয়ে ভণে নিজে।

সৃষ্ট জীবে বিশ্বাস স্থাপন নিষেধ

তাই গো শোন'—না কর' কোন' ভাগ্য পরে ভর
সহসা প্রাণে পাছে সে আনে ধ্বংস ঘোরতর।
না কর' ভর অগণ্য এ সৈন্য-চয়ে তব—
হয়ত, বীর, জয়শ্রীর সাহায্য না লভ।
না কর' ভর রাজ্যে ওগো, পদে ও গৌরবে—
আগেও তব আছিল তারা, পাছেও তব রবে।
না কর' বদি*—তা' হেরো যদি বন্ধুবরে ভালো।
কু-বীজে কবে খুবি-যে ভবে ফলটি ধরে ভালো ?
না-কর' ভর রাজশ্রীতে, না কর পরভাবে,
সহসা যে রে আদেশ এলে প্রাণটি ফেলে যাবে।
কত-না ছিল বসুধাধীশ, রাজোষ্ণীষ শিরে ;
কত-না ছিল তুমুল বলী, মুলুক মলি' ফিরে।
কত-না ছিল তুঙ্গ শির,—ভঙ্গে সেনা-বারে ;
কত-না ছিল নৃসিংহ সে অসির হানা মারে।

কত-না ছিল চন্দ্রমুখী, সুচারু তনুলতা ;
কত-না ছিল রূপসী, ধরি' রবির উজলতা।
কত-না ছিল চিত্ত-চোরা, উঠেছে ওরা সবে।*
কত-না ছিল নবোঢ়া, আজ গা ভরা সাজ শোভে।
কত-না ছিল সুনাম্নী গো, কত-না সু-কপাল ;
কত-না ছিল সুতনু ; কত গোলাপ-রাঙা গাল।
ইহারা সবে ছিঁড়েছে ভবে জীবন জামাটা যে,
ঢুকায়ে দেছে মাথাটা কিবা মাটির গ্রীবা মাঝে।
প্রাণের পাকা শস্য তারা উড়ায়ে দেছে বায় —
কেহই আর কদাপি তার চিহ্ন নাহি পায়।
দিয়ো না মন এমন মনোমোহন এ ভুবনে—
তুমি যে ইথে নিবখি নিতে পাবে না সুখী মনে।
দিয়ো না মন এমন ভবে, সুখের হাওয়া যথা,
স্বর্গ হ'তে বরষে পাছে ভাগ্য বিহীনতা।
স্থায়িত্ব যে ভবের নাহি—শোন্‌রে অয়ি ছেলে,
যাপিস্‌ নাকো জীবন তব হেথায় অবহেলে।
দিস্‌ নে মন ক্ষণস্থায়ী এমন নিকেতনে—
সা'দীর এই একটি কথা রাখিস্‌ লিখে' মনে।

*খারাবি, মন্দ। †সদ্য, নতুন।

কবিতা গুচ্ছ

গীতিসপ্তক ও স্মৃতিসপ্তক নামক মোট চৌদ্দটি গীতি ছিল। কিন্তু গীতিসপ্তকের মাত্র চারটি গীতি পাওয়া গেল। পুরানো বঙ্গভাষায় পাওয়া গেল না সম্ভবত

গীতিগুচ্ছ

যক্ষপত্নী

বর্ষপ্রবেশ

উদ্দেশে

স্মৃতিসপ্তক

বিফল প্রয়াস

ভুল

লজ্জা

লজ্জার সাহস

কথা

দর্শনান্তে

নৈরাশ্য

যক্ষপত্নী

প্রদীপ ৫ম ভাগ, ১৩০৮-৯

প্রভুশাপে ফিরে পতি বিরহে বিজনে।
প্রাণসমা প্রিয়তমা চক্রবাকী প্রায়
সুদীর্ঘ যামিনী দিবা কাটে বা কেমনে—
ক্ষুণ্ণ মনে দিন গণে শূন্য অলকায়।
রুখু-কেশে-মেঘে আছে চাঁদ-মুখ ঢাকি ;
শিশিরে-বিশীর্ণ কিবা বিবর্ণ নলিনী ;
জানালায় জ্যোৎস্না হেরি' মুদি' আসে আঁখি—
বারি-সিক্ত আধ-সুপ্ত স্থল-কমলিনী।
বিরহ-সুতনু অঙ্গ গৃহকোণে লীন,
পেতেছে হৃদয়খানি করিয়া বিস্তার—
লুপ্ত অন্তরাল নদী নগেন্দ্র গহিন।
স্বপ্নে আলিঙ্গন, জাগি' অশ্রু উপহার।
একি দুঃখ যক্ষবালা অয়ি বিরহিণী,
জাগ্রত স্বপনে প্রিয়-উৎসঙ্গ-সঙ্গিনী।

বর্ষ প্রবেশ

(বঙ্গভাষা, ১৩১০)

নব বর্ষে একি গো সংশয়'
নাহি বাণী নাহি বার্ত্তা তবু মতি অতি আর্ত্তা'
একি ভুল, এ বিপুল বিশ্বে আজি কিরে
আশার আশঙ্কা আসে ফিরে,
বর্ষে ভাসে ভরসার ভয়।
যেতে ঊর্দ্ধে হবে কি পতন ?

মহাশূন্য পারাবারে   দিগভ্রান্ত একেবারে,
পড়ে পিছে এত নীচে ঘুরি সারা বেলা,
সঙ্গী নাই, নিতান্ত একেলা
যেন অন্ধ পাখীর মতন !
গেছে তো এমনি আরও মাস ।
সারাদিন হারা পথে   ফিরিয়াছি কোন মতে,
ছিল আশা, বঙ্গভাষা নিকুঞ্জ নিলয়ে
ফুল গন্ধ অলি গুঞ্জ লয়ে'
কলকণ্ঠে গাহি বারো মাস ।
আশা বল পলকে মিলায় ।
না উঠিতে পড়ি লুটে'   চরণে কণ্টক ফুটে—
ওহে নববর্ষ, তব উন্মুক্ত দুয়ারে
সভয়ে পশিল পান্থ, তারে —
রিক্ত হাতে দিয়ো না বিদায় !

উদ্দেশে

(বঙ্গভাষা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০)

(১)

জানি না পড়ে   কি না মনে তার
অবিকল ;
অতীত কুহেলিকা   চারিধার
অবিরল !
যে আঁখি চেয়ে' ছিল,   যে গান গেয়েছিল
যে প্রাণ ছেয়ে'   ছিল সুকুমার
সুকোমল
আজিকে আছে   কি না মনে তার
অবিকল !

(২)

জানি না করে কি না মনে আর
পুরাণে।
জীবন বহে কিনা সে জনার
উজানে!
যেথায় দুটি স্রোত আছিল ওতপ্রোত
আছে কি সে জগৎ আগেকার
সেখানে।
কোথায় ছুটিয়াছে অনিবার
কে জানে!

(৩)

জানি না গড়ে কি না মনে তার
পশিয়া।
নিরালা মেঘের সে ঘর-দ্বার,
বসিয়া!
সেথায় শুধু দুটি কিরণ ছিল ফুটি
কোথায় গেল টুটি' সে আগার
ধ্বসিয়া—
মোদের প্রমোদের সংসার
খসিয়া!

(৪)

জানি না ধরে কিনা মনে তার
মানিনী
আমি ত সুরভিত ফুলহার
আনিনি!

পুরানো দুখভারা জুড়ানো আঁখিধারা,
আমি যে তাহা ছাড়া কিছু আর
জানিনি ;
শূন্য জীবনের কবেকার
কাহিনী !

স্মৃতি সপ্তক

(বঙ্গভাষা, চৈত্র ১৩১০)

বিফল প্রয়াস !

আঁখির তুলিকা দিয়া হৃদে আঁকিয়াছি তায়,
বাহিরে কেমনে সখা, সে ছবি দেখাব হায় !
আঁকিতে ধরেছি তুলি ।
অমনি যে যাই ভুলি ।
মুহূর্ত্তে মূরতিখানি ফুটিয়া টুটিয়া যায় !
সে যে গো স্বপনমাখা,
কার সাধ্য স্বপ্ন আঁকা ?
তুলিকা লেখনী বাণী মানিবে তো পরাজয়
বিধাতারি হাতে বুঝি আর না তেমন হয় ।

ভুল

নলিন-নয়ন প্রেম-পরিমলে ঢুলু ঢুল,
না জানি ঢালিছে তারা কোন স্বপনের ভুল
প্রেম-স্বপ্নে প্রাণ ঢুলে'
পড়েছে সে আঁখিমূলে,
গিয়াছে আপনা ভুলে, হইয়াছে সমাকুল ।

চেয়ে চেয়ে আঁখি তুলে'
সকলি মাখানো ভুলে,
এ ধরণী মনে বলে অমরার সমতুল,
সে রমণী যেন কোন দেবতা বালার ভুল।

লজ্জা

গৌরী-একতালা

চকিত আঁখিতে তারে কত আর হেরিবিরে,
না তুলিতে আঁখি-পাতা শরমেতে মরিবিরে।
হৃদয়ের ভালবাসা
চোখে যেন ভাসা ভাসা,
তাই কি এতেক শঙ্কা, পাছে ধরা পড়িবিরে।

লজ্জার সাহস

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

দেখি' দেখি' করি মনে, পুলকে পরাণ নাচে,
কথার বাঁধুনিগুলি ভুলি দরশনে পাছে।
চোখের আড়ালে থাকি,
যারে শত নামে ডাকি,
দেখিলে কি তারি আঁখি সকলি ভুলিতে আছে ?
এ কথা সে কথা ধরি'
সমুখে ত গিয়ে পড়ি,
না হয় শরমে মরি মরম খুলিব কাছে।

কথা

কতবার হবে ভুল, এমনি হৃদয় মোর।
প্রেমের জ্যোতির প[illegible]ার কুয়াশা ঘোর।
শুধায়ে একটি কথা আর না কহিতে জানি,
তার সে হাসির স্রোতে কোথায় ভাসায় বাণী।

মদির মুখানি পানে চাহিলে একটিবার,
অথির হৃদয় বীণা টুটে' যায় যেন তার।
যেন মনে কথা নাই, যেন সেথা নাহি আশা,
দলিয়া চলিয়া গেলে, যোটে কথা যোটে ভাষা।
এবার আসিবে যবে, চাহিব না আঁখি পানে,
হয়ত প্রাণের কথা তবু রবে ঢাকা প্রাণে।

দর্শনান্তে

দেখিনু আবারো, তবু কেন প্রাণে বহে ঝড়,
নিশাস উচ্ছাসি উঠে, বাবি ধারা আঁখি'পব।
হু হু করে হৃদাকাশ
ভাঙে সুখ, কাঁপে আশ,
থেকে থেকে মর্ম্মতরু করিতেছে মরমর।

নৈরাশ্য

কি করে' রাখি ধরে' তার পায়,
যদি সে যায় মিশে' নিমেষে
শুধু যে চোখ বুজে' চলে' যায়,
যাচিয়া কারে হিয়া দিবে সে?
করি'ছি মিছামিছি সাধনা,
কাজলে আঁখিজলে একাকার,
দিতেছি হৃদি সেচি' বেদনা
বিফলে পদতলে উপহার।

গদ্যরচনাবলী

কবিতার ছন্দ ও মিল

ছন্দ ও মিলের খুঁটিনাটি

বাংলা শব্দের দ্বিরুক্তি

বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দ

চিত্রাঙ্কন

ব্যাকরণ প্রসঙ্গ

কবিতার ছন্দ ও মিল

(ভারতী, কার্তিক ১৩০৭)

ভাদ্র মাসের 'ভারতী'তে তুলসীদাসের রামচরিত্র মানস সমালোচনায় লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "সংস্কৃত ছন্দগুলি প্রাদেশিক ভাষায় আনিতে যাইয়া কোন কবিই সংস্কৃত হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের নিয়ম উৎকৃষ্ট ভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই।" কথাটি অনেকটা ঠিক হইলেও বোধ হয় যে কবিরা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই ঈষৎ স্খলিত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাষার প্রকৃতি বুঝিয়া একটু নূতন নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন মাত্র। লেখক-উদ্ধৃত তুলসী-দাসের তোটক ছন্দেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

ভব বারণ দারুণ সিংহ প্রভো,
গুণ সাগর নাগর নাথ বিভো।

ইহাতে লেখক কোন খুঁত দেখিতে পান নাই, কিন্তু 'অজ ব্যাপক মেক অনাদি সদা' চরণে দ্বিতীয় অক্ষর গুরু করা হইয়াছে বলিয়া ভুল বাহির করিয়াছেন। বস্তুত উভয় স্থানেই ভ্রম আছে, একটি তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, অপরটি পড়ে নাই। সংযুক্ত বর্ণের পূর্বাক্ষর গুরু হয়, সুতরাং 'অজ ব্যাপক' চরণে দ্বিতীয় অক্ষর গুরু হওয়াতে যেমন ভুল হইয়াছে তেমনি তোটকের তৃতীয় ষষ্ঠ নবম অক্ষর গুরু হওয়ার নিয়মে প্রথম শ্লোকের দশম অক্ষর গুরু করাও সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু কবিরা প্রাদেশিক ভাষায় এইটুকু বিশেষত্ব প্রবেশ করাইয়াছেন যে তাঁহারা দুই পদ আবশ্যক মত পৃথক ধরিয়া পাঠ করেন, তাহাতেই সংযুক্ত বর্ণের পূর্বাক্ষর (পূর্ব পদের) গুরু বলিয়া কানে বাজে না। তাঁহারা এক পদের মধ্যে এ নিয়ম সর্বত্র রক্ষা করিয়া চলেন। আমাদের রবীন্দ্রবাবুরও এই নিয়ম। তাঁহার বহু কবিতাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম—

"নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণ তট্ শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।"

ইহার দ্বিতীয় চরণে সংস্কৃত নিয়মে 'তট' শব্দের 'ট' যুক্ত অক্ষরের পূর্বে আছে বলিয়াই যে গুরু পাঠ করিতে হইবে তাহা নহে। কিন্তু গহ্বর শব্দের 'গ' ও নিম্ন'র 'নি' একই পদে আছে বলিয়া গুরু উচ্চারিত হইবে।

এখানে বক্তব্য রবীন্দ্রবাবু সংস্কৃত ছন্দে লিখেন নাই, ইহা আমাদের অধম-তারণ পয়ার ছন্দেই লিখিত হইয়াছে; চতুর্থ পংক্তি অক্ষর হিসাবে চৌদ্দই আছে, অবশিষ্টগুলির হিসাব একটু সতর্কভাবে করিতে হইবে অর্থাৎ একটি গুরু বর্ণ দুইটি অক্ষরের সমান ধরিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'তট' শব্দের পর যতি পড়িয়াছে বলিয়াই উহার গুরুত্ব ধরা হয় নাই? আচ্ছা আরও উদাহরণ দেওয়া যাক—

"এমন মেঘস্বরে* বাদল *ঝর ঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়।"

"তাহারি পদধ্বনি যেন গনি কাননে
আসিল সে আমার ভাঙ্গা* দ্বার খুলিয়া।"

*চিহ্নিত শব্দগুলিতে নিয়মানুসারে 'খ' 'দ' ও 'ঙ্গা' গুরু উচ্চারিত হইয়া দুইটি অক্ষরের সমান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য তাহা নয়—সংযুক্ত বর্ণ ভিন্ন পদে আছে বলিয়া পূর্বপদের শেষ বর্ণ গুরু ধরা হয় নাই।

গুরু লঘু উচ্চারণ ভেদে রচিত কবিতার আরও কতিপয় বিশেষত্ব আছে। আমরা একে একে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

সকলেই জানেন সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ) অনুস্বার বিসর্গযুক্ত বর্ণ, ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ গুরু হয়। বাঙালা ছন্দে যদি দীর্ঘস্বরের সমস্তই গুরু উচ্চারিত হয় তবে অত্যন্ত শ্রুতিকটুত্ব দোষ ঘটে। এইজন্য রবিবাবুর নিয়মে আ, ঈ, ঊ, এ, ও এই স্বরগুলি গুরুর ঘর হইতে বিদায় পাইয়াছে, কেবল ঐ এবং ঔ পরম গৌরবে রক্ষিত হইয়াছে। যথা—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব রভসে,"

"মৌন সকল পৌর ভবন।
সুপ্ত নগর মাঝে"।

"ছাড়ি কৌতুক নিত্য নূতন বেশে
ওগো কৌতুকময়ী
জীবনের শেষে কি নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি।"

উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলিতে ঐকার ও ঔকার গুরু, কিন্তু আকার ঈকার উকার একার এবং ওকার গুরু নয়।

অনুস্বার যুক্ত বর্ণ গুরু হয়। যথা—

"আমি নির্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ।
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে"।

বিসর্গযুক্ত বর্ণ সংযোগ পূর্ববর্ণের মতই গুরু। কিন্তু পদের অন্তে থাকিলে অকারন্তবৎ লঘু হইবে। যথা—

"অসহ দুখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি।"

"নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম
জননী—বঙ্গ ভূমি।"

গুরু লঘু ভেদে অবলম্বিত বাঙ্গলা কবিতার পাঠ সম্বন্ধে এই সাধারণ নিয়ম। যেখানে অক্ষরগণিত ছন্দ রচিত হইয়াছে, সেখানে কিন্তু গদ্যের গুরু লঘু ভেদের নিয়মই রক্ষিত ও সেইরূপই পঠিত হয়। কেবল গুরু একটি বর্ণের গণনায় যে দুইটি বর্ণ ধরা উচিত তাহাই হয় না।

অর্থাৎ গুরুবর্ণ কতটি হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা করা হয় না—প্রত্যেক চরণে নির্দিষ্ট সংখ্যা অক্ষর থাকিলেই হইল।

"বৃষ্টি ঘেরা চারিধার ঘনশ্যাম অন্ধকার
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ আর ঝর ঝর পাতা,
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।"

উল্লিখিত রচনায় সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব বর্ণ সকল সাধারণ নিয়মে গুরুই উচ্চারিত হইতেছে—এমন কি, 'ঘনশ্যাম' পদদ্বয়ে 'ন' গুরু। পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে এই চরণের মধ্যস্থ 'পদ' শব্দের 'দ' গুরু নয় - কারণ, ইহা গুরু লঘু ভেদে লিখিত হইয়াছে; 'দ' গুরু হইলে 'পদধ্বনি পাঁচ অক্ষর ধরা হইত, সুতরাং 'যেন গণি'র চারি অক্ষরে মিল পড়িত না।

মোটের উপর এই দাঁড়াইতেছে যে, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ বাঙলায় গদ্যে পদ্যে উভয় এই গুরু-পদ্যে যুক্ত বর্ণটি পদের মধ্যে বা শেষে থাকা চাই; প্রথমে থাকিলে, পূর্বপদের শেষ অক্ষর গুরু-লঘু ভেদ পদ্যে গুরু হয় না, অক্ষর গণিত পদ্যে গুরু হয়। কিন্তু পূর্বপদের শেষ বর্ণ হসন্ত উচ্চারিত হইলে হইবে না। অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত বর্ণ এবং ঐকার ও ঔকার গুরু হয়; কিন্তু অপরাপর দীর্ঘস্বরের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না।

এক্ষণে কথা হইতেছে, কোন কবিতা গুরু লঘু ভেদে লিখিত বলিয়া সেই অনুসারেই পঠিত হইবে তাহা কেমন করিয়া জানা যাইবে? ইহার উত্তর খুব সহজ। যেমন সংস্কৃত ছন্দের নাম না জানিলেও দীর্ঘ হ্রস্ব ভেদে উচ্চারণ করিয়া পড়িয়া গেলেই ঠিক মত পাঠ করা হয়, বাঙলায়ও সেইরূপ। যথা—

ইয় মধিক মনোজ্ঞা বল্কলে না পি তন্বী—

এই সংস্কৃত শ্লোক-চরণের এ্যান্টিক টাইপের বর্ণগুলি গুরু উচ্চারণ করিয়া অবশিষ্টগুলি লঘু করিলেই 'মালিনী' ছন্দে সুন্দর পাঠ করা হইল। একটি কথা মনে পড়িতেছে– বাঙলায় ঐ এবং ঔকার ছাড়া আকারাদি অন্যান্য দীর্ঘস্বর যে প্রায়শঃ গুরু উচ্চারিত হয় না, তাহা 'চিরককুমার সভায়' সেদিন হঠাৎ ঠিক হইয়া গিয়াছে। যদিও 'ইয়মধিক মনোজ্ঞা চাপ কানেনা পি তন্বী' চরণটি সংস্কৃত ছন্দেই পঠিত হইয়াছিল, তথাপি বাঙলা কবিতা ও সঙ্গীতে চিরকাল অভ্যস্ত থাকায় 'চিরকুমার সভায়' ইহার আবৃত্তিকালে উক্ত সভার ভূতপূর্ব সভ্য অক্ষয়বাবু-রও 'কানে'র ঠিক ছিল না, নতুবা তিনি ঐ চাপকানটির শেষ ভাগের আকার হ্রস্ব করিয়া দিতেন।

আর একটি কথা এই যে, পয়ারের কম অক্ষর হইলেই রবিবাবু সাধারণতঃ গুরু-লঘু ভেদে কবিতা লিখিয়া থাকেন। বিরাম আট অক্ষরের কমে পড়িলে পয়ারাধিকে এবং পয়ারেও কখন কখন এই নিয়ম পালন করেন। আবার কখন বা কবিতা-পংক্তির ক্ষিপ্রগতি ও শব্দের ঝঙ্কারের উপর ঝোঁক দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও এই নিয়মে চলিয়া থাকেন, দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

"(দেবি,) অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে
অনেক অর্ঘ আনি,
আমি অভাগ্য। এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধনখানি!"

"অঙ্গে অঙ্গে ।৬। বাঁধিছ রঙ্গ পাশে
বাহুতে বাহুতে / জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিত রসে / ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে। বহিছে গোপন কথা।"

(পয়ার)

"ঝুলন খেলা ।৫। রাত্রি বেলা !"

"আসিবেক শীত, (৬) বিহঙ্গ গীত
যাইবে থামি,
ফুল পল্লব / ঝ'রে যাবে সব,
রহিব আমি।"

"তবে দাও ঢালি ।৬। কেবল মাত্র
দুচারি দিবস / দুচারি রাত্র
পূর্ণ করিয়া / জীবন পাত্র
জনসংঘ'ত মদিরা।"

"কিছুতে নাহি তোষ ।৭। এত বিষম দোষ
গ্রাম্য বালিকার / স্বভাব ও যে।"

"বুক ভরা মধু ।৬। বঙ্গের বধূ
জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ / করে আনচান
চোখে আসে জল ভরে।"

উপরিলিখিত রচনাগুলিতে যতি আট অক্ষরের কমের উপর (৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম অক্ষরে) পড়িয়াছে, সুতরাং এ্যান্টিক টাইপের প্রত্যেক বর্ণ দুই বর্ণের সমান ধরিতে এবং গুরু করিয়া পড়িতে হইবে।

কিন্তু আট অক্ষর চরণবিশিষ্ট দীর্ঘ ত্রিপদী কিংবা চৌপদীতে কবিবর কেবল অক্ষর গণনা করিয়াই প্রায় লেখেন। যথা—

"বদ্ধ গৃহে করি বাস ।৮। রুদ্ধ যবে হয় শ্বাস,
আধেক বসনবদ্ধ খুলিয়া,
বসি গিয়া বাতায়নে সুখসন্ধ্যা সমীরণে
ক্ষণ তরে আপনারে ভুলিয়া ।"

"আজি বর্ষা গাঢ়তম ; ।৮। নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে ।
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকি ঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে ।
(যদি) ভরিয়া লইবে কুম্ভ ।৮। এস ওগো এস মোর
হৃদয় নীরে ।"

বোধ করি প্রাদেশিক ভাষায় .হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে কবিতা রচনার ইহাই সাধারণ ও সুষ্ঠু নিয়ম। অতঃপর মিল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

দীনেশবাবু প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন—"শুধু সর্ব্বশেষ অক্ষরের মিল হইলেই কবিতা সিদ্ধ হয় না, তৎপূর্ব্ব বর্ণের স্বরের ঐক্য হওয়া চা‌ই। যথা—'জাগি' এবং 'ভাগী', 'ধারণ' এবং 'বারণ' মিলিয়া যা , কিন্তু 'নীলা' ও 'মূলা' নিষিদ্ধ, কারণ এই দুই শব্দের পূর্ব্ববর্ণের স্বরের ঐক্য নাই।" কিন্তু এই নিয়মটি দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের মিল সম্বন্ধেই খাটে। যদি মিলনের শব্দগুলি তিন চারি কি বেশি অক্ষরের ক্রিয়াপদ হয় তবে ভাল খাটে না। যথা—'করিয়া' এবং 'ঠুকিয়া', 'রাখিতাম' এবং 'ধরিতাম' এইরূপ মিল দিলে দীনেশবাবুর ধৃত নিয়মটি অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু কোমল কর্ণ কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এক রবীন্দ্রবাবু ছাড়া বঙ্গের অন্য কবিগণ ক্রিয়াপদের মিল সম্বন্ধে বিপুল ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ক্রিয়াপদের সুন্দর মিলন রবিবাবুর গ্রন্থে পত্রে পত্রে পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দিতেছি—

"তোমারে আঁকিতাম
রাখিতাম ধরিয়া,
বিরহ ছায়াতল
সুশীতল করিয়া।

কখন দেখি যেন
ম্লান হেন মুখানি,
কখন আঁখিপুটে
হাসি উঠে ভরিয়া !

কখন সারারাত
ধরি' হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে
কেশপাশে মরিয়া !"

অর্থাৎ তিনি তিনের অধিক অক্ষারান্বিত ক্রিয়াপদের মূল ধাতু হইতে আরম্ভ করেন। প্রত্যয়গুলি যে সমান হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। উপরি উদ্ধৃত কবিতার শেষ চরণে 'বেশবাসের' সঙ্গে 'কেশপাশে'র মিল দেওয়া হইয়াছে—এইরূপ মিল বড় মিষ্ট, অর্থাৎ মিল একটি শব্দেই আবদ্ধ নয়, পূর্ব্বের হইতেই আবদ্ধ। এরূপ সুন্দর মিল ভারতচন্দ্রেও পাওয়া যায়।……

যদিও ক্রিয়ার মিল সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর নিয়মের ব্যভিচার ভারতচন্দ্রে ভুরি ভুরি দৃষ্ট হয়, তথাপি এ বিষয়েও যে সেই পছন্দসই ছন্দ-রচয়িতার দৃষ্টি ছিল না তাহা নয়।…

কখন কখন মিলের শেষ শব্দদ্বয় এক হইয়া যায়, তখন পূর্ব্বশব্দের মিলই ধর্ত্তব্য ; যথা—

"তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মনো আশা দলে' যাই,

পাছে সে মোরে দেখে, চমকি বলে 'এ কে' ?
দুহাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।"

আবার কখন মিলদ্বয়ের একটি এক শব্দ। অপরটি দুই শব্দ ; কিন্তু এক শব্দের অংশগুলির প্রত্যেকের সঙ্গে মিলের অপর দুই শব্দের প্রত্যেকের সঙ্গে মিল পড়ে।

"মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কি বলে' আপনারে দেব তা'য়।"

কেহ কেহ বলিবেন এ সকল ত অনুপ্রাস যমকের দৃষ্টান্ত হইল। ঐ অলংকারগুলা যে আজকাল ভাষার অঙ্গে শোভা পায় না। তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি—

কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতানাম্।

যাহার আকৃতি মধুর তাহার সকলই অলংকার। যে রচনা আন্তরিক কবিত্বপূর্ণা, তাহার গাত্রে দুই একখানি অলংকার দিলে সৌন্দর্য বাড়ে বই কমে না।

যাহা হউক, মিলের কথা এখন শেষ করিতে হইবে। এইরূপ ডবল মিল ইংরাজি ভাষায় বিশেষরূপ প্রচলিত। কিন্তু এইরূপ মিল তখনই বেশি মিষ্ট লাগে, যখন পূর্ব্বভাগের শেষ অনুনাসিক বর্ণে হইয়া পরের ভাগের কোন ব্যঞ্জন বর্ণে ঝংকার দিয়া উঠে। যথা—

"Now, who could be neater
Or brighter, or sweeter,
Or who hum a song so
deligtfully low,
Or who look so slender,
So graceful, so tender
As Nancy, my Nancy, while kneading the dough ?"

এই কবিতার neater এবং sweeter অপেক্ষা slender এবং tender পদদ্বয়ের মিল বেশি মধুর। বাংলায় যথা—

“করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন
বসন খোল
দে দোল দোল।” (রবি)

ছন্দ ও মিলের খুঁটিনাটি

ভারতী, মাঘ। ১৩০৮ পৃঃ ৮৯৯-৯১০

কবিতার ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে কার্ত্তিকের “ভারতী”তে রবীন্দ্রবাবু প্রমুখ কবিগণের রচনা আলোচনার যে ক্ষীণ চেষ্টা করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান কয়েক পৃষ্ঠা তাহারই পরিশিষ্ট। বলা বাহুল্য এ প্রবন্ধেও প্রধানতঃ রবীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ হইতেই উদাহরণ সংগৃহীত হইবে।

যদি একাক্ষর বিশিষ্ট পদদ্বয়ের মিল দেওয়া যায়, তবে তাহাদের গুরু উচ্চারণ ধরিতে হইবে। এই মিল কখনো একজাতীয় ব্যঞ্জনে বদ্ধ, কখন বা স্বরসামঞ্জস্যেই পর্য্যবসিত হয়। যথা,—

১। কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ, কহিল “ওস্তাদজি,
গানের মত গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে ছি!”

২। সেদিন বরষা ঝর ঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী—
“রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়,
রচিতেছ বসি’ পুঁথি বড় বড়,
মাথার উপরে বাড়ি পড় পড়
তার খোঁজ রাখ কি!”

যেমন এক প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের মিল মূল ধাতু হইতে আরব্ধ হইলেই শুনিতে সুমধুর হয়, তেমনি বিশেষ্য পদের বিভক্তি মিলের সঙ্গে অন্ততঃ একটি অন্ত্যবর্ণের মিল থাকা চাই, নতুবা একটু

শ্রুতিকটু ঠেকিতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর এইরূপ মিলের প্রতিও বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যথা—

১। ……করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদ মন্ত্রের
স্ফীত কবি' স্রোতবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা তরঙ্গিণী সম!

২। তোদের মতন নহি নিমেষের,
আমি এ নিখিলে চির দিবসের,
বৃষ্টি বাদল ঝড় বাতাসের না রাখি ভয়!

বাংলায় অনেক শব্দই হসন্ত। কিন্তু পদ্যে সেগুলির উচ্চারণের কোন বাঁধাবাঁধির নিয়ম নাই—কখন স্বরান্ত, কখন বা হসন্ত উচ্চারিত হয়, যখন হসন্ত রূপে পঠিত হইবে, তখন পদ্যে পূর্ব্ববর্ণের গুরু উচ্চারণ ধরিতে হয়। এবং গণনায় হসন্তটি বাদ দিতে হয়,—অর্থাৎ হসন্তটি পরবর্ণের সহিত সংযুক্ত এইরূপ মনে করিতে হইবে; তাহা হইলেই সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্বাক্ষর গুরু হওয়ার নিয়ম আসিয়া পড়িল। কার্ত্তিক মাসের ভারতী দ্রষ্টব্য। ৬৭৩ পৃঃ ১৫শ পংক্তিতে তিনের অধিক" স্থলে "দুয়ের অধিক" পাঠ করিতে হইবে। নচেৎ উচ্চারণের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া গণনায় হসন্তটি এক অক্ষর ধরিলেই চলে।

"মুখর নূপুর। ৬। বাজিছে সুদূর / আকাশে
অলক্ গন্ধ / উড়িছে মন্দ / বাতাসে,
মধুর্ নৃত্যে / নিখিল চিত্তে / বিকাশে—
কত মঞ্জুল / রাগিণী!"

এই কবিতায় দেখা যাইতেছে যে ঊর্দ্ধ-রেখ বর্ণগুলির উচ্চারণ গুরু—কেননা পরবর্ণগুলি হসন্ত। যদি 'মুখর', 'অলক' ও 'মধুর' শব্দ তিনটির অকারান্ত উচ্চারণ করা যায়, তবে 'খ' 'ল' ও 'র' যে গুরু হয় না তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর 'নিখিল' ও 'মঞ্জুল' শব্দ দুটির

'ল' এ স্থলে অকারান্ত উচ্চারিত হওয়াই ভাল বোধ হয় এবং যেগুলি খাঁটি যুক্ত বর্ণ, তাহাদের পূর্ব্বাক্ষরগুলি যে গুরু তাহা জানা আছে বলিয়াই উল্লিখিত পদ্যে সেগুলি চিহ্নিত হইল না।

কিন্তু মাত্রামিত* পদ্য পংক্তির শেষের হসন্ত সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। পংক্তি শেষের হসন্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু উচ্চারিত হইলেও সংখ্যায় কখন কখন দুই অক্ষরের সমান ধরা হয় না—অর্থাৎ হসন্তটি সেখানে অধিকন্তু ন দোষায়। যথা—

"একদা এলো চুলে কোন ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া!
জ্যোছনা অনিমিখ চারিদিক সুবিজ (ন্),
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া॥
দখিণ বায়ু ভরে থর থরে কাঁপে ব (ন্),
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া!"

এই কবিতার তৃতীয় ও ষষ্ঠ চরণের শেষস্থ 'ন' হসন্ত—সুতরাং পূর্ব্ব বর্ণ ঈষৎ দীর্ঘ উচ্চারিত হইবে, তথাপি 'সুবিজন' = ৩ অক্ষর, এবং 'কাঁপে বন' = ৩ অক্ষর জ্ঞান করিতে হইবে, নতুবা কবিতাটির পংক্তি শেষ শব্দ প্রয়োগে ক্রমভঙ্গ দোষ ঘটে। অর্থাৎ এ স্থলে শেষ হসন্ত মিলের সহায়তা করিতেছে মাত্র, গণনায় স্থান পাইতেছে না।

"ক্ষণিক মিলন" নামক এই রচনাটির আলোচনায় আমরা আরও একটি বিষয় জানিতে পারি। পংক্তিগুলির প্রথম ও শেষ শব্দসকল তিন অক্ষর বিশিষ্ট বা তিন অক্ষরের সমান—কিন্তু শেষের শব্দগুলির তৃতীয় অক্ষর সর্ব্বত্র স্বরান্ত, আর প্রথম শব্দগুলি বিকল্পে স্বরান্ত। ঐ কবিতার মধ্যস্থ অপর দুইটি চরণ লইয়া এই মন্তব্য স্পষ্টীকৃত করা যাইতেছে।—

*গুরু-লঘু উচ্চারণ ভেদে লিখিত কবিতাকে এই প্রবন্ধে মাত্রামিত পদ্য বলা যাইবে।

শবদ নাহি আর চারিধার প্রাণহী(ন্)
কেবল্ ধুক ধুক করে বুক নিশি দি(ন্)

এখানে দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম শব্দ 'কেবল' হসন্ত উচ্চারিত করিয়া 'ব' গুরু; সুতরাং শব্দটি তিন অক্ষর। ইহা দুই রকমে ধরা যায়—'ল' গণনায় বাদ দিয়া 'কে'=এক মাত্রা, 'ব'=দুই মাত্রা, এই তিন মাত্রা; অথবা সাধারণ নিয়মে কে১+ব১+ল১=৩। আবার 'শবদ' এই পদ যে তিন অক্ষর বিশিষ্ট তাহা হসন্ত উচ্চারিত হইতেছে না বলিয়া সহজেই বুঝা যায়; "শব্দ" এইরূপ যুক্ত করিয়া লিখিলেও তিন অক্ষর বলা হইত, কেননা কবিতাটি মাত্রামিত; তবে কোমল মধুর খেদের ধ্বনি বলিয়া যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয় নাই। পংক্তি শেষের শব্দগুলি তিন অক্ষরেরই হউক, আর চারি অক্ষরেরই হউক সংখ্যায় সর্ব্বত্র তিন অক্ষরের সমান ধরা হইয়াছে, সুতরাং চতুর্থ অক্ষর থাকিলে সেটি হসন্তই থাকিবে, তৃতীয় অক্ষর হসন্ত হইয়া সমষ্টিতে তিন অক্ষরের সমান ধরা হয় নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রবাবু কোন কোন স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক চরণ শেষ শব্দ প্রয়োগে মাত্রাসম পদ্যেও অক্ষর সংখ্যা রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এবং সে স্থল শুনিতে মন্দ হয় নাই। যথা—

"কোথা ব্রজবালা কোথা বনমালা
কোথা বনমালী হরি
কোথা হা হন্ত চির বসন্ত
আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত
বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ,
আমি একা ঘরে, ব্যাধি খর শরে
ভরিল সকল অঙ্গ।"

এই কবিতার দ্বিতীয় কিম্বা চতুর্থ পংক্তি আট অক্ষরের সমান,

কিন্তু ষষ্ঠ ও অষ্টম পংক্তি নয় অক্ষরের সমান হইয়াছে—অর্থাৎ "ভঙ্গ" ও "অঙ্গ" প্রত্যেকে মাত্রা হিসাবে তিন অক্ষরের সমান হওয়ায় ক্রম ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং অক্ষর গণনায় দুই অক্ষরের সমান ধরিতে হইবে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে মাত্রামিত কবিতায় চরণের শেষ বর্ণের স্বরান্ত কি হসন্ত প্রয়োগ কবিদের ইচ্ছাধীন, এবং তাহা দোষাবহও নহে। কেবল মিলটি সুন্দর হওয়া চাই, আর ঝঙ্কারের কোন গোলযোগ না থাকে।

কিন্তু বঙ্গভাষায় হসন্তের চিহ্ন প্রায়ই থাকে না; উচ্চারণও প্রায়শঃ ইচ্ছায়ত্ত—কখন অকারান্ত, কখন হসন্ত; সুতরাং মাত্রা গণনায় হসন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার পূর্ব্ববর্ণের গুরুত্ব না ধরাই সুবিধা। এ সম্বন্ধে এতটা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মাত্রামিত কবিতায় বিশুদ্ধ যুক্তবর্ণের পূর্ব্বাক্ষর অনুস্বার বিসর্গযুক্ত বর্ণ, আর ঐ-কার এবং ঔ-কার ছাড়া অন্যান্য হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরও যে অনেক সময় গুরুগৃহে স্থান পায় তাহাই প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু উচ্চারণের উচ্চাবচতা ও মিলের সামঞ্জস্য বিষয়ে কর্ণ নামক যন্ত্রটাই উৎকৃষ্ট উপদেষ্টা সন্দেহ নাই।

মাত্রামিত কবিতায় যতি কোথায় কোথায় পতিত হইবে তাহা জানিতে পারিলেই কবিতার সুমিষ্ট পাঠ আয়ত্ত করা যায়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া শ্লোকমধ্যস্থ প্রথম যতি স্থল নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রথম পতিত যতির পর হইতে অবশিষ্ট বর্ণ সমষ্টির ন্যূনাধিক্যে, এবং তন্মধ্যে পতিত বিরামের বিভিন্নতায় কবিতায় নানা ছন্দোবৈচিত্র্য প্রকাশ পাইতে পারে। নিম্নে কতিপয় মাত্রামিত কবিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যতিস্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পাঠের রীতি প্রদর্শিত হইল—বলা বাহুল্য, যতি কোথায় কতক্ষণ স্থায়ী হইবে তাহা সর্ব্বত্র দেওয়া সুকঠিন; কেবল এইমাত্র বলা যায় যে, বিরামস্থল

হসন্তের পর হইলে পূর্ব্ববর্ণটি একটু বেশী টানিয়া পাঠ করিতে হয়। কিন্তু ক্ষিপ্র গতি বাঞ্ছনীয় হইলে তাহাও আবশ্যক হয় না। এখানে আরও একটু পার্থক্য ধর্ত্তব্য—"দীর্ঘ" ও "গুরু" উচ্চারণের মধ্যে একটু যেন ভেদ আছে বলিয়া বোধ হয়, যদি শব্দ দুইটি প্রায়শঃ এক পর্য্যায়ে ব্যবহৃত হয়; যথা "দীর্ঘ" এই শব্দের "দী" দীর্ঘও বটে গুরুও বটে; কিন্তু "ধন্য" এই শব্দের "ধ" গুরু কিনা "জোর" দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

আবার হসন্তের পূর্ব্ববর্ণের গুরুত্ব এতদুভয় হইতেই ভিন্ন। উহা দীর্ঘস্বর হইলে দস্তুরমত "দীর্ঘ", হ্রস্বস্বর হইলে কখন ঈষৎ "দীর্ঘ", কখন ঈষৎ "গুরু"; যাহা হউক এখন দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

"রাজার ছেলে যেত / ৭ / পাঠশালায় / ৫
রাজার মেয়ে / ৫ / যেত তথা / ৪
দুজনে দেখা হতো / পথের মাঝে
কে জানে কবে / কার কথা।
রাজার মেয়ে দূরে / ৭ / সরে যেত / ৪
চুলের ফুল তার / পড়ে যেত,
রাজার ছেলে এসে / তুলে দিত
ফুলের সাথে / বনলতা।"

"(তবে) পরাণে ভালবাসা / ৭ / কেন গো দিলে / ৫
রূপ না দিলে যদি / ৭ / বিধি হে / ৩"

"খাঁচার পাখী ছিল / ৭ / সোনার খাঁচাটিতে / ৭
বনের পাখী / ৫ / ছিল বনে / ৪"

"ভূর্জ্জপাতে/৫/কাজলমসী দিয়া /৭
লিখিয়া দিনু/আপন নামধাম/

লিখিনু "অয়ি/ নিদ্রা নিমগনা,
আমার প্রাণ/তোমারে সঁপিলাম !"

"(শুধু) ফুটন্ত ফুল/৬/মাঝে/২
দেবি, তোমার চরণ/সাজে,
অভাব কঠিন/মলিন মর্ত্ত্য/কোমল চরণে/বাজে !
(অথবা)
অভাব কঠিন মলিন মর্ত্ত্য/কোমল চরণে বাজে !"

এইরূপ চরণ শেষ শব্দে কিঞ্চিৎ জোর দিয়া মিলের প্রতি লক্ষ্য রাখা ব্যঙ্গ-কবিতায় সুন্দর হয় ; যথা –

১) ওই শোন ভাই--বিশু,
পথে শুনি "জয়—যিশু !"
কেমনে এ নাম/করিব সহ্য/আমরা আর্য্য-শিশু।

২) প্রথম শীতের– মাসে
শিশির পড়েছে···ঘাসে,
হু হু করে বায়ু···আসে,
হি-হি করে কাঁপে – গাত্র !

"ইহার চেয়ে / হতেম যদি / ১০ / আরব বেদু-য়িন্ / ৭
চরণ তলে / বিশাল মরু / দিগন্তে বি-লীন !
ছুটেছে ঘোড়া / উড়েছে বালি / জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয় তলে / বহ্নি জ্বালি / চলেছি নিশি-দিন !"
(অথবা ধীরে)
"বধূরা দেখ/আইল ঘাটে/১০/এল না ছায়া···তবু/৭/
কলস ঘায়ে/উর্ম্মি টুটে/রশ্মি রাশি/চূর্ণি উঠে ,
শান্ত বায়ু/প্রান্ত নীর/চুম্বি যায় কভু।"

আর এক জাতীয় কবিতা আছে তাহা সুরদ্বারা নিয়মিত ও পঠিত

হয়। তাহাদের মধ্যে হসন্ত বর্ণ কখন ধরিতে কখন ছাড়িতে হয়—আবার যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ গুরু উচ্চারিত হইলেও কখন কখন তাহার দ্বিত্ব ধরা হয় না, কখন বা লঘু-স্বরও টানিয়া পাঠ করিতে হয়। যথা—

"দিনের আলো/৫/নিবে এল,/৪/সূর্য্যি ডোবে···ডোবে,
আকাশ ঘিরে/মেঘ জুটেছে/চাঁদের লোভে···লোভে!
মেঘের উপর/মেঘ করেছে/রঙের উপর·· রঙ্।
মন্দিরেতে/কাঁসরঘণ্টা/বাজ্‌ল ঠং ঠং!"

"মনে পড়ে/৪/সেই আষাঢ়ে/৫/
ছেলেবেলা/৪/
নালার জলে/৫/ভাসিয়ে ছিলেম/৬/
পাতার ভেলা৫/
বৃষ্টি পড়ে/৫/দিবস রাতি/৫/
ছিলনা কেউ খেলার সাথী
একলা বসে' পেতেছিলেম
সাধের খেলা।
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা!"

এই দুটি কবিতাংশে দেখা যাইতেছে যে যদি কোথাও ৪, কোথাও ৫, কোথাও বা ৬ অক্ষরের পরে পড়িতেছে—কিন্তু সর্ব্বত্রই সুরটি এমন ভাবে আদায় করিতে হইতেছে যেন বিরামপূর্ব্ব অক্ষর সমূহ ৫ অক্ষরের সমান; প্রথম উদ্ধৃত কবিতায় কেবল চরণ শেষে দুইটি বর্ণ বেশী আছে।

মিলকে ছন্দের সামিল করিয়া প্রবন্ধ আরব্ধ হইয়াছে, সুতরাং মিল সম্বন্ধে কিছু খুঁটিনাটি বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কিন্তু এই অবসরে আর একটি কবিতার আবৃত্তি করিয়া লই—

"এই যৌবন যত রাখিব বাঁধিয়া
মরিব কাঁদিয়া রে,
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব,
সাধিয়া সাধিয়ারে !
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি
কার দরশন যাচি রে,
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
তাই আমি বসে আছি রে !
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া !"

এই কবিতায় মিলগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, দ = ধ, চ = ছ, ক = গ এইরূপ মিলিয়াছে, অর্থাৎ বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এবং প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ মিলিত হইয়াছে। এইরূপ মিল সম্পূর্ণ সুসঙ্গত না হইলেও, বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাতে দোষ দেখা যায় না। বাঙ্গলায় প্রত্যেক বর্গের প্রথম চারিটি বর্ণে পরস্পর অল্প বিস্তর মিল আছে, যদিও তাহার মধ্যে প্রথম-দ্বিতীয়ে, কিংবা তৃতায় চতুর্থে যতটা, প্রথম-তৃতীয়ে কিংবা দ্বিতীয়-চতুর্থে ততটা নয়। আবার কখন কখন প্রথম ও তৃতীয়ের এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থের মিলনেই অধিকতর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। অনুনাসিক বর্ণগুলি এবং অনুস্বরও পরস্পর মিলে। ফলতঃ উচ্চারণসাম্য হইলেই কখন ভিন্নজাতীয় ব্যঞ্জনে, কখন বা স্বরে ব্যঞ্জনেও মিলিয়া যাইতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।—

ন=ম।

"মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান
রাখিবে না মোহ গর্ত্তে।"

য়=হ=ও

"রূপ না দিলে যদি বিধি হে ;
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে।"

(ইত্যাদি)

য়=ই।

"আমি যে আপনারে ফুটাতে পারি নাই
পরাণ কেঁদে তাই মরিছে।"

ষ্ণ=ষ্ট=ষ্ঠ

"নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা,
নিত্য নূতন কর্ম্ম নিষ্ঠা,
জীবন গ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা
উলটিয়া যাব ত্বরিতে।"

উচ্চারণসাম্য থাকিলে, ঐ এবং ঔ ছাড়া অন্যান্য স্বরবর্ণও পরস্পর সঙ্গত হইতে পারে। অ=আ, অ=উ, অ=এ, অ=ও, ও=উ ইত্যাদি মিল কখন কখন পাওয়া যায়। সেগুলি কবিগণের—অন্ততঃ রবীন্দ্রবাবুর অক্ষমতা বশতঃ নহে, পরন্ত বৈচিত্র্য সাধনের জন্য এবং অপরাপর ব্যঞ্জন ও স্বরের উৎকৃষ্ট মিল থাকিলেই ব্যবহৃত হয়। অন্যথা অনেক স্থলেই "গরমিল" বলিয়া গণ্য। যথা—

"—ফুরিয়ে গেল 'প্রমায়',
আর কিছু করিবারে পাইনি ক' সময়!"

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

"ওই বাঁশি স্বর তার আসে বার বার
সেই শুধু কেন আসে না,

এই হৃদয় আসন শূন্য পড়ে' থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা !"

"দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
'হাঁগো এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে',
তাহারে শুধানু হেসে' যেমনি—
অমনি কথা না বলি, ভরা ঘট ছল ছলি
নত মুখে গেল চলি তরুণী।"

"তবু আসি আমি পাষাণ হৃদয়
বড় কঠোর !
ঘুমাও ঘুমাও আঁখি ঢুলে আসে
ঘুমে কাতর !"

এইরূপ উচ্চারণসাম্য বহুস্থলেই হইতে পারে, সকলের উদাহরণ দেওয়া একরূপ অসম্ভব। ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষায় এত বৈচিত্র্য প্রবেশ করাইতেছেন যে, তিনি কোকিলের "কুহুধ্বনি"তে মুগ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরাও তাঁহার নূতন ছন্দের ভঙ্গীতে ও নব নব শব্দের সঙ্গীতে মোহিত হইয়া তাঁহার কবিতার উদ্দেশে বলিতে পারি—

যেন কে বসিয়া আছে   বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী   সঙ্গীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি'।
সুকুমার কর্ণে তার   ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশাথে ;
জটিল সে ঝঞ্চনায়   বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্য্যের সরল সঙ্গীতে !

বাংলা শব্দের দ্বিরুক্তি

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ (পৃঃ ২০৪-২০৯)

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিত বঙ্গভাষার শব্দদ্বৈত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল সা.প.প. :ম সংখ্যা ১৩০৭, বিগত ফাল্গুন মাসের 'প্রদীপে' তাহার একটি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদের মনে যে কয়েকটি কথার উদয় হইল, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি— ইহা উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের কোনটিরই সম্যক সমালোচনা নহে।

রবিবাবু লিখিয়াছেন যে. 'চার-চার', 'তিন-তিন', এ সকল স্থলে দ্বিত্ব প্রকর্ষবাচক। "'চার-চার' পেয়াদা আসিয়া হাজির—অর্থাৎ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।" প্রদীপের সমালোকে মহাশয় বলেন, এই স্থলের দ্বিত্ব "বিভক্ত বহুলতা" জ্ঞাপক—distributive। অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য এবং প্রতিবারের জন্য চার-চার পেয়াদা আসিয়া হাজির; যথা—"তাহাদিগকে ধরিয়া দেওয়ার জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির; অথবা যখনি কোন ছাত্র অনুপস্থিত হইত, তখনি গুরু মহাশয়ের আদেশ অনুসারে চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির হইত। যেখানে একজন লোক ও একবার মাত্র বুঝায়, সেখানে "চার-চার পেয়াদা হাজির" এইরূপ বলা যায় না। ফলতঃ "চার-চার পেয়াদা" অর্থ "ইহার জন্য চার, উহার জন্য চার" অথবা এবারে চার, সেবারে চার।"

আমাদের মতে উদাহরণ অনুসারে উভয় অর্থই সঙ্গত। রবিবাবুর অর্থে একটু "বিস্ময়ের" ভাব নিহিত আছে; আর প্রদীপের সমালোচক মহাশয় উহা সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। রবিবাবুর উদাহরণটি একটু বিস্তৃতভাবে বলিলেই অর্থটি হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে; যথা—"একটা লোক ধরিতে চার-চার পেয়াদা হাজির, ব্যাপারখানা কি! এস্থলে 'একজন' লোক ও 'একবার' মাত্র বুঝিতে আপত্তি কি?

রবিবাবু লিখিয়াছেন, "সকাল-সকাল" প্রকর্ষভাব ব্যক্ত করিতেছে অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে, দ্রুতরূপে সকাল বুঝাইতেছে। সমালোচক মহাশয় এখানে "বিভক্ত বহুলতা" অর্থ করেন, অর্থাৎ প্রতিবারে সকাল সকাল। "রোজ সকাল সকাল উঠিবে" অর্থাৎ প্রতিবারে সকাল সকাল উঠিবে। এইরূপ "তোমরা কাল সকাল সকাল উঠিও —অর্থাৎ প্রত্যেকে সকাল সকাল উঠিও। একজন ও একবারের বেলা—"সকাল সকাল" উঠিবে বলা যায় না।"

প্রদীপ সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আমাদেরও জিজ্ঞাস্য –"আমি আজ সকাল সকাল আফিসে যাইব মনে করিতেছি" —এখানে সমালোচক মহাশয় কিরূপ অর্থ করিবেন? অথবা "তুমি কাল একটু সকাল-সকাল উঠিয়ো" এখানকার অর্থই বা কি? এই দুই স্থলেই তো একজন ও একবারের বেলা 'সকাল-সকাল' বলা যাইতে পারে! সমালোচক মহাশয় উদাহরণের পূর্ব্বে "রোজ" ও "তোমরা" এই দুইটি পদ বসাইয়া দিয়াই তো নিজের অর্থ সমর্থন করিতেছেন, নয়? আমাদের মতে দৃষ্টান্ত-অনুসারে উভয় অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অধিকন্তু আমরা ইহার আর একটি অর্থ খাড়া করিতে চাই—"নির্দ্দিষ্ট বা অভ্যস্ত সময়ের পূর্ব্বে"। "সকাল সকাল উঠিবে" কি না 'নির্দ্দিষ্ট বা অভ্যস্ত সময়ের পূর্ব্বে উঠিবে। 'আমি আজ সকাল সকাল আফিসে যাইব' কি না 'অভ্যস্ত সময়ের পূর্ব্বেই যাইব।'

রবিবাবু লিখিয়াছেন, "গরম-গরম" শব্দে দ্বিত্ব প্রকর্ষবাচক। তাঁহার মতে "গরম-গরম" "জল খাইবে", ইহার অর্থ 'খুব গরম জল খাইবে'। সমালোচকের মতে উহার অর্থ—প্রতিবারে গরম জল খাইবে, অর্থাৎ যখন জল খাইবে, গরম জল খাইবে; অথবা প্রত্যেকে গরম জল খাইবে। কেবলমাত্র একজন ও একবারের বেলা "গরম গরম" জল খাইবে এরূপ বলা যায় না। ফলতঃ গরম গরম শব্দে দ্বিত্ব পূর্ব্বের ন্যায় "বিভক্ত বহুলতা" জ্ঞাপক। আমাদের বিবেচনায় প্রকর্ষ

অর্থও সঙ্গত বোধ হয়, যদিও 'খুব' এই শব্দটির প্রয়োগে আপত্তি আছে ; এবং বিভক্ত বহুলতা অর্থও টানিয়া আনা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া আমরা উহার এইরূপ অর্থ করি—"গরম থাকতে থাকতে" "যাহা গরমই বটে" "যতক্ষণ ব্যাপিয়া গরমত্ব থাকে।" এইরূপ অর্থে পূর্ব্ববৎ একটু তুলনার ভাবও অনেক স্থলে থাকিতে পারে, অর্থাৎ "যাহা অভ্যস্ত তাহার তুলনায় গরম" যথা—"গরম গরম ভাত, চারটি খাওনা" একথা তিনিই বলিতে পারেন যিনি আলস্য ত্যাগ করিয়া কোন দিন নিজে রাত্রে রাঁধেন। অথবা "আমায় একখানা গরম-গরম লুচি দাও" একথা তখনি বলা যায় যখন ক্ষুধা দেবী পাতের ঠাণ্ডা লুচিগুলো উদরসাৎ করিয়াও স্বয়ং ঠাণ্ডা হন নাই।

যদিও দৃষ্টান্ত অনুসারে বিভক্ত বহুলতা অর্থও করা যায়, তথাপি কেবল দ্বিত্ব দ্বারা তাহা সুব্যক্ত হইতেছে না – 'রোজ' শব্দ দ্বারা অথবা বহুবচনা প্রয়োগেই হইতেছে। পরন্তু 'গরম গরম' বিশেষণ গুণবাচক, ইহাকে সংখ্যাবাচক স্বরূপে গ্রহণ করা উচিত হয় না। ফলতঃ আংশিকরূপে উদাহরণগুলির উল্লেখে, উভয় প্রবন্ধ লেখকই কিঞ্চিৎ গোলে পতিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

তারপর 'ঘোড়া ঘোড়া' খেলা, 'চোর চোর' খেলা, এ সব স্থলে রবিবাবু "ঈষদূনতা" অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে—'ঘোড়া ঘোড়া' খেলা অর্থে সত্যকার ঘোড়া নহে, তাহারি নকল করিয়া খেলা। সমালোচকের মতে উহার অর্থ—"একবার তুমি ঘোড়া, আর একবার আমি ঘোড়া, এইরূপ পরস্পর ঘোড়া হইয়া খেলা।" রবিবাবুর অর্থই ঠিক হউক, অথবা সমালোচক মহাশয়ের অর্থ ই ঠিক হউক, যাহারা ঐ খেলা খেলে তাহারা অনেক সময়ে সমালোচনার চিন্তামাত্র না করিয়া, কখন সকলেই ঘোড়া হইয়া দৌড়ায়, কখন কণ্টকপত্র বিরহিত ছেদিত খর্জ্জুরশাখাকে ঘোড়া বানাইয়া সকলেই তদুপরি সোয়ার হয়। সুতরাং দ্বিত্ব দ্বারা সকল সময় "পর্য্যায়ক্রম" অর্থ খাটে না – রবিবাবুর

"অনুকরণ" অর্থেই ঘোড়া-ঘোড়া খেলার কিছু সুবিধা হইতে পারে।

এইরূপে দেখা যায় যে শব্দদ্বৈতের অর্থ লিখিতে গেলে একটি বিশেষক্রম অবলম্বন করিতে হয়। হয়, একপ্রকার দ্বিরুক্তি শব্দের যত প্রকার বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে তাহা একত্রে সংগৃহীত হউক, নয়তো দ্বৈতের অর্থগুলিই পূর্ব্বে প্রদান করিয়া পরে ক্রমান্বয়ে উদাহরণ প্রদত্ত হউক। নচেৎ আংশিকরূপে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাহার অর্থ লিখিতে গেলে বিষয়টি গুরুতর হইয়া পড়ে। আমরা প্রথমোক্ত প্রকারের কতগুলি উদাহরণ এ স্থলে প্রদান করিতে চাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অর্থের "নামকরণ" সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লই। প্রবন্ধ লেখকদ্বয় "বিভক্ত বহুলতা" বা "কর্ত্ত বহুলতা প্রভৃতি যে সকল শব্দ উদ্ভাবন করিয়া শব্দদ্বৈতের অর্থ লিখিয়াছেন, সেগুলি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ ঠেকে। সংস্কৃতের বীপ্সা* বা বাঙ্গালায় "যুগপৎ ব্যাপ্তির ইচ্ছাতেই এইরূপ অনেক অর্থ স্পষ্টতররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আরও, সংস্কৃত ব্যাকরণে বলে —

বিবাদে বিস্ময়ে হর্ষে খেদে দৈন্যাবধারণে।
প্রমাদনে সম্ভ্রমে চ দ্বিস্ত্রিরুক্তি র্ন দুষ্যতি ॥

সুতরাং এই সকল নাম দিয়াও অনেক স্থলে বাঙ্গলা শব্দদ্বৈতের অর্থ লিখিলে ভাল হয়। যাহা হউক যে উদাহরণ দিতে চাহিয়াছিলাম তাহা দিতেছি—যে অর্থে সমালোচ্য প্রবন্ধে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা চিহ্নিত হইল।—

চোখে চোখে। ১) চোখে চোখে সদা রেখে, চোখে চোখে সদা থেকে"। ২) আজকাল ছেলেদের "চোখে চোখে" চশমা। ৩) সে আমার "চোখে চোখে" তাকাইতে পারে না। ৪) নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।

মুখে মুখে। ১) মুখে মুখে সংবাদটি রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে।

*দ্রব্যগুণ ক্রিয়া-ভির্যুগপৎ ব্যাপ্তুমিচ্ছা-বীপ্সা।

২) আজকাল "মুখে মুখে" কেবল বুয়র যুদ্ধের কথা। ৩) তুমি এই কবিতাটি মুখে মুখে বলিতে পার? ৪) বালকগণ "মুখে মুখে" পরীক্ষা দিল। ৫) বে-আদব "মুখে মুখে" উত্তর দিস।

মুখোমুখি। ১। **মুখোমুখি** ছেড়ে' শেষে হাতাহাতি হলো। ২। "দুজনে **মুখোমুখি** গভীর দুখে দুখী।"

হাতে হাতে। ১। **হাতে হাতে** ব্যাগটি চলিয়া গেল। ২। **হাতে হাতে** লইলে মাশুল লাগে না। ৩। **হাতে হাতে** ইহার ফল পাইবে। ৪। সন্দেশ ছেলেদের **হাতে হাতে** না দিয়া পাতে পাতে দাও। ৫। "ভয়ে ভয়ে, **হাতে হাতে** বেঁধে বেঁধে চলি, ছাড়া পেলে কে-আর কাহার!"

প্রাণে প্রাণে। ১। উভয়ের **প্রাণে প্রাণে** মিল। ২। আমি **প্রাণে প্রাণে** বাঁচিয়া আছি।

পরে পরে। **পরে পরে** আর কত সাহায্য করিবে! (পরেরা) ২। তোমরা **পরে পরে** চলিয়া যাও। (ক্রমান্বয়ে)

নিজে নিজে। ১। **নিজে নিজে** কি বকৃচ? ২। সে **নিজে নিজে** আঁক কসিতে পারে।

একৃলা একৃলা। ১। **একৃলা একৃলা** ভাল লাগে না। (সর্ব্বদা) ২। **একৃলা একৃলা** কোথা যাচ্ছ? (নিতান্ত একেলা)

ঘরে ঘরে। ১। তোমরা ঘরে ঘরে বিবাদ কর কেন? (সমঘরে) ২। **ঘরে ঘরে** জ্বর। (যুগপৎ ব্যাপ্তি)

পাকাপাকা। ১। **পাকাপাকা** ফল দাও (যে ফলগুলি পাকা) ২। ফলটি **পাকাপাকা** হয়েছে (পক্কোমুখ)

রাতারাতি। ১। **রাতারাতি** বড়মানুষ। (এক রাত্রিতেই) ২। সে **রাতারাতি** আসাযাওয়া করে। (দিবাভাগে করে না)

দেখিতে দেখিতে। ১। **দেখিতে দেখিতে** সব ফুরাইল। (হ্রস্বসময়ে) ২। **দেখিতে দেখিতে** যাইতেছে। (যুগপৎ ব্যাপ্তি)

সে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে !—ইত্যাদি ইত্যাদি

আমরা এমন বলিতেছিনা যে, এইরূপ ক্রমই উৎকৃষ্ট অথবা এই দুই ক্রম ছাড়া অন্য পর্য্যায়ে উদাহরণ দেওয়া যায় না। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া অনুসারেও দৃষ্টান্তসহ দ্বিরুক্ত শব্দের অর্থ লেখা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, আমরা একজাতীয় দিরুক্ত শব্দের যে সকল উদাহরণ দিলাম, তাহা অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, উদাহরণে প্রাদেশিকতাও যে নাই তাহাও বলিতে পারি না। ফলতঃ সমালোচ্য প্রবন্ধে যে ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে—তাহা অপেক্ষা আমাদের প্রদর্শিত ক্রমই অধিকতর সুবিধাজনক বোধ হইল বলিয়া এ স্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম।*

---

*বাংলা শব্দের দ্বিরুক্তি আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় বঙ্গদর্শন সম্পাদ 'শব্দদ্বৈত' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন। ফাল্গুন মাসের প্রদীপে তাহার একটি সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী এই সমালোচনা অবলম্বন করিয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মূল প্রবন্ধ লেখকের নিকট এই আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া বলিতে গেলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সীমা লঙ্ঘন করিবে। কেবল একটা উদাহরণ লইয়া আমাদের বক্তব্যের আভাস মাত্র দিব। –আমরা বলিয়াছিলাম, 'চার চার' 'তিন তিন' প্রকর্ষবাচক। অর্থাৎ যখন বলি 'চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির' তখন একেবারে চার পেয়াদা আসায় বাহুল্য জনিত বিস্ময় প্রকাশ করি। প্রদীপের সমালোচক মহাশয় বলেন, এই স্থলের দ্বিত্ব বিভক্ত-বহুলতা-জ্ঞাপক। অর্থাৎ যখন বলা হয়, 'তাহাদিগকে ধরিবার জন্য চার চার জন পেয়াদা আসিয়া হাজির' তখন সমালোচক মহাশয়ের মতে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য চার

চার পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত ইহাই বুঝায়। আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। বিহারীবাবুও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন, একজনের জন্যও 'চার চার পেয়াদা' বাংলা ভাষা অনুসারে আসিতে পারে। বিহারীবাবু বলেন, দৃষ্টান্ত অনুসারে দুই অর্থই সংগত হয়। অর্থাৎ প্রকর্ষ এবং বিভক্ত-বহুলতা, দুই-ই বুঝাইতে পারে। তাহা ঠিক নহে—প্রকর্ষই বুঝায়, সেই প্রকর্ষ একজনের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, সুতরাং উভয়বিধ প্রয়োগের মধ্যে প্রকর্ষ ভাবই সাধারণ।

(রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশখণ্ড)

বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দ

প্রদীপ, পৌষ ১৩০৯

কবিতার ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে আমরা ১৩০৭ সালের কার্ত্তিকের "ভারতী"তে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। ১৩০৮ সালের "সাহিত্যে" সেই আলোচনা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবিবাবুর রচনা ও আমাদের মন্তব্য সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইলেও উহা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উহার অধিকাংশ স্থলই ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া সাধারণ পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। তাই দুইচারিটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

আমরা বলিয়াছিলাম—কোন শব্দের আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দ একাক্ষর হইলে, সেই অক্ষরটি রবিবাবু গুরু ধরিয়া থাকেন, কিন্তু সেই শব্দটি একাধিক অক্ষরের হইলে তিনি তাহার শেষ বর্ণটিকে*গুরু ধরেন না। সমালোচক মহাশয়

*আমাদের লেখায় "আবশ্যক মত" এই শব্দদ্বয় ছিল, কিন্তু সমালোচক মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, ইহার আলোচনা যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

এই নিয়মটি মানিয়া লইয়া বলেন—কবির এই পার্থক্য করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কবি লিখিয়াছেন—

"কহিলাম আমি তুমি ভূস্বামী
ভূমির অন্ত নাই

তিনি লিখিতে চান,—

কহিলাম আমি হৃদয় স্বামী
ব'সহ হৃদয়াসনে।

কবি লিখিয়াছেন,—

স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম যোড় করে;

সমালোচক লিখিতে চান,—

স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রাতে
কহিলাম যোড় করে;

অর্থাৎ চিহ্নিত অক্ষরগুলির গুরু উচ্চারণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই পরিবর্ত্তিত ছত্র কয়টি কি কুৎসিত শুনাইতেছে? আমরা বলি,—হ্ঁা বড়ই খারাপ লাগিতেছে। ইহাতে ভাষার সরল সাধারণ স্বাভাবিক উচ্চারণ অনর্থক বিকৃত করা হইতেছে। কবিতা হইলেই যে ভাষার প্রকৃতির অনুসরণ না করিয়া কথায় কথায় ভিন্ন পথে চলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কবি লিখিয়াছেন,—

"ঘুমের দেশে/ভাঙিল ঘুম/উঠিল কল-স্বর(১৭)
গাছের শাখে জাগিল পাখী কুসুমে মধু-কর।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ জাগিল রাণী-মাতা,
কচালি আঁখি কুমার সাথে জাগিল রাজ-ভ্রাতা"।

এখানেও সমালোচক মহাশয়ের মতে, রবিবাবুর 'কলস্বর' ও 'রাজভ্রাতার' প্রত্যেকটিকেই চারি অক্ষর ধরা অন্যায় হইয়াছে। তিনি সংশোধন করিয়া এইরূপ পাঠ দিয়াছেন—

"ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর(১৮)
গাছের শাখে জাগিল পাখী কুসুমে মধুপবর।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ জাগিল রাণীর মাতা,
কচালি জাগি কুমার সাথে জাগিল রাজভ্রাতা।"

অর্থাৎ উর্দ্ধরেখ অক্ষরদ্বয়ের গুরু উচ্চারণ করিয়া প্রথম ও চতুর্থ ছত্রে এক একটি মাত্রা অধিক ধরিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রে পরিবর্ত্তিত ছন্দের অনুরোধে এক একটি অক্ষর অধিক বসাইয়া দিয়াছেন। এখানে আমাদের বক্তব্য, এইরূপ পরিবর্ত্তনে রবিবাবুর ছন্দের ক্ষিপ্র গতি ছত্রশেষে প্রতিহত হইতেছে। যাঁহাদের ছন্দের কান আছে তাঁহারা কবিতাটি পড়িতে আরম্ভ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে পঞ্চম অক্ষরে কিঞ্চিৎ থামিয়া দশম অক্ষরে কিছু বেশী আসিতে হইবে; পঞ্চদশ অক্ষরেও সামান্য একটু বিরাম আছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, শেষের দুই অক্ষর বাদ দিলে তৎপূর্ব্ব যতিস্থান ষোড়শ অক্ষরে অযথা নির্দ্দিষ্ট হইয়া কবির বাঞ্ছিত ছন্দটি বড়ই লাঞ্ছিত হইতেছে। তবে ইচ্ছা করিলে রবিবাবু ঐরূপ লিখিতে পারিতেন—কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাই তাঁহার হয় নাই। হইলেও তাঁহার "কলস্বর" ঠিক থাকিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু 'রাজভ্রাতা' যে "রাজার ভ্রাতা" হইতেন, তাহা নিশ্চিত।

অতঃপর সমালোচক মহাশয়, "কলধ্বনি", "শুভাগ্রহ", "পুরদ্বার" ইহাদিগের প্রত্যেকটিতেই নাকি রবিবাবু চারি অক্ষর ধরিয়াছেন, অথচ 'অনুগ্রহ' 'পুরস্কার' প্রভৃতি শব্দকে পাঁচ অক্ষর ধরিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর লিখিয়াছেন—রবিবাবুর মতে 'প্রতিধ্বনি' শব্দকে পাঁচ অক্ষর ধরা উচিত, কিন্তু 'সমস্ত' না থাকিয়া ব্যস্তভাবে 'প্রতিধ্বনি' চারি অক্ষর ধরা তাঁহার অভিমত। আমরা বলি, এ ঠিক কথাই বটে; এই দুই স্থলে উচ্চারণ ও অর্থ উভয়েরই পার্থক্য আছে।

লেখক মহাশয়ের 'কানে বা জ্ঞানে' এই দুই পার্থক্য ধরা পড়িল না কেন বলিতে পারি না। "কলধ্বনি", "শুভগ্রহ", ইত্যাদির চারি অক্ষর ধরা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা ক্রমে বলিতেছি—আগে তাঁহার উদাহরণগুলির একে একে অনুসরণ করা যাক—

"কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্ব্ব পুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।"

এখানে লেখক মহাশয় 'বেদব্যাস' শব্দের 'দ' এর গুরু উচ্চারণ সম্বন্ধে কবির কোন দোষ নাই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু 'মুনিব্যাস' লিখিলে রবিবাবু 'নি'র গুরু উচ্চারণ ধরিতেন না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। লেখকের মতে, এইরূপ বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি কবির পক্ষপাত (!) রাশি রাশি দৃষ্ট হয়। যথা—

হু হু করে' বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস!
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস।

এখানে 'জলোচ্ছ্বাস পাঁচ মাত্রা হইল, অথচ নিম্নের উদাহরণে তুল্যাবস্থ সন্ধি-সমাসবদ্ধ "মনোব্যাকুলতা" শব্দকে সাত মাত্রা না ধরিয়া কবি কেন ছয় অক্ষর ধরিলেন!—

"শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মুখের কথা
তারি তরে বহি চির জীবনের
চির মনোব্যাকুলতা।"

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শ্রীনিবাসবাবুর মনে হইয়াছে (ক) সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে 'রাজভ্রাতা' 'মনোদ্বার' প্রভৃতি শব্দের ন্যায়

একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট ভিন্ন শব্দ থাকিলে এবং উভয় শব্দের মধ্যে সন্ধি সমাস থাকিলে ঐ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে আবশ্যক মত দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে। যেখানে সন্ধি না হইয়া কেবল সমাস হইয়াছে সেখানেও দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে।

আমাদের মন্তব্য ঃ—ঐরূপ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে "আবশ্যক মত" দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে ধরা যায়—তাহা সন্ধি কিংবা সমাস, কিংবা উভয় হইলেই হয় না। ভাষার উচ্চারণের প্রকৃতিই তাহার কারণ, বাঙ্গলায় অনেক শব্দ সংস্কৃত নিয়মে বর্ণ বিন্যস্ত হয়, কিন্তু উচ্চারণ সর্ব্বত্র তাহার অনুগামী হয় না; সন্ধি সমাসগ্রস্ত হইলেও নয়। রবিবাবু 'মনোব্যথা', 'মনোব্যাকুলতা', 'মনোদ্বার', 'রাজভ্রাতা' ইত্যাদির ব্যবহার কালে বাঙ্গলা চলিত উচ্চারণের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এখানে একটি কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, "মনোব্যথা" শব্দ "মন ব্যথা" লিখিলেও চলিত, কারণ বাঙ্গলায় 'সমস্ত' ভাবে 'মন' শব্দ প্রায়শ হসন্ত উচ্চারিত হয় না। 'মন' শব্দের হসন্ত উচ্চারণ ঠেকাবার জন্যই 'মনোব্যাকুলতা' শব্দ সংস্কৃত আকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মনসাধ' শব্দটি দেখুন—ইহা ত 'সমস্ত' শব্দ? তবে সংস্কৃত আকারে—"মনঃসাধ" লিখি না কেন? কারণ ইহার উচ্চারণ বাঙ্গলায় ওরূপ নয়। বোধ করি ইহার উচ্চারণ অনুসরণ করিতে গিয়া হঠাৎ রবিবাবুও একবার মনোসাধে বাঁশী বাজাইয়াছিলেন আর কোন কোন প্রতিবাদীর ব্যাকরণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল!

এইরূপ "জলোচ্ছ্বাস" শব্দে পাঁচ অক্ষর ধরিবার আবশ্যকতা শ্রীনিবাসবাবুর নিয়মের সন্ধি সমাস জনিত নহে, পরন্তু কবির নিয়মের উচ্চারণ বশত, "উচ্ছ্বাস" শব্দটি একক যদি কবির নিয়মে চারি মাত্রার কম না হয়, তবে "জল+উচ্ছ্বাস" শব্দটি সন্ধি হইয়া কখনই চারি মাত্রা হইতে পারে না। সুতরাং ইহাকে 'আবশ্যক মত'

দীর্ঘ হ্রস্ব উচ্চারণ করা যায় না। উহার উচ্চারণ সর্ব্বদাই দীর্ঘ ধরিতে হইবে। লেখক আরও বলেন, "রবিবাবুর লেখা দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্ব্বপদ একাক্ষর হইলেই তিনি কেবল দীর্ঘ ধরিতে ইচ্ছুক, অন্যত্র নহে।" এখানেও পূর্ব্ববৎ 'উচ্চারণ জনিত আবশ্যকতা বোধ হইলে' বুঝিতে হইবে।

শ্রীনিবাসবাবুর উক্তি ঃ—"যদি পূর্ব্বপদ পরপদের সহিদ রক্ত মাংসে মিলিত হইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন অভিধান লভ্য নূতন পদের সৃষ্টি করে (যেমন বেদব্যাস, প্রতিধ্বনি, অনুগ্রহ, পুরদ্বার* প্রভৃতি শব্দে তাহা হইলে তিনি (রবিবাবু) সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে দীর্ঘ ধরিতে রাজী আছেন। কিন্তু 'মুনিব্যাস', "প্রতিধ্বনি" "শুভগ্রহ" "মনোদ্বার" প্রভৃতি স্থলে রাজী নন।" ইহা পড়িয়া বোধ হয় যে, আমাদের প্রদর্শিত নিয়মটিই টানিয়া, বুনিয়া ফেনাইয়া ঘনাইয়া বলিতে বলিতে লেখক রবিবাবুর নিয়ম অনেকটা ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তিনি এরূপ পক্ষপাতের (!) পক্ষপাতী নহেন! হায়, এইখানেই যত গোলযোগ!

শ্রীনিবাসবাবু আরও বলেন যে, রবিবাবু নাকি অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রস্তাবিত প্রসারিত নিয়মের অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী উদাহরণে 'কাণ্ডজ্ঞান' শব্দের 'ণ্ড' কে দীর্ঘ ধরিয়াছেন ঃ—

"অনেক মূর্খে করে দান ধ্যান,
কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান!

ভারতী, ১৩০৫, ৯৭৪ পৃঃ লক্ষ্মীর পরীক্ষা

পাঠক দেখিবেন, এখানেও রবিবাবু প্রচলিত উচ্চারণকেই আমল দিয়াছেন; "দান-ধ্যানের" হ্রস্বতাতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—সমাস জনিত প্রয়োজন বশত অজ্ঞাতসারে তাঁহার "কাণ্ডজ্ঞান" গুরু হয় নাই, উহা প্রকৃতই গুরু।

খ) "যেখানে সন্ধি বা সমাস কিছুই হয় নাই, সেখানেও আবশ্যক

মত দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে” শ্রীনিবাসবাবু তাঁহার এই মত সমর্থনের জন্য “ছন্দোভঙ্গদোষ স্পর্শরহিত” স্বরচিত একটি কবিতার নমুনা দিয়াছেন, যথা—

“জ্যোছনার মত স্বচ্ছ শীতল
হৃদয় কি শোভা ধরে,
হাসি হাসি মুখে অমিয় উৎস
ঝরে তাহার স্বরে।”

এবং যদি কেহ বুঝিতে না পারেন এইজন্য বলিয়া দিয়াছেন—“এখানে তাহার শব্দের ‘র’কে দীর্ঘ ধরা হইল!” আমরা ইহার কি টীকা করিব? তবে অনুমান করি, শ্রীনিবাসবাবুর উপদেশ অনুসারে ‘ঝরে তাহার স্বরে” পাঠ করিলে কবিতাটির অমিয় উৎস উপভোগে পাঠকের মুখ হাসি হাসি হইয়া উঠিবে। আমাদের মতে যেখানে সন্ধি সমাস কিছুই হয় নাই, সেখানেও উচ্চারণের খাতিরে দীর্ঘ ধরিবার আবশ্যকতা হইতে পারে, খামখেয়ালি বশত নহে।

রবিবাবু লিখিয়াছেন—

“বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির
অসংশয়ে করি স্থির
মোদের বড় এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর।” (মানসী, ১২০ পৃঃ)

এখানে ‘করি’ শব্দের ‘রি’ গুরু। এই উপলক্ষ্যে লেখক বলেন—“কবিও অন্ততঃ একবার অজ্ঞাতসারে বোধ হয়, ভাষার সহজ প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া এরূপ স্থলে দীর্ঘ ধরিয়াছেন।”

আমরাও বলি, ভাষার “উচ্চারণের” সহজ প্রকৃতির প্রভাবই রবিবাবুর রচনায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়, কোথায়ও তিনি তাহার অতিক্রম করিতে অগ্রসর হন নাই; এবং এখানে যে “রি” গুরু ধরিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত অজ্ঞাতসারে করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়

না। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

"পথিক, তোমার দলে
যাত্রী ক'জন চলে ?
জানি তাহা ভাই শেষ নাহি পাই
চলেছে জলে স্থলে।"

(ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮)

এখানে "জলে"র "লে" গুরু। কে ইহাকে লঘু করিয়া পাঠ করিতে পারে? কতকগুলি শব্দ আছে (যেমন স্ফূর্ত্তি, পিষ্ট, স্থূল ইত্যাদি) তাহাদের উচ্চারণ করিতে হইলে পূর্ব্ব পদের স্বরান্ত বর্ণ কিছুতেই হ্রস্ব উচ্চারিত হইতে পারে না। ব্যস্তভাবে উচ্চারণ করাও একটু কঠিন। এই জন্যই ইংরাজী 'স্কুল' বাঙ্গলা 'ইস্কুল' হইয়া পড়িতেছে।

লেখক উক্ত উভয় নিয়ম সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা বলিয়াছেন, তাহারও আলোচনা আবশ্যক। শ্রীনিবাসবাবু বলেন—"উপরি লিখিত যে যে স্থলে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে 'আবশ্যক মত' দীর্ঘ ধরিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ঐ সকল স্থলে সর্ব্বদাই দীর্ঘ ধরিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। অর্থাৎ কোন কবি ইচ্ছা করিলে রবিবাবুর মতে হ্রস্বও ধরিতে পারেন, কেহ বা ইচ্ছা করিলে দীর্ঘও ধরিতে পারেন।"

আমাদের মন্তব্য—কোন কবির ইচ্ছার উপর অপর কাহারও হাত নাই। "ঝরে তাহার স্বরে'র গুরুত্বেই তাহার প্রমাণ হাতের কাছেই আছে। তবে উপযুক্ত সমজদার পাওয়াই মুস্কিল।

যাহা হউক, শ্রীনিবাসবাবু শেষের কথাটি অনেকটা ঠিক বলিয়াছেন,—"যে স্থলে ঐ সংযুক্ত বর্ণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যতি পড়িবে, সে স্থলে তাহার পূর্ব্ববর্ণকে দীর্ঘ ধরা কদাপি সঙ্গত নহে। যথা—

চমকি মুখ দুহাতে ঢাকে সরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভেনি সেই ক্ষণ।

এ স্থলে প্রদীপ পূর্ব্ববর্ত্তী 'ন' অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরিতে কেহই পরামর্শ দিবেন না।

আমাদের মন্তব্য—আমরা "যতি"কে সর্ব্বদা ততটা প্রাধান্য দিই না যতটা উচ্চারণকে দিয়া থাকি। আর যতিও অনেক সময়ে উচ্চারণ ও অর্থ সৌকর্য্যার্থেই পতিত হয়। ঐ ছত্র দুইটি যদি কেহ অজ্ঞতা বশত এইরূপ পাঠ করে, যথা—

চমকি / মুখ দুহাতে / ঢাকে সরমে / টুটে মন,
লজ্জা / হীন প্রদীপ / কেন নিভেনি / সেই ক্ষণ /

তাহা হইলেও রবিবাবুর নিয়মে "হীন" শব্দের 'ন' গুরু হইত না। আরও একটি উদাহরণ দেখুন,—

তারপরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি /

(সোনার তরী / নিরুদ্দেশযাত্রা)

এখানে 'ক্ষুব্ধ' শব্দের আগে কি "যতি" পড়িয়াছে? নিশ্চিতই পড়ে নাই। তবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী "নো"র উচ্চারণ লঘু ধরা কি অস্বাভাবিক হইয়াছে?

এই জন্যই লেখকের নিয়মানুসারে তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত পদ্যের সমাসবদ্ধ "অধীশ্বরী"র "ধী"কে হ্রস্ব ধরা সঙ্গত হয় নাই। সুতরাং ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে—

কোথা সে পাষাণী কোথায় এখন
মম হৃদি অধীশ্বরী যেই জন।

আমরা উহাকে এইরূপ লিখিতাম—

কোথা সে পাষাণী কোথায় এখন
এ হৃদি অধীশ্বরী যেই জন।

মাত্রামিত কবিতায় যতি পতনের কার্য্যকারিতা মোটেই নাই একথা বলতে পারি না। যেমন—

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কল স্বর,

এখানে "কল" শব্দের "ল" কতকটা যতিপতনে এবং কতকটা উচ্চারণ বশেই লঘু হইয়াছে। এইরূপ "রাজভ্রাতা" শব্দের "জ" লঘু—

কচালি আঁখি কুমার সাথে জাগিল রাজভ্রাতা

অথচ, শ্রীনিবাসবাবু প্রবন্ধারম্ভে "কলস্বর" ও "রাজভ্রাতা"র গুরু উচ্চারণ করিয়া ভ্রমে `পতিত এবং কবির "একদেশদর্শিতা" (!) দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন! আরও বক্তব্য, এখানে "কল" শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ এবং 'রাজ' শব্দের হসন্ত উচ্চারণ ধরিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

আমরা এতক্ষণ দেখাইলাম যে, পাকাপাকি নিয়মে গুরু লঘু না ধরিয়া ইচ্ছামত ধরিলে অনেক পাঠককে অনেক সময় এইরূপে বিড়ম্বিত হইতে হয়। আমাদের কবির ছন্দ-উচ্ছৃঙ্খল নয়, নিয়মও সহজ উচ্চারণরূপ ভিত্তির উপরই স্থাপিত। তিনি খেয়াল বশত কোন স্থলেই গুরু লঘু উচ্চারণ ধরেন নাই। তথাপি দুঃখের বিষয়, লেখক মহাশয়ের মত নিপুণ পাঠকও পদে পদে স্খলিত হইয়াছেন। আমরা একে একে তাঁহার ভ্রম নিরাকরণের চেষ্টা করিতেছি।

লেখক বলেন (১) "কবি" 'ঙ্গ' বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে কখন বা হ্রস্ব কখন বা দীর্ঘ ধরিয়াছেন। হ্রস্ব, যথা—

নয়ন যদি মুদিয়া থাক
সে ভুল কভু ভাঙ্গিবে নাক। (মানসী, পৃঃ ১২০)

দীর্ঘ, যথা—

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি। (সোনার তরী, পৃঃ ২০৬)

কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়,

কখনো মিশে যায় ভাঙ্গিয়া। (মানসী, পৃঃ ১৩৭)

আমাদের মন্তব্য ঃ—উপরের উদাহরণে 'ভাঙ্গিয়া' শব্দ দুই স্থানেই হ্রস্ব। প্রথম উদাহরণে হ্রস্ব, আর দ্বিতীয় উদাহরণে দীর্ঘ নয়। কোন কোন অঞ্চলে "ভাঙ্গিয়া" শব্দ উচ্চারণে "ভাঙিগয়া" যায়। সুতরাং কবিব সতর্ক হইয়া বর্ণ বিন্যাস করা উচিত ছিল! কিন্তু শ্রীনিবাসবাবু আশ্বস্ত হউন, আজকাল এ সম্বন্ধে কবি বেশ সজাগ—গদ্যেও তিনি এখন 'ভাঙা-বাংলা' লিখিতেছেন। কিন্তু হায়, তাহাতেও দেখিতেছি কবির নিস্তার নাই। লেখক বলিতেছেন ঃ—(২) "সাধারণতঃ তিনি 'ঙ' (ঙ ং)-এর পূর্ব্ববর্তী বর্ণকে হ্রস্ব ধরিয়া থাকেন। কিন্তু প্রয়োজনানুসারে দীর্ঘও ধরিয়া থকেন; যথা—(মানসী, পৃঃ ১৭৩)

কখনো ঘননীল বিজুলি ঝিলমিল

কখনো উষারাগে রাঙিয়া।"

আমাদের অধিক টীকা অনাবশ্যক। তিনি "রাঙিয়া" লিখিলেও "রাঙিগয়া" বা "রাঙিঙয়া" কেন পড়িলেন তাহার কারণ ঠিক পাওয়া গিয়াছে।

তিনি যে একটু আগেই পড়িয়াছেন—

কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়

কখনো মিশে যায় "ভাঙিগয়া";

সুতরাং—

কখনো ঘননীল বিজুলি ঝিলমিল

কখনো উষারাগে "রাঙিগয়া"!

না পড়িলে মেলে কৈ!

৩) শ্রীনিবাসবাবু বলছেন—'ক্ষ' বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে কবি কখন হ্রস্ব কখন বা দীর্ঘ ধরিয়াছেন। হ্রস্ব, যথা—

ম্যাটাসিনি-লীলা এমন সরেস,
এরা সে কথার না জানিল লেশ,
হায় অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ
লজ্জায় মুখ ঢাকো। (মানসী, পৃঃ ১২৬)

আমাদের মন্তব্য ঃ—এই উদাহরণে 'অশিক্ষিত' শব্দ হ্রস্ব উচ্চারণে "অশিখিত" হয়—শ্রীনিবাসবাবু কি ঐরূপ পড়েন? আমরা বলি, কবি এখানেও নিজের নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। "অশিক্ষিত" শব্দের 'শি' গুরু ধরিয়া এইরূপ পড়ুন ঃ—

হা (য়) অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ
লজ্জায় মুখ ঢাকো।

ভরসা করি এখন গণনায় মিলিয়াছে। এইরূপ দুই একটি উপক্ষেণীয় অনুচ্চার্য্য অক্ষর ব্র্যাকেট কণ্টকিত* করিয়া না লিখিলে পদ্য অশুদ্ধ হয় না। "য়"টা ছাপাখানার ভূতের কাণ্ডও ত হইতে পারে।

৪) সমালোচক বলেন,—ঔকারকে নিম্নলিখিত স্থলে কবি হ্রস্ব করিয়াছে ; যথা—

দূর হৌক এ বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের বাণ
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনা ভরা প্রাণ। (মানসী, পৃঃ ১১৩)
জগত ছানিয়ে কি দিব আনিয়ে
জীবন যৌবন করি ক্ষয়। (মানসী, পৃঃ ১৭৯)

*শ্রীনিবাসবাবু তাঁহার প্রবন্ধে এক স্থলে তাঁহার স্বরচিত একটি ছত্রে "ও"কে ব্র্যাকেট বন্ধ করিয়া উহা যে অনুচ্চার্য্য তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন—
"উচিত হয় মিঠাই এনে
খাইতে দে(ও)য়া ভাই।"

আমাদের মন্তব্য ঃ—ঔকার লঘু উচ্চারিত কোথায়ও হয় নাই, এখানেও নহে। এখানেও ব্র্যাকেট খাটাইয়া পাঠ করুন—

দূর হৌক (এ) বিড়ম্বনা।

অথবা ওকার স্থলে ছাপার ভুলে ঔকার হইয়াছে উহার সংশোধিত পাঠ এইরূপ হইবে ; যথা—

দূর হোক এ বিড়ম্বনা।

দ্বিতীয় উদাহরণ "যৌবন" দীর্ঘ রাখিয়া "জীবন" একটু খাটো করিয়া লইতে হইবে ; যথা—

জীব (ন্)-যৌবন করি ক্ষয়।

৫) লেখক বলেন—"কবি সাধারণতঃ এক শব্দের অন্তর্গত সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে দীর্ঘ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিম্নদ্ধৃত স্থলে হ্রস্ব ধরিয়াছেন" —(আমরা দৃষ্টান্তগুলির ক্রমে উল্লেখ করিয়া আমাদের নিজের মীমাংসা প্রত্যেকটির নীচে দিলাম)

ওই কারা বসে আছে দূরে
কল্পনা উদয়াচল পুরে (মানসী, পৃঃ ১°৫)

লেখকের মতে "কল্পনা" শব্দের 'ক' হ্রস্ব। আমরা তাহা বলিনা, কারণ একটি মাত্রাবৃত্ত কবিতা নয়—সুতরাং "কল্পনা" তিন অক্ষর ধরায় দোষ নাই ; উচ্চারণ ঠিক গুরুই আছে।

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ কবি
যেন কাষ্ঠপুত্তল ছবি (মানসী, পৃঃ ১৪১)

লেখক বলেন, "কাষ্ঠ" দুই অক্ষর। উত্তর এটা মাত্রামিত কবিতা সুতরাং কাষ্ঠ তিনমাত্রা। তবে "পুত্তল" শব্দে ছাপার ভুল ছিল, আমরা উহার সংশোধিত পাঠ "পুতল"ই লিখিলাম। পদ্যে "পুতল" লিখিলে দোষ হইবে কি ?

*এখানে ছাপা আছে ধারায়

"রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে,
সাত সমুদ্র তের নদীর পার,
যেখানে যত মধুর ছবি আছে
বাকী ত কিছু রাখিনি দেখিবার।"
(সোনার তরী—পৃঃ ১৫)

শ্রীনিবাসবাবু বলেন, "এখানে সমুদ্র শব্দকে তিন অক্ষর ধরা হইয়াছে।" আমরা বলি চারি অক্ষর। বিশ্বাস না হয়, চতুর্থ ছত্রের অক্ষর সংখ্যার সহিত মিলাইয়া দেখিবেন, দ্বিতীয় ছত্রেও বারো মাত্রা হয় কিনা। আর চতুর্থ ছত্রই বা বলি কেন, সকল ছত্রই একস্বপ।*

"দেখ হেথা নূতন জগৎ
ওই কারা আত্মহারাবৎ
যশ অপযশ বাণী—কেহ কিছু নাহি মানি
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।"
(মানসী—পৃঃ ১৪৪)

লেখক বলেন, এখানে "দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রের সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে হ্রস্ব ধরা হইয়াছে।" আমরা "আত্মহারাবৎ" লঘু উচ্চারণ কখনো ধরি না, আর 'ভবিষ্যৎ'ও আমাদের মতে সর্ব্বদাই দীর্ঘ। এ কবিতাটি মাত্রামিত নহে, বর্ণবৃত্ত; সুতরাং নূতন নিয়মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত।

৬। সমালোচক বলেন—"সাধারণতঃ কবি অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ণকে, দীর্ঘ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে হ্রস্ব ধরিয়াছেন:—

"ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াশিংটনের জন্ম বরষ
মুখস্থ হলো নাক।" (মানসী—১২৬ পৃঃ)

আমাদের বক্তব্য—ঃ কবি সর্ব্বত্রই সানুস্বার বর্ণ গুরু ধরিয়াছেন,

*ছাপার ভুল বলে সন্দেহ আছে। "একরূপ?"

এখানেও তাহার ব্যতিক্রম করেন নাই। আর একবার বন্ধনী দিয়া পাঠের সন্ধান লওয়া যাক :—

"ওয়াশিংটনে (র) জন্ম বরষ
মুখস্থ হল নাক।"

শ্রীনিবাস বাবু এই ছয় দফায় কবিবর নিজ-নিয়মের নিজেই অপব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও দফায় দফায় তাহার ব্যাখ্যা করিলাম, এখন পাঠকই বিচার করুন কোন ব্যাখ্যা সমীচীন। ফলতঃ রবিবাবু আপনার ছন্দের শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল করিয়া পায়ে জড়াইয়া বসেন নাই; তিনি ছন্দের কবিতার চরণে পরাইয়া তাহাকে শিঙ্গামুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা পুনর্ব্বার বলি, কবি ছন্দোবিষয়ে শ্রীনিবাসবাবুর ব্যাখ্যা মত অতটা উচ্ছৃঙ্খল নহেন। আজকাল রবিবাবুর ভক্ত শিষ্য অনেক আছেন, তাহা বোধ করি কবিরও অজ্ঞাত নাই। কিন্তু যদি কেহ তাঁহার অন্ধ অনুকরণকারী হইয়া থাকেন, তবে সে দোষ কাহার ?

অতঃপর আমাদের নিজের পালা। আমরা শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর উদ্ধৃত তুলসীদাসের একটি কবিতা সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে লিখিত অথচ উহাতে সংস্কৃতের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই কেন, ইহার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছিলাম। দীনেশবাবু বলিয়াছিলেন যে,—"কোন কবিই সংস্কৃত ছন্দগুলি প্রাদেশিক ভাষায় আনিতে যাইয়া সংস্কৃত হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের নিয়ম উৎকৃষ্টভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই।" আমরা বলিয়াছিলাম,—"ইহা অনেকাংশে ঠিক হইলেও (কি না সর্ব্বাংশে ঠিক না হইলেও—অর্থাৎ কোন কবিই পারেন নাই এ কথা ঠিক না হইলেও—চাই কি, কেহ কেহ পারিয়া থাকিলেও) বোধহয় যে কবিরা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই ঈষৎ স্খলিত হইয়াছেন।" আমাদের এই কথার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, যাঁহাদিগকে পারেন নাই বলা হইল, তাঁহাদিগের সে ক্ষমতা ছিল

না এরূপ বলাটা অসঙ্গত। যেখানে স্খলিতপদ হইয়াছেন, সেখানে ইচ্ছাপূর্ব্বকই হইয়াছেন বোধ হয়। ইহার প্রমাণ আমরা আলোচ্য প্রবন্ধেই কথঞ্চিত প্রদান করিয়াছি। সেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কবিদের কেহ কেহ হয়তো বুঝিয়াছিলেন যে প্রাদেশিক ভাষায় (অন্ততঃ বাংলায়) সংস্কৃত ছন্দে কাব্য লেখা পণ্ডশ্রম, তাই অনেকেই—মাঝে মাঝে দুটি একটি ক্ষুদ্র পদ্য তোটক, ভুজঙ্গ প্রয়াত, গজগতি ইত্যাদি ছন্দে লিখিয়া গিয়াছেন।* এখনও কোন কোন পত্রিকায় কখন কখন সংস্কৃত ছন্দের গুরু লঘু নিয়মে বাঙ্‌লা পদ্য প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণের খিচুড়ী বিশেষ। চেষ্টা করিলেই সংস্কৃত নিয়মে বাঙ্‌লা লেখা যাইতে পারে কিন্তু সংস্কৃত ও প্রচলিত বাংলা উচ্চারণের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য নাই বলিয়া কবিও তখন—

"ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে"

নতুবা উহা সংস্কৃত ছন্দ কি বাংলা ছন্দ তাহা জানিবার সহজ উপায় নাই। যাঁহারা এইরূপ সংস্কৃত ছন্দে লিখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ "সংস্কৃত নিয়মে" এই কথাটুকু গোড়াতেই বলিয়া দেন, তাহা হইলে আর পাঠকের অপ্রস্তুত হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ সংস্কৃত উচ্চারণের যে বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, পাঠক সেই নিয়ম

*বর্ত্তমান লেখকের পঠদ্দশায় কলিকাতায় তাঁহার এক সতীর্থ একখানি সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কাব্য গ্রন্থ দেখাইয়াছিলেন—কিন্তু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়ের নামই এখানে ভুলিয়া গিয়াছি। মাত্র একছত্র মনে পড়িতেছে—"তোমার ভাগ্যে ঘটিবে জয়শ্রী।"

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু বলেন—ইন্দ্র বজ্রাৎ "মাইকেলের সমসাময়িক কবি বলদেব পালিত রচিত "ভর্ত্তৃহরি" কাব্যে এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। যথা—

বংশস্থবিল—

তথায় ভীমাসিত কর্ম্মভূষিত
প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে
সবিদ্যুতাগ্নি প্রলয়োন্মুখাভ্রবৎ

কৃপাণপাণি প্রহরী ব্রজে ভূমে।"—কিন্তু পালিত কবিরও ছন্দপতন হইয়াছে। চতুর্থচরণের "ভূ" হ্রস্ব হওয়া উচিত ছিল।

অনুসারে পদ্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন ; বাঙ্‌লা সহজ সাধারণ উচ্চারণকে তখন কিছুকালের জন্য বিদায় দিলেই হইল। নিম্নলিখিত শ্লোকটি সংস্কৃত নিয়মে লেখা একথা বলিয়া না দিলে হঠাৎ কে ইহাকে "দ্রুত বিলম্বিত" ছন্দে পাঠ করিবেন ?

—"অতি অনন্যপরায়ণ এ হিয়া
হৃদয় সন্নিহিতে অয়ি ! অন্যথা
যদি মনে করলো মদিরেক্ষণে !
মদনবাণ হতে বধিবে তবে।"

অথবা লেখক-উদ্ধৃত কবিতা লওয়া যা'ক ঃ—
"বাসবদত্তায়"—

বরিব, না ইহ নরে কহি ধ্বনি করে।
নৃপবরে করপুটে, স্তুতি করে দ্রুত উঠে।

ইহা "গজগতি"ছন্দে রচিত, কিংবা শুধু "সংস্কৃত নিয়মে লিখিত" এইরূপ কিছু পূর্ব্ব পরিচয় বা ইঙ্গিত না পাইলে কে চিহ্নিত বর্ণগুলির গুরু উচ্চারণ ধরিয়া পাঠ করিতে অগ্রসর হইবে ? "সদ্ভাবশতকে"—

ধন্য স্বাধীন দ্বিজ।
কি সুখ মধু পূর্ণতর চিত্ত সরসিজ।
সুখময় তব তরু কোটর।
সুধাময় তব তিক্ত ফল-নিকর।

ইহা যে সংস্কৃত "আর্য্যা" ছন্দে রচিত তাহা টিকিট মারা না থাকিলে কে হঠাৎ প্রথম ছত্রে বারো মাত্রা ধরিয়া পাঠ করিবে ? উহা বাঙ্‌লায় আটমাত্রার বেশী ধরিলে নিতান্তই শ্রুতিকটু হয়। দ্বিতীয় ছত্রটায় আপত্তি উঠিবে না, কারণ উহা বাঙ্‌লা উচ্চারণের সঙ্গে মিলে, কিন্তু তৃতীয় ছত্রে আবার "কোটরে" গিয়া ঠেকিবে !

আমরা বলিয়াছিলাম,—"বাঙ্‌লা ছন্দে দীর্ঘস্বরের সমস্তই গুরু উচ্চারণ করিলে নিতান্ত শ্রুতিকটু হয়।" লেখক ইহাতে আপত্তি

তুলিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত দুটি-একটি পদ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে এগুলি শ্রুতিমধুর এবং রবিবাবুর নিয়মে লিখিলে ইহাদের সৌন্দর্য্য থাকিত না। যথা—

১) বাসবদত্তা—শীতল ধরণীতল জলপাতে
ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে।*

২) দ্বিজেন্দ্রবাবুর—জান নাকি কদাচন মূঢ়,
কর্ণবিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ়।

আমাদের মন্তব্য ঃ—বাসবদত্তার শ্লোকটি 'পজ্ঝটিকা' ছন্দে রচিত হইলেও উহার প্রথম আবৃত্তির সময় যেন কুজ্ঝটিকার মধ্যে পড়িয়া ইতস্তত করিতে হয়। তবে হেডিং দেওয়া থাকিলে কোন শঙ্কা নাই—কারণ তাহাতে তাঁহার খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দের প্রকৃত উচ্চারণের ধাঁধা ও ক্ষণেকের জন্য "ছাড়িতে পারে।"

আর দ্বিজেন্দ্রবাবুর—"কর্ণবিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ়" তাহা বিজ্ঞ ভুক্ত-ভোগীরাই বলিতে পারেন; তাহা "জানি নাক কদাচন, মূ'ঢ়" আমরা! এই ছত্র দুইটির কি ছন্দ তাহা শ্রীনিবাসবাবু উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ইহার শ্রুতিমধুরতা ছন্দের জন্য, না ছন্দোভঙ্গের জন্য, না বাঙ্‌লা উচ্চারণ বিকৃতির জন্য, ভাল বুঝিতে পারা গেল না।

যাহা হউক, আমরা ভারতচন্দ্র, মদনমোহন, "সদ্ভাব-শতক"কার কিম্বা দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিন্দা করিতেছি না। তাঁহারা ভাবের উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগে অনেক স্থলেই সংস্কৃত ছন্দের চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য বাঙ্‌লায় তোটকাদি ছন্দে রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদের বক্তব্য ছিল বাংলা ছন্দে সংস্কৃতের গুরু লঘুত্ব লইয়া। কিন্তু শ্রীনিবাসবাবুর আপত্তি ভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে বলিয়াই

*ইহার সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া বাঙ্‌লা ছন্দেও আনা যাইতে পারে। যথা—

শীতল ধরণী জলধারা পাতে
ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে।

এইরূপে দেখাইলাম যে যখন সংস্কৃত ছন্দেই বাঙ্‌লা শব্দের স্বাভাবিক গুরু-লঘু উচ্চারণ পদে পদে পর্য্যুদস্ত হয়, তখন বাঙ্‌লা ছন্দে সমস্ত দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণই সংস্কৃতভাবে করিলে কত শ্রুতিকটুই না হইতে পারে! এইজন্যই আমাদের কবি অসামান্য প্রতিভাবলে ভাষার অন্তর্নিহিত উচ্চারণের "অমিয় উৎস" হইতে ছন্দের স্রোতধারা বহাইয়াছেন—ইহাতে সংস্কৃতের নিয়ম কতকটা ভাঙিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষার উর্ব্বরতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যে সহস্রগুণে বাড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এই যে, সংস্কৃতে যেমন গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই গুরুলঘু ভেদ সমান, তেমনি রবিবাবুর নিয়মেও বাঙ্‌লা গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ 'প্রায়' এক; এবং তাহাই কি বাঞ্ছনীয় নয়? বোধ হয় ভাষা মাত্রেরই এই রীতি; তবে অনন্ত শব্দ-সিন্ধুর মধ্যে সামান্য দু-চারিটি বিন্দুর অসঙ্গতি অনেক ভাষারই থাকিতে পারে; তাহাতে কিছু আসে যায় না।

কথা উঠিয়াছে রবীন্দ্রবাবুর নিয়মে বাঙলায় সংস্কৃত ছন্দ সর্ব্বত্র ঠিক রাখা যায় না। তাহার উত্তর এই—বাঙ্‌লার অন্য কোন্ কবির নিয়মে তাহা পারা যায়? যাঁহারা সংস্কৃত ছন্দ লিখেন তখন বাঙ্‌লা ছন্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ একরূপে ধরেন, আবার পয়ার ইত্যাদিতে অন্যরূপে গুরু লঘু উচ্চারণ ধরেন। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" কি সংস্কৃত নিয়মে লেখা? অথচ "ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে" আকার একার দীর্ঘ সংস্কৃত নিয়মে ধরা হইয়াছে। রবিবাবু সংস্কৃত ছন্দে লিখিলে কোন প্রণালী অবলম্বন করিতেন সে প্রশ্ন উত্থাপনের আবশ্যকতা কি? তবে স্বীয় নিয়মে চলিলেই যে তাঁহার লেখনী "স্বাধীন স্ফূর্ত্তির" অধিকতর অবকাশ পাইত তাহার সন্দেহ নাই। রবিবাবু তোটক প্রভৃতি ছন্দে ছত্রশেষে গুরুবর্ণ সহজে পাইতেন না বটে—কিন্তু একথা বলা যাইতে পারে যে তাঁহার যেখানে

একবার পদস্খলনের সম্ভাবনা, সেখানে অন্যান্য কবিরা বাংলা শব্দের অযথা উচ্চারণ করিয়া পদে পদে পতিত হইবেন। আর তিনি যদি সংস্কৃত' নিয়মেই সমস্ত বাঙ্‌লা শব্দের উচ্চারণ ধরিয়া লিখেন—তবে অন্যেরও যে দশা তাঁহারও সেই দশা !

আমরা লিখিয়াছিলাম—সাধারণতঃ পয়ারের কম অক্ষর হইলে রবিবাবু গুরু লঘু ভেদে কবিতা লিখিয়া থাকেন। আর, যতি, আট অক্ষরের কমে পড়ে, তবে পয়ারাধিকে ও পয়ারেও কখন কখন গুরুলঘু ভেদে লিখিয়া থাকেন।—সমালোচক বলেন—"কথাটা সর্ব্বাংশে ঠিক নহে।"

আমরাও বলি, তিনি যেরূপে আমাদের নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছেন —"তাহাও সর্ব্বাংশে ঠিক নহে।" কারণ আমরা উহা ছাড়া আরও লিখিয়াছিলাম—"পংক্তি সকলের ক্ষিপ্র গতি অথবা শব্দের ঝঙ্কারের উপর ঝোঁক দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও এই নিয়মে চলিয়া থাকেন।

সুতরা তিনি যে সকল স্থলে আমাদের নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সে সব স্থলে বাস্তবিক কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাই। যথা—

"নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
উর্দ্ধে পাষাণ তট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

এখানে ছত্রের ক্ষিপ্র গতি ও শব্দের ঝঙ্কারে ঝোঁক দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া পয়ার*মাত্রামিত।

*রবিবাবুর 'আমরা ও তোমরা' কবিতা হইতে আমরা—

"অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।"

প্রভৃতি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া এক স্থলে বলিয়াছিলাম, ইহা পয়ার। কারণ মাত্রা হিসাবে

প্রতি পংক্তি চৌদ্দ অক্ষর। লেখক ইহা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই এই অপরাধে দুইটি শ্লোক রচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—চৌদ্দ অক্ষর হইলেই যদি পয়ার হয় তবে এ গুলিও কি পয়ার ?

১। "পাখী সব গাছে গান আপন মনে
বালিকা বধূ ঘাটে যায় শাশুড়ীর সনে।"

২। "কেঁদনা প্রাণ তব হইবে না রাঁধিতে,
চিবা'য়ে চাল আমি শুয়ে রব নিশিতে।"

আমাদের মন্তব্য :—বর্ত্তমানে চৌদ্দ অক্ষরে যে 'পদ্য" হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রাচীনকালে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের কম হইলেও হইত বেশী হইলেও হইত। প্রমাণ অনাবশ্যক। ভারতচন্দ্র যে নিয়মে পয়ার রচনা করিয়া গিয়াছেন, এখনকার কবিরাও অধিকাংশ স্থলে সেই পথেই চলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের কবি যতি ছয় অক্ষরে ফেলিয়া, অবশিষ্ট আট অক্ষর প্রায়শ তিন শব্দে ৩+৩+২ সংখ্যায় নির্দ্দেশিত করিয়া, অনেক স্থলে পয়ার লিখিয়া থাকেন। রবিবাবুর উল্লিখিত কবিতার ছত্র গুলিরও এই নিয়ম—সুতরাং ইহাকে "সমষড়্বিরাম" পয়ার বলিলে ক্ষতি কি ? আর শ্রীনিবাসবাবু যদি অভয় দেন, তবে তাঁহার রচিত পদ্য দুইটিরও নাম করণ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমে জিজ্ঞাস্য' ১নং পদ্যে "বালিকা বধূ ঘাটে যায় শাশুড়ীর সনে" কি চৌদ্দ অক্ষর হইয়াছে ? প্রাচীন নিয়মের হইলে ইহা "গঙ্গাজলী পয়ার", নব্য নিয়মের হইলে এটি "শ্বশ্রূ-চরণ-ভঙ্গ পয়ার। ২নং পদ্যে কোন হাঙ্গামা নাই, সুতরাং তাহার নাম "চা'ল চর্ব্বণ" পয়ার রাখা গেল।

"শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।"

এখানেও ছত্র সমূহের ক্ষিপ্র গতি বশতই কবিতা মাত্রামিত।

"কেন আন বসন্ত নিশীতে
আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?"

(মানসী, পৃঃ ৬৫)

ইহার প্রথম দুই ছত্র পয়ারের অপেক্ষা কম অক্ষর বটে, কিন্তু যতি ছত্র শেষেই পতিত হইতেছে ; এবং ইহাতে এমন একটি "আবেশ

বিহ্বলতা" আছে যাহাতে করিয়া ছত্রগুলির গতি এইরূপ মৃদুমন্থর ; সুতরাং ইহা বর্ণবৃত্ত।

আমরা "সাধারণতঃ" "প্রায়শঃ" ইত্যাদি কথাদ্বারা আমাদের বক্তব্য মোটামুটি ভাবে পাঠক সাধারণকে নিবেদন করিয়াছিলাম, তাহাতে একেবারেই প্রতিপ্রসব নাই, বা থাকিতে পারে না, এরূপ মনে করাই অন্যায়। কিন্তু শ্রীনিবাসবাবু এই "স্থূল কথা" বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—"কবি কোন স্থলে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে কবিতা লেখেন, এবং কখন লেখেন না, তাহা আলোচনা করিবার এখনও সময় আসে নাই।" অথচ প্রবন্ধের আরম্ভেই সমালোচক মহাশয় মনে করিয়াছেন "রবিবাবুর লেখা সম্বন্ধে যত বেশী আলোচনা হয়, ততই দেশের গৌরব ও বাঙালীর গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রকাশ পায়।" তাঁহার এই উভয় বাক্যে সামঞ্জস্য কোথায়? অধিকন্তু রবিবাবু ভবিষ্যতে কিরূপ ছন্দে লিখিতে পারেন তাহারও আভাষ ইঙ্গিত সমালোচক মহাশয় দিয়াছেন।

তারপরে শ্রীনিবাসবাবুর একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর। "কোন কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উহা গুরু লঘু ভেদে লিখিত কিনা তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি? উত্তর—নাই" আমাদের মন্তব্য ঃ এমন কোন ভবিষ্যদ্বিঃ পাঠকই নাই—যিনি পড়িবার "পূর্ব্বেই" সব জানিতে পারেন। যাহা হউক কবিতা পাঠ আরম্ভ করিয়াই নিপুণ পাঠকের তাহা বুঝিতে পারা আবশ্যক বটে—সংস্কৃতেও তাহা পারা যায়। রবিবাবুর নিয়মেও তাহা পারা যায়। "সোনার তরী"র "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা" এই প্রথম ছত্রটি পড়িয়াই বুঝিতে পারা যায় যে—এটি মাত্রামিত কবিতা—তজ্জন্য সমালোচক মহাশয়ের মত, দুই-তিন পৃষ্ঠা দৌড়িয়া "শূন্য নদীর তীরে" পড়িয়া যদি পাঠটি ঠিক ধরিতে পারা যায়, তবে পাঠকের নিপুণতার নিতান্তই প্রশংসা করিতে পারি না।

শ্রীনিবাসবাবু এইরূপ আরও অনেক কবিতা পাঠের গোলযোগে পড়িয়াছেন ঃ—

১) (মানসী)

“প্রভাতের আলোর সনে
অনাবৃত প্রভাত গগনে
বহিয়া নূতন প্রাণ ঝরিয়া পড়ে না গান
ঊর্দ্ধ নয়ন এ ভুবনে।”

শ্রীনিবাসবাবু বলেন,—ইহা লঘুগুরু ভেদে লিখিত কবিতা এবং রঙ্গলালের “একতায় হিন্দুরাজগণ” প্রমুখ কবিতাটির ছন্দের সঙ্গে মিলে না, কারণ ‘ঊর্দ্ধ’ এই শব্দটি তিন অক্ষরের সমান। আমরা বলি, ইহা মাত্রামিত কবিতা নহে—‘ঊর্দ্ধ’ শব্দের উপর কিঞ্চিৎ মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া কবি এখানে উচ্চারণ অনুমোদিত দীর্ঘ পাঠই প্রশস্ত ধরিয়াছেন মাত্র।

২) সোনার তরী—

“দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যেবেলা
শৈশবে কত গল্প কত বাল্য খেলা।”

শ্রীনিবাসবাবু বলেন—“এখানে হঠাৎ ‘শৈশবে’র ঐকার গুরু ধরা হইয়াছে।” আমরা বলি, এই শ্লোকটির ক্ষিপ্র গতি নাই, সুতরাং ইহা মাত্রামিত নহে। আমাদের মতে, এখানে ছাপাখানার প্রেতের দৌরাত্ম্যে “শৈশবে” শব্দের পরে একটি “র” পঞ্চত্ব পাইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া—ঐকার লঘু নয়—কারণ সাধারণত বর্ণবৃত্ত পয়ারে দীর্ঘ স্বরের যথেষ্ট অবসর থাকে। শৈশবের ঐকার গুরুই ধরিতে হইবে—তথাপি তাহার পরে একটি অক্ষরের আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই অক্ষরটি “র”। পড়ুন,—

শৈশবের কত গল্প কত বাল্য খেলা।

সমালোচক, সোনার তরীর “সুপ্তোত্থিতা” নামক কবিতার “কে

পরালে মালা” এই চরণটির “কে” শব্দটিকে দুই বর্ণের সমান ধরা হইয়াছে বলিয়াছেন। আমরা বলি, এখানে এই চরণটি কবিতার একটি “উপ” চরণ, সুতরাং ইহাতে অন্যান্য চরণের সঙ্গে অক্ষরের মিল না ধরিলেও ক্ষতি নাই। পড়িবার সময় “কে”র একটু টানা উচ্চারণ হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে দুইমাত্রা না ধরিলেও চলে।

যাহা হউক, শ্রীনিবাসবাবু একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন যে, “অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এ সব কবিতা পড়া কষ্টকর হইবে এমন বলিতে পারি না।” কিন্তু ইহা নব নিয়মের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তাহা ভাল জানা গেল না। কারণ, সমালোচক মহাশয় নিচের কবিতাটি কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের—

“রাত পোহাল ফরসা হল, ফুটলো কত ফুল”

ইত্যাদি কবিতার নাচুনী ছন্দে লিখিত মনে করিয়া পড়িতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তৃতীয় চরণে আসিয়াই নাকি ‘অপ্রস্তুত’ হইয়াছেন! দুই চরণ “উজাইয়া গিয়া” আবার নূতন করিয়া গুরুলঘু মানিয়া পড়িয়াছেন।

সন্ধ্যা পবন কুঞ্জভবন
নির্জ্জন নদীতীর,
আর চাহি শুধু বুক ভরা মধু
ভালবাসা প্রেয়সীর।

আমরা কিন্তু আশা করি, অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রই “সন্ধ্যা পবন কুঞ্জ ভবন” পাইয়াই “মাত্রা” বুঝিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবেন। শেষ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া পুনর্ব্বার “উজাইয়া” “নির্জ্জন নদীতীরে” যাইতে হইবে না। সোজা কথায়, ইহা যে দীনবন্ধু মিত্রের “রাত পোহাল” কবিতার ছন্দে লিখিত নয়, তাহা প্রথমেই সহজেই বোঝা যায়।

শ্রীনিবাসবাবু পরিশেষে নীচের কবিতা (!) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন এইরূপ উজাইয়া যাওয়া নাকি বাঙ্‌লা কবিতায় নূতন

নহে ঃ—

কড়্ কড়্ সড়্ সড়্ বহিছে ঝড়,
পড়ে ঘর কোঠা বাড়ী গাছ বড় বড়।"

কিন্তু আমরা এবম্প্রকার কবিতার ঝড়ে পড়িয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও শঙ্কিত হইয়াছি, তাই আর না উজাইয়া আজকার মত এইখানেই— নৌকা ভিড়াইলাম।

চিত্রাঙ্কন

ভারতী, কার্ত্তিক ১৩০৮

আমরা বাল্যকালে শ্লেটে কিম্বা কাগজে তিলোত্তমার মতো লতা-পাতা হিজিবিজি, সেঁজুতির শিব ইত্যাদি লিখিতে লিখিতে হঠাৎ ঘোড়ার চেহারার মত যদি কিছু আঁকিয়া ফেলিতাম, তবে আশা-স্নেহার্দ্র অভিভাবকগণ উৎসাহ দিয়া বলিতেন—"উট মুট ঘোড়া, এই চিত্রের গোড়া।" তখন মনে করিতাম, ছবি আঁকা এমন কঠিন কাজই বা কি? কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার্য্য, তখনও কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ উষ্ট্র অস্মজ্জনক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় নাই,—আর নিজের হস্তমুষ্টি, সে ত শ্লেট পেন্সিল ধরিতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িত। এবং বোধহয় অন্য কাহাকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আদর্শ ধরিতে বলিলে তাহা "অদৃষ্ট" ক্রমে পৃষ্ঠদেশে পতিত হইবারই বিশিষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

যাহা হউক, উট মুট ও ঘোড়ার ছবি আঁকা খুব শক্ত হইলেও চিত্রাঙ্কনী শক্তির উহাই চরম সীমা নহে। বস্তুতঃ সুচিত্রকর হইতে হইলে সুকবির মত প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাঁহার চিত্রাঙ্কনে স্বাভাবিক শক্তি আছে তিনি উপযুক্ত শিক্ষা পাইলেই উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পী হইতে পারেন। তবে অঙ্কন-ক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে অনেকেরই আছে—যিনি বর্ণমালা লিখিতে জানেন তিনি ছবি আঁকাও

শিখিতে পারেন। চিত্রাঙ্কনে চক্ষু ও হস্ত একত্র কাজ করে—যাহা চোখে দেখা যায় তাহা হাতে আসা চাই ; এবং তাহা অভ্যাসের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

পৃথিবীর সভ্যাংশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই চিত্রকলার অনুশীলন হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত কাব্যাদিতে দেখা যায় পূর্ব্বকালে আমাদের দেশেও চিত্রবিদ্যার সমধিক চর্চ্চা ছিল। রাজারাণীরাও চিত্রাঙ্কন জ্ঞানের গর্ব্ব করিতেন। বিরহী-বিরহিণীরা পরস্পরের চিত্র অঙ্কন করিয়া সুদীর্ঘ বিরহবাসর কথঞ্চিৎ কর্ত্তন করিতেন ; প্রণয়ী-প্রণয়িনী একত্র মিলিত হইয়া চিত্রদর্শনে চিত্তবিনোদন করিতেন ; সুচিত্রিত রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমিক আদর্শ রমণী সৌন্দর্য্যের নিকট আত্মবলি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কাহিনীও শোনা যায়। সুতরাং তখনকার ছবি যে খুব সুন্দর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

বর্ত্তমানে ইয়ুরোপে চিত্রশিল্প যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে ও করিতেছে—তাহারই আদর্শে আমাদেরও চলিতে হইতেছে, কিন্তু আমরা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। হস্তিদন্তাদির উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত বর্ণচিত্রে পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা কেহ কেহ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু বোম্বায়ের রবি বর্ম্মা ব্যতীত প্রকৃত চিত্রকলায় ভারতে আর কেহ তত সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। দিনকত সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত শশীকুমার হেশের খুব সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম—তাঁহার তুলিকার কার্য্য এ পর্য্যন্ত আমাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। তিনি হয়তো দেশের বড় বড় লোকের চেহারা আঁকিয়াই জীবন ক্ষেপন করিতেছেন—ঐতিহাসিক, পৌরাণিক অথবা কল্পনারাজ্যের চিত্রাবলী তাঁহার তুলিকায় উন্মীলিত হইয়া জনসাধারণের চক্ষে পড়িবে কিনা তাহা কে বলিবে ?* কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত গঙ্গো-

*এই প্রবন্ধ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হওয়ার পর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে শ্রীযুক্ত শশীকুমার হেশের অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্র শীঘ্রই সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে।

পাধ্যায়ের কাদম্বরী চিত্রের হাফ-টোন অনুকরণ রবীন্দ্রবাবুর কল্যাণে "প্রদীপে" ঈষৎ ফুটিয়া উঠিয়াছিল—মূল তৈল চিত্রখানি যে কল্পনায় ও কলাকৌশলে খুবই আশাপ্রদ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সংবাদ-পত্রে এই সকল উদীয়মান চিত্রকরের কার্য্যকলাপ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

যাহা হউক, আমরা অদ্য চিত্রাঙ্কনের কতিপয় মূল সূত্রের আভাস দিতে চেষ্টা করিব। তাহাতে ছবি আঁকিবার না হউক, ছবি বুঝিবার কিছু সহায়তা করিতে পারিবে।

সকলেই জানেন, জ্যামিতিক ক্ষেত্রাদি সরল বা বক্র রেখা দ্বারা এক সমতলে অঙ্কিত করা হয়।

তাহাতে দৈর্ঘ্য ও বিস্তার মাত্রই দেখান যায়; উৎসেধ বা বেধ অঙ্কনের বিষয়ীভূত হয় না। কিন্তু বস্তুমাত্রই দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ-বিশিষ্ট, এবং যাহার উপর ছবি আঁকা হয়, যথা—বস্ত্র, প্রস্তর বা ধাতুফলক এবং কাগজ ইত্যাদি সমস্তই সমতল, সুতরাং সমতলের উপর পদার্থের প্রতিকৃতি কিরূপে আঁকিলে তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার ছাড়া বেধও যথাযথ প্রতিভাত হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক।

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পরিদৃষ্ট পদার্থের প্রতিকৃতি সমতল ক্ষেত্রে অঙ্কিত হওয়ার নামই ত ছবি? কাজেই অঙ্কিতব্য পদার্থ এবং চিত্রকরের অবস্থান সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই—নচেৎ দর্শক বা বস্তুর অবস্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রতিকৃতিরও রূপান্তর ঘটিবে। যেখান হইতেই দেখা যাউক না, পদার্থের সমস্ত অংশ ত আর দৃষ্টিপথে পড়ে না। সুতরাং যতটা দেখা যায়, তাহা ছাড়া, দর্শক বুঝিবে না ভয়ে একচুল বেশী করিয়া আঁকিলেও, ছবি নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রশ্ন হইয়াছিল—"পুতুলে আর ছবিতে তফাৎ কি?" এক ব্যক্তি ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"মূরতের চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা যায়, কিন্তু তোমার ছবির পিছনটা দেখা দূরে থাক, চস্‌মা চোখে দিয়া

পাশটিও দেখিবার যো নাই।"

এই কথার মধ্যে এইটুকু সত্য নিহিত আছে যে ছবিটা একটু নড়াইলে চড়াইলে অথবা ছবি স্থির রাখিয়া চোখ দুটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিলেও, ছবিতে যাহা আঁকা আছে তাহা ছাড়া বেশী কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। তবে কি ছবিতে ঠিক সম্মুখ ছাড়া আশ-পাশ একটুও আঁকা যায় না? ইহার উত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট যে, যাহা স্থির দৃষ্টির বিষয় তাহাই ছবির বিষয় হইতে পারে। আঁকিবার সময় দৃষ্টি ধরাতলের সমান্তরাল ভাবে আদর্শের পানে ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং ঘাড় উঁচু নীচু না করিয়া সোজা রাখিতে হইবে—ডাহিনে বামে কিম্বা উঁচু নীচু দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন আবশ্যক হইলেই চোখের তারা দুটিকেই কেবল ঘুরাইয়া লইতে হইবে।* এইরূপে আদর্শের যতটুকু দেখা যায় তাহাই ছবিতে ফুটান যায়।

তবেই বুঝা গেল যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পদার্থের যতটা একেবারে দৃষ্ট হয় তাহাই অঙ্কনের বিষয়ীভূত হইতে পারে। সম্পূর্ণ গোলাকার পদার্থের বিশেষ কোন পার্শ্বে ধরা যায় না—তথাপি তাহারও অর্দ্ধেকটা যথাযথ আঁকা যায়। কিন্তু চিত্রে আলোছায়ার সূক্ষ্ম রেখাপাত বা বর্ণ বিন্যাস না করিলে তাহা জ্যামিতিক বৃত্ত হইয়া দাঁড়ায়। চিত্রকরেরা আলো ও ছায়ার সূক্ষ্ম বৈষম্য দিয়াই চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া সমতলের উপর উচ্চতা-নিম্নতা বা দূরত্ব-নিকটত্ব প্রদর্শন করেন।

শুধু তাহাই নহে। কখন কখন পদার্থবলী এমন অবস্থায় দেখা যাইতে পারে যে ছবিতে তাহার স্বরূপ পরিস্ফুট করা কঠিন। একখানি চাকা বা একটি টাকা যদি ঠিক চক্ষুর সমসূত্রে ধরাতলের সমান্তরাল

*কেহ কেহ অঙ্কনের সময় একটি চক্ষু ব্যবহার করেন। কিন্তু দুই চক্ষু ব্যবহারের ক্ষতি কি? ভাল বুঝাইতে পারেন না।

বা লম্বভাবে অবলম্বিত হয় তবে তাহা একটি ঋজুরেখা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে; একটি হাতবাক্স ঐ অবস্থায় আয়তক্ষেত্রে পরিণত হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে, চক্ষের এইরূপ অনুপ্রস্থ সমসূত্রতা ধরিয়াই চিত্রের মূল পত্তন করিতে হয়। অঙ্কয়িতার চক্ষের উন্নতি অবনতির সঙ্গে এই আড়াআড়ি সমসূত্ররেখাও উঁচু নীচু দেখা যায়। যেখানে পৃথিবী ও আকাশ পরস্পর মিলিত বোধ হয়, তাহাই ধরাপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান চিত্রকর দৃষ্ট সমসূত্র রেখা—সংস্কৃতে ইহাকে দিক্‌চক্র বা চক্রবাল বলে; আমরা ইহাকে "দিগন্ত" রেখা বলিব।

বিস্তৃত মাঠে, কি নদী বা সমুদ্রতীরে দাঁড়াইলে যেখানে এই দিগন্তরেখা দেখা যাইবে, বসিয়া দেখিলে তাহা অপেক্ষা নীচুতে, এবং গৃহের ছাদে উঠিয়া দেখিলে তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চে এই দিগন্ত রেখা পড়িবে। প্রকৃতিতে এই রেখা চক্রাকার—ছবিতে সরল কেন—না একবার দৃষ্টি করিলে খানিকটা মাত্র দেখা যায়।

দিগন্তরেখার নীচেকার কোন বস্তুর উপরিভাগ যদি সমতল হয় (যথা টেবিল, বাক্স) তবে তাহা ছবিতে এমনভাবে আঁকিতে হইবে যেন তাহা বর্দ্ধিত করিলে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দিগন্তরেখায় সঙ্গত হইতে পারে—আবার দিগন্তরেখার উপরিস্থ কোন সমতল সেইরূপ নিচু ঝুঁকিয়া দিগন্তরেখায় সূক্ষ্মাগ্রভাগে মিলিত বোধ হইবে। এই হেতু রেলওয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, যেদিকে সমান্তর লাইনগুলি দৌড়িয়াছে সেই দিকে দৃষ্টি যোজনা করিলে দেখা যায় যে সেগুলি চক্ষের সম-উচ্চে দিগন্তরেখায় মিলিয়াছে, আর দুধারে তাড়িত-বার্ত্তাবহ তারস্তম্ভ-গুলির মস্তক ক্রমে নীচু হইয়া রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া একই "মিলন" বিন্দুতে দিগন্তরেখায় সঙ্গত হইয়াছে। আমরা এতক্ষণ যে সমতলের কথা বলিলাম, তাহা ধরাতলের সমান্তরাল; অন্যরূপ "তল" বা তাহার ধার অবশ্যই দিগন্তরেখায় মিলিবে না। যাহা হউক সমান্তর

রেখাগুলি ছবির মধ্যে দিগন্তরেখায় মিলনবিন্দুর পানে ছোটে—ইহা বলাও যা, দূরত্ব অনুসারে পদার্থসমূহ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র দেখায় ইহা বলাও তাই।

কিন্তু ছবিস্থ সমস্ত সমান্তর রেখাই মিলন বিন্দুতে যায় না। যে পদার্থগুলি ধরাতলে লম্বভাবে থাকে, অথবা দিগন্তরেখার সমান্তরাল তাহারা ছবিতেও লম্বভাবে বা সমান্তরভাবে থাকিবে। একখানি চৌকস টেবিলের পায়া ছবিতেও ধরাতলের সহিত সমকোণ করিয়া লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে; এবং সম্মুখ হইতে দেখিলে, কাছের ধার ও দূরের ধার দিগন্তরেখার সমান্তর হইবে সমস্ত টেবিলটা দিগন্তরেখার নিম্নে থাকিলে, দুই পার্শ্বের রেখাগুলি মাত্র মিলনবিন্দুর দিকে উর্দ্ধমুখে দৌড়াইবে; দিগন্তরেখার উপরে থাকিলে (অর্থাৎ মাটিতে বসিয়া আঁকিলে) পার্শ্বরেখাদ্বয় মিলনবিন্দুর দিকে নিম্নমুখে নামিবে। আপনি যে জানালার পাশে বসিয়া আছেন, তাহার মধ্য দিয়া রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ বাড়ীটার পানে তাকান, এবং যে কাগজে ছবি আঁকিবেন মনে করুন তাহা স্বচ্ছ ও জানালার ফ্রেমের মধ্যে বসান আছে; এখন আপনি বলিতে পারেন যে ওটা তো জানালা নয়, উহা ঐ বাড়ীটারই ছবি! যদি জানালা কাচের হয়, তবে ঐ বাড়ীটার ছাদ, জানালা, কার্নিশ, থাম প্রভৃতি সম্বলিত একটি নক্সাও কাচের উপর প্রতিবিম্বের দাগে দাগে মিলাইয়া আঁকিতে পারেন। এইরূপে, ছবিতে লম্বরেখা, সমান্তররেখা এবং কোন রেখাগুলি দিগন্তে দৌড়ায় তাহা বেশ ধরিতে পারিবেন। অনেক চিত্রকর প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির চিত্রাঙ্কনের সময় ফ্রেমে বদ্ধ একখণ্ড বৃহৎ কাচ ফলক (দর্পণ নহে) সম্মুখে লম্বভাবে স্থাপিত করিয়া তাহার উপর পতিত প্রতিবিম্বের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া লন; পরে তাহা দেখিয়া আসল চিত্রটি অঙ্কন করেন।

বলা বাহুল্য ছবি দেখিয়া ছবি আঁকা সহজ, কিন্তু জীবিত নরনারী, জীবজন্তু, পুষ্পলতা প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির আদর্শে তথা স্মৃতি-বলে ছবি

ফুটান খুবই কঠিন।

যেমন অট্টালিকা নির্ম্মাণের সময় রাজমিস্ত্রীরা বহু বংশদণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ড নানা স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার সাহায্যে তলদেশ হইতে গাঁথনি আরম্ভ করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠে এবং কার্য্য সমাধা হইলে সেগুলি অপসারিত করিয়া ফেলে, সেইরূপে ছবির বিষয়টি ঠিকরূপে আঁকিবার জন্য চিত্রকরেরাও প্রথমে ভূমিরেখা পরে দিগন্তরেখা শেষে উর্দ্ধরেখা অনুপ্রস্থভাবে পরস্পর সমান্তর করিয়া আঁকিয়া ছবির বিভিন্নাংশের পরিমাণের অনুপাত ঠিক করিয়া পাত করেন, পরে এই রেখাগুলি (বিশেষতঃ দিগন্তরেখা) অনাবশ্যক বোধ হইলে তুলিয়া ফেলেন। দিগন্তাদি রেখাপাতের ব্যতিক্রম ঘটিলে ধরাতল বা নভস্থলস্থিত পদার্থের প্রতিবিম্ব ছবিতে যথাবৎ প্রতিফলিত করা সম্ভবপর নহে। এই প্রকার ভ্রমে ধরাতলস্থিত মূর্ত্তি শূন্যে উত্থিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। অপটু পটুয়াদের আঁকা নাটকের সীন এবং দেশীয় সংবাদপত্রের কাষ্ঠ-খোদিত ছবিগুলি প্রায়ই এইরূপ ভ্রমের 'উজ্জ্বল' দৃষ্টান্ত।

ফলতঃ, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির প্রকৃত মূর্ত্তি কি প্রকারে আলো ছায়ার বৈচিত্র্যে বা বর্ণের বৈষম্যে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, এবং দূরত্ব নিকটত্ব অনুসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া চক্ষে প্রতিভাত হয় তাহার নিয়ম অনুসন্ধানই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান, এবং ইহার উপরেই যাবতীয় চিত্রাঙ্কনের মূল ভিত্তি স্থাপিত।

কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকারেরা যেমন একদিকে অসাধারণ কবিত্বশক্তিশালী, অন্যদিকে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত লোক ছিলেন, সেইরূপ উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পীরও নানা বিজ্ঞানে অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মানবমূর্ত্তি চিত্রকরের মানসিক বৃত্তিরও বিকাশ চাই; মাংসপেশী সংস্থান অস্থি পঞ্জর সম্বন্ধেও কিছু জানা শুনা চাই। তাই বলিয়া এইরূপ জ্ঞানের জন্য মেডিক্যাল কলেজের ডিসেক্‌সন রুমেই

যে যাইতে হইবে তা নয়, তবে এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক—নতুবা আপনার চিত্রিত নরনারী, "আর্ট স্টুডিও" হইতে প্রকাশিত মাংসপিণ্ডময় অবয়ব বিশিষ্ট দেবদেবীর বা মানব মানবীর ছবির মতো হইতে পারে !

সহৃদয়তা, ভাবপ্রবণতা কিংবা বহু দর্শন জনিত জ্ঞানের সম্যক্ প্রয়োগ না করিলে কখন কখন প্রসিদ্ধ শিল্পীরাও হঠাৎ ভ্রমে পতিত হন। কল্পনা সুন্দরী কবির মত চিত্রশিল্পীরও নিত্যসহচরী। প্রাচীন গ্রীসে দুইজন সুবিখ্যাত ভাস্করের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। কোন বীরপুরুষ যুদ্ধযাত্রাকলে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গৃহনিষ্ক্রান্ত হন যে জয়শ্রী লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলে যে ব্যক্তির সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ হইবে তাহাকেই দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবেন। ঘটনাচক্রে বিজয়ীবীর গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার একমাত্র কন্যা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার স্বাগত অভ্যর্থনা করিলেন। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবার নহে। দুহিতা বধ্যভূমিতে আনীতা হইয়াছেন। এক্ষণে অজ্ঞাত-পিতৃ-প্রতিজ্ঞা কন্যার আসন্ন মৃত্যু নিরীক্ষণে পিতার মুখশ্রী কিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে—প্রতিমূর্ত্তিতে সেই ভাব ফুটাইতে হইবে। একজন শিল্পীর মনস্তত্ত্ব ও শারীরস্থানতত্ত্ব বিশেষ-রূপে আয়ত্ত ছিল—তিনি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ-রূপে পিতার সেই সময়কার নেত্রবক্ত্রবিকার ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে পুরস্কার লাভ ঘটে নাই। অপর ভাস্কর, এইরূপ মর্ম্মবিদারক কর্ম্মদর্শনে অসহিষ্ণু পিতা মুখমণ্ডল যেন বস্ত্রখণ্ডে আবৃত্ত করিয়া আছেন এই ভাবের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াই উৎকৃষ্টতর শিল্পী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। যে ভাব প্রস্তর মুর্ত্তিতে সহানুভূতি আকর্ষক হয় নাই তাহা চিত্রেও হইত না।

কয়েক বৎসর অতীত হইল সার এণ্ডুবার্ড পয়ন্টার একখানি ছবি তৈলবর্ণে চিত্রিত করেন। মিসরে নির্ব্বাসিত "ইজরাএল"-গণ

দাস্যে নিযুক্ত হইয়া তাহাদের প্রভুর আজ্ঞায় একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহের প্রস্তর মূর্ত্তি টানিতেছে ইহাই ছবির বিষয় ছিল। একজন প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ার ছবিটি বহুমূল্যে ক্রয় করেন। দাম চুকাইয়া দিবার সময় তিনি ছবির একটি ভুল বাহির করেন—ছবিতে যতগুলি লোক সিংহ-বহন কার্য্যে নিযুক্ত আছে দেখান হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষে ঐ ভার বহন অসম্ভব! চিত্রকর সহাস্যে ত্রুটি স্বীকার করিয়া আর গোটাকত লোকের ছবি তাহাতে যোগ করিয়া দিলেন। ভাগ্যে তৈলবর্ণের ছবিতে ভুল হইলে সংশোধন চলে! এই যোগাযোগের কার্য্য না চলিলে উপস্থিত ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ গোলযোগেরও সম্ভাবনা ছিল।

আমাদের রবি বর্ম্মার অঙ্কিত অধিকংশ চিত্রই "দিগন্ত" রেখাপাত বর্ণবিন্যাস কিংবা ভাববিকাশ সম্বন্ধে ভ্রম প্রমাদ শূন্য। কিন্তু যে চিত্রখানিতে অপ্সরা মেনকা দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যাতা যোড়শী শকুন্তলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গগনমার্গে উদ্গামিনী হইয়াছেন, তাহাতে ভাবটি সম্পূর্ণরূপে ফুটে নাই—মূর্ত্তিযুগলের সমস্তই ঠিকঠাক্, অতিপিনদ্ধ বসনের অঞ্চল টুকুও চঞ্চল পবনে বা নভোভ্রমণে আন্দোলিত হইতেছে না, তাঁহারা উর্দ্ধে উঠিতেছেন কি নিম্নে অবতরণ করিতেছেন ভাল বুঝা যায় না—যেন চিত্রকর তাঁহার গতির কথা বিস্মৃত হইয়াই চিত্রখানি প্রস্তুত করিয়াছেন।

পরিশেষে, এদেশের বাঙ্‌লা মাসিক পত্রের "হাফ্‌টোন্‌" চিত্রের সম্পর্কে কিছু বলা যাইতেছে। ফটো-চিত্রই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিশেষে পরিবর্ত্তিত ধাতুফলকে খোদিত হইলে "হাফ্‌টোন্‌" নাম ধারণ করে। "প্রদীপ", "সাহিত্য" এবং নবপ্রকাশিত "প্রবাসী" পত্রাদির চিত্র প্রায়ই এই 'হাফ্‌টোন্‌'। আজকাল হাফটোন্‌ ছবিতে বাঙালীও দুই-একজন বেশ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। কিন্তু এই প্রকারের ছবির ইতর বিশেষ থাকিলেও ইহাতে হস্ত নৈপুণ্য তত আবশ্যক হয় না। তথাপি দুঃখের বিষয় যে বাঙ্‌লা মাসিকে বিলাতী মাসিক

পত্রাদির ন্যায় স্থায়ী সুন্দর হাফটোন্ দেখিতে পাই না। তাহা কতকটা আদর্শের দোষে, কতকটা ছাপিবার দোষে এবং কতকটা বোধহয় কালীর দোষেই ঘটিয়া থাকে। তাহা ছাড়া আরও একটি মজ্জাগত দোষ আছে—আমাদের সচিত্র মাসিকগুলি প্রায়ই দুচারি পত্রে ক্ষীণ-কলেবর, উহাদের পাঁচসাতখানি উপর্য্যুপরি স্থাপন না করিলে দৈর্ঘ্য বিস্তারের অনুরূপ পুরু হইতে পারে না। যেগুলি আবার দুইএকবার ভাঁজ হইয়া, বালী-কাগজের মিহি-মোড়করূপ পীতধরা সাজ লইয়া, ডাকঘরের মোহরের ছাপ সহিতে সহিতে নগ্ন-ভগ্ন-কুঞ্চিত লাঞ্ছিত অবস্থায় মফস্বলবাসী—নিরীহ গ্রাহকের হস্তে আসিয়া পঁহুছে তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। যদি সচিত্র মাসিক পত্র স্থূলকলেবর করা সম্ভব না হয় তবে ডাকে পাঠাইবার সময় ভাঙিয়া ভাঁজ না করিয়া, লম্বালম্বিভাবে গোলাকারে জড়াইয়া মোড়ক করিলে বোধ হয় কিছু নিরাপদ হইতে পারে। বিলাতি সকল ম্যাগাজিনই যে পুরু কাগজের তাহা নয়, "রিভিউ অব্ রিভিউজ্"এর ন্যায় সুবিখ্যাত পত্রও অপেক্ষাকৃত পাতলা কাগজের, তথাপি সেগুলি ত অক্ষত অবস্থায়ই ডাকে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া মাসে মাসে এদেশে আসে। ফলতঃ বাংলা কাগজের ছবিগুলি ভাঁজের দোষেই বেশি খারাপ হইয়া যায়।

ছবি ভাঁজে নষ্ট না হইলেও, হয়তো কখন কখন যে রঙীন কালীতে ছাপা হয় তাহাই মাসিকের পক্ষে প্রশস্ত নয়। বিলাতি কাগজের ছবি ও কালো কালীতেই প্রায় ছাপা হইয়া থাকে—অথচ মুদ্রিত অক্ষর-সমূহের সমান ছবিগুলিও দীর্ঘজীবী হয়। কিন্তু আমাদের মাসিকের প্রথমস্ত চিত্রখানি—যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে তাহাই সর্ব্বাগ্রে নষ্ট হইয়া যায়। পাঠান্তে দ্বিতীয়বার উদ্‌ঘাটন করিলে দেখা যায়, চিত্রখানি যেন ঊর্ণনাভ-তন্তু পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অথবা কোন তীক্ষ্ণপদ অন্ধকীট উহার উপর দিগ্বিদিক্

হারাইয়া হাঁটিয়া ঘাঁটিয়া বেড়াইয়াছে! ইহার প্রতিবিধান বিষয়ে পত্র পরিচালকগণের অবধান প্রার্থনীয়।

চিত্রকলা সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যাকরণ প্রসঙ্গ

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

কতিপয় বৎসর হইল বঙ্গ-ভাষায় ব্যাকরণ লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। প্রধানত দুই দল হইয়াছে—একদল সংস্কৃত ব্যাকরণের পথেই চলিতে চান, অন্য দল বঙ্গভাষার জন্য পৃথক ব্যাকরণ রচনার পক্ষপাতী। কেহ কেহ আবার মধ্যপথাবলম্বী।

বাস্তবিক পক্ষে এই কয় দলের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। খাঁটি বাঙ্গলার জন্য "স্বতন্ত্র" ব্যাকরণ রচনা করা কাহারও সাধ্য নয়—বোধ হয় দ্বিতীয় দলের তাহা উদ্দেশ্যও নহে। "সংস্কৃত"র সঙ্গে তাহার পূর্ণ বিচ্ছেদ সম্ভবপর হইতে পারে না।

যাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বনে চলিতে চান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই—কিন্তু সংস্কৃতের পক্ষপাতি ব্যক্তিগণ যেভাবে আন্দোলন করিতেছেন তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে—"ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে কি না?" ইহার উত্তর খুব সহজ বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ ভাষা কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন। যে উচ্চারিত শব্দরূপ উপায় দ্বারা লোকে মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই মানুষের ভাষা। এই ভাষা শুদ্ধরূপে "লেখা" ও "বলা" যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহার নাম ব্যাকরণ। যাহা দশজনে বলে বা দশজনে লেখে তাহা দেখিয়াই প্রথমতঃ ভাষার শুদ্ধি অশুদ্ধি নির্ণীত হয়। একথা নিশ্চিত যে, যখন বাঙ্গলা বলিয়া একটা ভাষা আছে তখন তাহার ব্যাকরণ আবশ্যক। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষায়

ব্যাকরণের আবশ্যকতা আছে কিনা, এ প্রশ্ন তুলিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। আগে ভাষা পরে ব্যাকরণ। ভাষা যে পথে চলিবে, ব্যাকরণেরও প্রথমে সেই পথে চলা উচিত। পরে মধ্যপথ হইতে এ উহার সহায় হয়। ভাষা যদি উন্নতিশীল অতএব পরিবর্ত্তনশীল হয় তবে ব্যাকরণের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। দু'শ, পাঁচ'শ বছর পরে ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িবার অর্থ কি? তখনকার লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবে তাহাই কি তাহাদের কাছে দুর্ব্বোধ ঠেকিবে? না, 'আমাদের' ব্যাকরণ কি 'আমাদের' ভাষা বুঝিবার কোন সহায়তা করিবে না? অথবা তাহারা আমাদের 'সাহিত্য' পড়িবে অথচ আমাদের 'ব্যাকরণ' পড়িবে না? ফলতঃ, কথা এই— বর্ত্তমান ব্যাকরণ আমাদের বর্দ্ধিষ্ণু ভাষার প্রতি সম্যক লক্ষ্য করিয়াছে কি না? না, এ পর্য্যন্ত করে নাই। সেই জন্য যাঁহারা বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা বলেন বা লেখনী চালনা করেন, তাঁহারা আধুনিক ব্যাকরণের উপযোগী উপাদান নানা প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র। যাহা ইতিপূর্ব্বেই সংগৃহীত আছে তাহারও নির্ব্বাচন চলিতেছে। সম্ভবতঃ আরও কিছুদিন এই সংগ্রহ কার্য্য চলিবে, পরে ব্যাকরণের প্রথম "সংস্করণ" হইবে।

"কথিত ভাষা সাধারণ লোকের ভাষা" একথাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। "সাধারণ" মানে যদি "ইতর" বা 'অশিক্ষিত' হয়, তবে কি 'ভদ্র' বা "শিক্ষিত" লোকের কথিত ভাষা নাই। আর যদি 'সাধারণ' মানে 'অধিকাংশ' লোক হয়, তবে তাহা ছাড়িয়া ব্যাকরণ কিংবা সাহিত্য রচিত হইবে কি করিয়া? "বিশুদ্ধ ব্যাকরণ বিদ্যমান না থাকায় বাঙ্গলা সাহিত্যের সবিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে।" একথার অর্থ কি এই যে, যে সমস্ত ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একখানিও শুদ্ধ নয়? সকলই যদি ভ্রমসঙ্কুল হয় তবে ত আশঙ্কার কথাই বটে। সুতরাং "অধুনা বাঙ্গলা লেখকগণ কোন নিয়মের বশবর্ত্তী নহেন।"

ইহাতে বিচিত্র কি ? কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অন্ধকে পদ প্রদর্শন করে ? তবে পঙ্গু হইলে তাহার স্কন্ধে আরোহণ করাই ন্যায়সঙ্গত বটে ? অতএব লেখকবর্গ যে যাহার মতে চলিতেছেন তাহাতে আক্ষেপ কি ! অথবা যদি তাঁহারা প্রকৃত লেখক হন, তবে তাঁহাদের লিখনভঙ্গী যে "নিয়ম" হইয়া পড়ে। ফলকথা, যে সমস্ত ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত ব্যাকরণের বাঙ্গলা পকেট সংস্করণ, কতক বা ইংরাজী ব্যাকরণের অনুকরণ—অতি অল্প সংখ্যকই বাঙ্গলা রচনায় অবলম্বন হইতে পারে। এই অত্যল্প সংখ্যকও আবার অল্প লেখকই দেখিয়া থাকেন।

"সজীব" ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইলে ভাষার বাল্যাবস্থা হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে আসিতে হইবে, পরে তাহা হইতে সাধারণ সূত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক বর্ত্তমান লেখকগণের সম্মুখে ধরিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে তাহার ঝোঁক কোন্ দিকে তাহাতে আভাসে ইঙ্গিতে দেখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান রচনারও বিধান করিতে হইবে।

"ব্যাকরণের সূত্রে বদ্ধ হইলেই ভাষা মরিয়া যায়"—একথার কোন যুক্তি বা ভিত্তি নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সজীব ভাষার অনুচর হচ্ছে ব্যাকরণ, শেষে অনুচর প্রায় সহচর হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি মত্তদন্তীর মত ভাষার গতি স্বাধীন ও উদ্দাম থাকিলে ব্যাকরণের সাধ্য কি যে, সরু সরু 'সূত্র' তৈরী করিয়া তাহাকে বদ্ধ করে। তবে যখন গতি মন্থর হইয়া আসে, তখন তাহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিতে পারে। শেষে যখন ভাষা নিতান্ত স্থির হয় বা মরে তখন ব্যাকরণ তাহাকে একেবারেই বাঁধিতে পারে। এতদিন যে অনুচর ছিল, সে এখন নিতান্ত 'আপনার' হইল—এখনই সে ভাষার প্রকৃত "সাহিত্য" লাভ করিল।

কিন্তু উপমার রজ্জু বেশী টানিলে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। তুলনা

ছাড়িয়া স্থূলকথা এই ভাষার চরমদশায় ব্যাকরণই প্রহরীস্বরূপ। মৃত ভাষাকে নাড়াচাড়া করিতে হইলে ব্যাকরণের অনুমতি ছাড়া উপায়ন্তর নাই। ব্যাকরণের সহায়তায় মৃত-ভাষারও "সাড়া" পাওয়া যায়।

আর সকল ভাষারই কি মৃত্যু আছে? "সংস্কৃত" ভাষা অমর ভাষা। হিন্দুধর্ম্মের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, রীতি নীতিতে তন্ত্রমন্ত্রে ইহার সজীবতা এখনও কিছু লক্ষিত হয়। এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 'পণ্ডিতে' 'পণ্ডিতে' সংস্কৃতে কথোপকথন চলে; অদ্যাপি সংস্কৃত নাটক প্রণীত ও অভিনীত হইয়া থাকে, আজিও "সংস্কৃত" বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই মেলে। যাহা হউক, ইহারও পরিবর্ত্তন যুগে যুগে সংসাধিত হইয়াছে। এই ভাষা কিরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত ইতিহাস জানিবার উপায় নাই—অর্থাৎ উহা কৃত্রিম ব্যাকরণের উপর স্থাপিত, (আজকাল Esperanto বলিয়া একটা নূতন ভাষা ইয়ুরোপে সার্ব্বজাতিকভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং ভাষার জন্য "কৃত্রিম" ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে।) কি উহা হইতেই ব্যাকরণের উদ্ভব হইয়াছে তাহা ঠিক করা কঠিন। কিন্তু এটা ঠিক যে, সুপ্রতিষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ব্বেই উহার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার ব্যাকরণই যে এই ভাষার সর্ব্বথা নিয়ামক তাহা নহে। পরবর্ত্তী ব্যাকরণকারেরাও পাণিনি পরিত্যক্ত অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল শব্দ পাণিনির পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যকারগণ পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবহৃত করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ব্যাকরণে নূতন সূত্র দিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া কত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ, বিকল্প, কত আর্ষ প্রয়োগ ইত্যাদি কত কি আছে, যাহাতে বোঝা যায় যে, ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রথমে সমভাবে বিবাদ করিলেও শেষে সাহিত্যেরই জয় হইয়াছে।

সংস্কৃতের একান্ত পক্ষপাত। সম্প্রদায় বলেন, "যে সকল পদের

হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সেগুলি বর্জ্জন করা উচিত।” পদসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপক কি? কিছুই নাই। যাহা বহুস্থান ও বহুকাল ব্যাপিয়া আছে তাহা সবল বটে, কিন্তু তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে না কে বলিতে পারে? বিদ্যাসাগরী ‘হইবেক’, ‘যাইবেক’ ইত্যাদি পদ ত বহু দিন সাহিত্যে ছিল, এখন কদাচিৎ দেখা যায়। উহাদিগকে কি রাখা সঙ্গত ‘হইবেক’? যদি বলেন, ঐ ‘ক’ প্রাদেশিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহার উত্তর এই যে, ‘হইবে’ ‘যাইবে’ প্রভৃতি পদেও ত পূর্ব্বাঞ্চলের গন্ধ আছে। এইগুলিও ‘কাল্পনিক’ বা ‘স্থির’ পদ নয়। যাহা পূর্ব্ব হইতে “আইসে” তাহা এখন “আসে”, যাহা পূর্ব্বে হইয়া “গিয়াছে” তাহা বর্ত্তমানে প্রায় হইয়া “গেছে”।

এইরূপে দেখা যায়, যাহাকে ‘করিত’ বা স্থির পদ বলা হয়, তাহা কোন না কোন প্রদেশের “প্রচলিত” এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমানে ক্রিয়া পদগুলির অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের “প্রচলিত” অবশ্য “লিখিত” পদ সর্ব্বদা “কথিত” শব্দের অনুরূপ হয় না। এইগুলি সময়ে রাজধানী কলিকাতা অঞ্চলের প্রাদেশিকতায় পরিবর্ত্তিত হইবার খুব সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাহা ঠেকাইবার জো নাই এবং ঠেকাইয়া লাভও নাই।

ক্রিয়াপদ ছাড়া বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয়, সম্বোধন এবং পদান্বয় বাগ্-ভঙ্গী ইত্যাদিতেও কলিকাতা রাজধানীর প্রাধান্যই সূচিত হয়। যতদিন এই নগরই বঙ্গের রাজধানী থাকিবে, ততদিনই ভাষায় ও ভূষায় অন্যান্য প্রদেশ ইহার অনুবর্ত্তন করিবে। যদি উচ্চারণ সংবলিত অভিধান বাংলাভাষায় প্রচারিত হয়, তবে তাহা সম্ভবতঃ রাজধানী অঞ্চলের উচ্চারণ লইয়া বাহির হইবে এবং সেইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাংলা পদ্যে ত আছেই, বাংলা গদ্য-গ্রন্থে ও প্রবন্ধে নাটকে ও নভেলে সাপ্তাহিকে ও মাসিকে সাধু লেখকবর্গ নিরন্তর যে সকল কথিত প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিতেছেন,

তাহাদের প্রচলন বন্ধ না করিয়া, তাহাদের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ ব্যাকরণ বা অভিধানে প্রদান করিবার চেষ্টা হউক। নতুবা ভাষার সৃষ্টি সুদূর-পরাহত। যাঁহারা বলেন—বরং 'কল্পিত' বা 'বিদেশীয়' পদ ব্যবহার করিব তথাপি প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিব না—তাঁহারা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। কারণ প্রাদেশিক বা দেশজ বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার কিছুই নাই। একটি প্রাদেশিক শব্দের মধ্যে জাতির অনেক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, অধিকন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মূল প্রকৃতি অবধারিত হইলে তাহাদের অনেকেই যে আমাদের সকলেরই নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া পরিচিত, পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, বাঙ্গালীর 'প্রাকৃত' ও 'সংস্কৃত' অথবা 'কথিত' ও 'লিখিত' এই দুই শ্রেণী পৃথক করিয়া সাহিত্য গঠনের আবশ্যকতা নাই। বরং উভয়কে পরস্পর 'বেমালুম' মিশ্রিত করিয়া ভাষাকে পুষ্ট করাই সঙ্গত।

পরিশেষে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একান্ত 'সংস্কৃত' অনুরাগী পণ্ডিতেরা কথোপকথনেও 'খেলনাকে ক্রীড়নক দ্রব্য' ও দাঁড় করার স্থলে 'দণ্ডায়মান করা' ইত্যাদি বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অসংখ্য স্থলে খাঁটি প্রাদেশিক বাংলা লিখিয়া ফেলিয়াছেন এবং এইরূপে অনেক নিরীহ সংস্কৃত পদকেও অকারণে 'বিদূরিত' করিতেছেন।